ইসলামের বাস্তব কাহিনী
হযরাতুল আল্লামা আব্দুর নূর মুহাম্মদ বশীর (রহঃ)

ইসলামের বাস্তব কাহিনী

(২য় খণ্ড)

মূল- হযরাতুল আল্লামা আবুন নুর মুহাম্মদ বশীর
(রাহমতুল্লাহে আলাইহে)
অনুবাদ- অধ্যাপক মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান

মুহাম্মদী কুতুবখানা
৪২, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোনঃ ৬১৮৮৭৪

প্রকাশকঃ
আরিফুর রহমান নিশান
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

প্রকাশকাল
০১/০৩/০৭ ইং

হাদিয়াঃ ৯৫.০০ টাকা

কম্পোজ- এনাম্‌স প্রিন্টার্স এণ্ড কম্পিউটার
৩৯, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মুদ্রণে- আনন প্রেস
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

ভূমিকা

খোদার লাখো শুক্‌রীয়া, 'ইসলামের বাস্তব কাহিনী (২য় খণ্ড)' বের হলো। আশা করি এটাও ১ম খণ্ডের মত সূধী পাঠক মহলের কাছে সমাদৃত হবে। এ খণ্ডে খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের বিভিন্ন ঈমান উদ্দীপক কাহিনী স্থান পেয়েছে। সাহাবায়ে কিরামের ইশকে রসূল, ঈমানী শক্তি ও জিহাদী জজবা কোন্ পর্যায়ের ছিল, এখানে উল্লেখিত ছোট ছোট কাহিনীগুলো পড়ে কিছুটা আঁচ করা যাবে। আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) যেমনি অতুলনীয়, তাঁর সাহাবীগণও ছিলেন তেমনি অতুলনীয়। তাঁদের সাথে কারো তুলনা হতে পারে না। প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর জীবদ্দসায় ও পর্দার অন্তরালে চলে যাওয়ার পর তাঁরা (রাদি আল্লাহু আনহুম) যে ঈমানী জজবা দেখিয়েছেন, এর কোন নজির নাই। তাঁদের ঈমানী শক্তির সামনে কোন বাতিল শক্তি টিকে থাকতে পারেনি।

সাহাবায়ে কিরাম হচ্ছেন, 'সত্যের মাপকাঠি'। তাঁদের কোন সমালোচনা করতে নেই। এতে ঈমান হারাবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁরা হলেন, আমাদের নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সবচে প্রিয় পাত্র। আজ আমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক জন্ম নিয়েছে, যারা সাহাবায়ে কিরামের সমালোচনা করতে দ্বিধাবোধ করে না। এদের সংশ্রব থেকে দূরে থাকা একান্ত প্রয়োজন। এরা হচ্ছে কুখ্যাত ফিৎনাবাজ ইবনে সাবার উত্তর সূরী। মুসলমানদের মধ্যে ফিৎনা সৃষ্টি করাই এদের মূল উদ্দেশ্য। এদের খপ্পর থেকে বাঁচার জন্য এ জাতীয় বই খুবই সহায়ক। আশা করি, পাঠক মহল আগ্রহ সহকারে বইটি পড়বেন।

তৃতীয় খণ্ডের কাজ শুরু হয়েছে। এতে থাকবে আহলে বায়তে এজাম ও আউলিয়ায়ে কিরাম সম্পর্কিত বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক কাহিনী। যথাসম্ভব শীঘ্রই বের করার জন্য চেষ্টা করছি। এ ব্যাপারে পাঠক মহলের সক্রিয় সহযোগিতা ও দুআ কামনা করি।

অনুবাদক

সূচী

চতুর্থ অধ্যায়

খোলাফায়ে রাশেদীন

কাহিনী নং ১২৫

হযরত ছিদ্দিকে আকবরের স্বপ্ন

হযরত ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) ইসলাম গ্রহণ করার আগে বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। একবার তিনি ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়া গিয়েছিলেন। তথায় একরাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে, আসমান থেকে চাঁদ ও সূর্য নেমে এসে তাঁর কোলের উপর আশ্রয় নিল। তিনি (রাদি আল্লাহু আনহু) উভয়টাকে ধরে বুকে টেনে নিলেন এবং স্বীয় চাদর খানা উপরে জড়ায়ে দিলেন। ভোরে যখন জাগ্রত হলেন, তখন এ দুর্লভ স্বপ্নের তাবীর জানার আগ্রহে এক পাদরীর কাছে গেলেন। পাদরী পুরা স্বপ্নটা শুনে ওনাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার নাম কি, কোথাকার অধিবাসী এবং কোন্ গোত্রের? হযরত ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) ফরমালেন, আমার নাম আবু বকর, মক্কার অধিবাসী এবং বনী হাশেম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। পাদরী পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি কাজ করেন? তিনি বললেন, ব্যবসা করি। সব কিছু জানার পর পাদরী বললেন, আপনি সৌভাগ্যবান, মক্কার বনী হাশেম গোত্র হতে শেষ নবীর আবির্ভাব হচ্ছে। এ পবিত্র নবী না এলে, আল্লাহ তাআলা আসমান জমীন সৃষ্টি করতেন না, সমস্ত সৃষ্টিকূল কখনো বিকশিত হতো না এবং অন্যান্য নবীগণের আবির্ভাবও হতো না। তিনি সমস্ত নবী রসূলগণের সরদার হবেন, সবাই তাঁকে 'মুহাম্মদুল আমীন' নামে স্মরণ করবে। হে আবু বকর! এ স্বপ্নের তাবীর হচ্ছে আপনি ওনার ধর্ম গ্রহণ করবেন এবং তাঁর প্রথম খলিফা হবেন। হে আবু বকর! আমি সেই পবিত্র নবীর সম্পর্কে তৌরাত কিতাবে পড়েছি। ইন্জিল ও যবুর কিতাবেও তাঁর প্রশংসা বর্ণিত আছে। আমি তাঁর উপর ঈমান এনেছি এবং তাঁর ধর্ম গ্রহণ করেছি। তবে ইহুদীদের ভয়ে স্বীয় ঈমান গোপন রেখেছি। আজ আপনাকে আসল কথা বলে দিলাম।

হযরত ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) এ তাবীর শুনে ভীষণ প্রভাবান্বিত হলেন, তাঁর মনের মধ্যে আমূল পরিবর্তন এসে গেল এবং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাক্ষাত লাভের আগ্রহে অস্থির হয়ে পড়লেন। কালবিলম্ব

না করে মক্কায় ফিরে আস্‌লেন এবং হুযূরের খেদমতে উপস্থিত হয়ে হুযূরকে দেখে পরম তৃপ্তি বোধ করলেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও আবু বকরকে দেখে মুচ্‌কি হাস্‌লেন এবং ফরমালেন, হে আবু বকর! তাড়াতাড়ি কলেমা পাঠ করে আমার ধর্মে দাখিল হয়ে যাও। ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) আরয করলেন, হুযূর! কোন মুজেযা দেখার কি প্রত্যাশা করতে পারি? হুযূর মুচকি হেসে ফরমালেন, সিরিয়ায় যে স্বপ্ন দেখে এসেছ এবং পাদরী থেকে যে তাবীর শুনেছ, সেটাতো আমার মুজেজা।

একথা শুনার সাথে সাথে ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) উচ্চস্বরে বলে উঠলেন-

أَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

(জামেউল মুজেহাত ৪ পৃঃ, নুজহাতুল মাজালিস ৩০২ পৃঃ)

সবকঃ হযরত ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) প্রথম খলিফা হওয়াটা আগে থেকে নির্ধারিত ছিল। তৌরাত-ও ইনজিল বিশারদগণও এ ব্যাপারে অবহিত ছিলেন। এর পরও যারা তাঁর খেলাফতকে অস্বীকার করে, তারা বড় অজ্ঞ।

আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আগ-পরের এবং দিন-রাতের সব বিষয় জানতেন, তাঁর কাছে কোন বিষয় অদৃশ্য ছিল না।

কাহিনী নং ১২৬

গুহার সাথী

মক্কা মুয়াজ্জমায় যখন কাফিরেরা মুসলমানদেরকে নানা ভাবে কষ্ট দিতে লাগলো, তখন আল্লাহ তাআলা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে মক্কা মুয়াজ্জমা থেকে অন্যত্র চলে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কথা ছিদ্দিকে আকবরকে জানালেন এবং ফরমালেন, আমি শীঘ্র এখান থেকে অন্যত্র চলে যাব।

হযরত ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমিও আপনার সাথে চলে যাব।

হিজরতের রাত্রে মক্কার কাফিরেরা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে

শহীদ করার উদ্দেশ্যে তাঁর ঘর ঘিরে ফেললো। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করে ওদের সাম্‌নে দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন অথচ ওরা কেউ তাঁকে দেখলো না। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘর থেকে বের হয়ে সোজা হযরত ছিদ্দিকে আকবরের ঘরে তশরীফ নিয়ে গেলেন এবং ফরমালেন, হে আবু বকর! আমি এ মুহূর্তে হিজরত করছি এবং মক্কা ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি। ছিদ্দিকে আকবর আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমিও আপনার সাথে যাব। ফরমালেন, চলো। ছিদ্দিকে আকবর হুযূরের কাছ থেকে সহযাত্রী হওয়ার অনুমতি পেয়ে আনন্দে কেঁদে দিলেন এবং হুযূরের সাথে যাবার জন্য তৈরী হয়ে গেলেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিদ্দিকে আকবরকে সাথে নিয়ে মক্কা মুয়াজ্জমা থেকে যাত্রা দিলেন। ছিদ্দিকে আকবর কিছুক্ষণ হুযূরের অগ্রগামী আবার কিছুক্ষণ হুযূরের পশ্চাৎগামী হয়ে চলতে লাগলেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কাছে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে, তিনি আরয করেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি চাচ্ছি যে সামনে বা পিছন থেকে শত্রুদের কোন আক্রমন হলে সেটা যেন আমার উপর হয় এবং আমি যেন হুযূরের জন্য উৎসর্গিত হতে পারি এবং হুযূরের উপর যেন কোন আঘাত না আসে। এভাবে পথ চলতে চলতে তাঁরা ছুর পাহাড়ে পৌছলেন। এ পাহাড়ে একটি গুহা ছিল, যার নাম ছিল হুয়াম গুহা। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই গুহায় তাশরীফ রাখার জন্য মনস্থ করলেন এবং যখন সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, ছিদ্দিকে আকবর আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি একটু দাঁড়ান, প্রথমে আমাকে ভিতরে যাবার অনুমতি দিন। পুরানো গুহা, আমি গিয়ে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করার পর আপনি আসবেন।

অতএব, প্রথমে ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) সেই গুহায় প্রবেশ করলেন এবং সেটা পরিস্কার করতে লাগলেন। সেখানে কয়েকটি গর্ত ছিল। তিনি স্বীয় কাপড় ছিঁড়ে গর্ত গুলোর মুখ বন্ধ করলেন, যাতে কোন বিষধর প্রানী হুযূরকে কষ্ট দিতে না পারে। কাপড়ের টুকরা শেষ হয়ে যাওয়ায় একটি বিরাট বিষাক্ত সাপের গর্তের মুখ বন্ধ করতে পারলেন না। তাই হযরত ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) নিজের জানের পরওয়া না করে স্বীয় পায়ের গোড়ালী সেই গর্তের মুখে রাখলেন এবং এটাই চিন্তা করলেন যে, কোন কিছু হলে আমার হোক কিন্তু হুযূরের যেন কোন কষ্ট না হয়। গর্তের মুখে পা রাখার পর হুযূরকে ভিতরে যাবার জন্য

আহবান করলেন। হুযূর গুহার ভিতরে তশরীফ নিয়ে গেলেন এবং ছিদ্দিকে আকবরের কোলের উপর নুরানী মস্তক মুবারক রেখে বিশ্রাম নিলেন। এদিকে যে গর্তের মুখে ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) পায়ের গোড়ালী রেখে ছিলেন, সেই গর্তের বিষাক্ত সাপ তাঁকে দংশন করল এবং ভীষণ যন্ত্রনা করতে লাগলো কিন্তু তিনি যথাস্থানে অটল রইলেন যাতে হুযূরের বিশ্রামের ব্যাঘাত না ঘটে। বিষের যন্ত্রনায় ছিদ্দিকে আকবরের চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে আসলো এবং কয়েক ফোটা হুযূরের গায়ে পড়লো। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিদ্দিকে আকবরের কাছে ক্রন্দনের কারণ সিজ্ঞেস করলে, তিনি আরয করেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার মা-বাপ আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক, আমাকে সাপে কামড় দিয়েছে। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন দংশিত স্থানে স্বীয় থুথু মুবারক লাগিয়ে দিলেন এবং সাথে সাথে বিষক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল।

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) যখন গুহায় প্রবেশ করছিলেন, তখন গুহার অদূরে একটি বৃক্ষ ছিল। হুযূরের নির্দেশে সেই বৃক্ষ স্বীয় জায়গা থেকে সরে গুহার মুখে এসে অবস্থান নেয়। ফলে এ রকম মনে হচ্ছিল যে বৃক্ষটি এখানেই গজিয়ে উঠেছে। বৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল এবং আল্লাহ তাআলা তখন এক মাকড়সা প্রেরণ করেন, যেটা সেই বৃক্ষের শাখায় জাল তৈরী করলো। এসব আয়োজন এ জন্য করা হয়েছিল যে কাফিরেরা হুযূরের সন্ধানে এখানে এসে উপস্থিত হলে, এবং গুহার মুখে বৃক্ষ ও এর শাখায় মাকড়সার জাল দেখলে, ওদের মনে যেন এ রকম কোন সন্দেহও সৃষ্টি না হয় যে, হুযূর ভিতরে প্রবেশ করেছেন।

এদিকে কাফিরেরা যখন জানতে পারলো যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু বকরকে সাথে নিয়ে মক্কা ত্যাগ করেছেন, তখন তারা খুবই আশ্চর্য হয়ে গেল এবং এদিক সেদিক তালাশ করতে লাগলো এবং হুযূরকে খুঁজে বের করার জন্য কয়েকজন অনুসন্ধানকারী নিয়োগ করলো। ওদের মধ্যে একজন হুযূরের পদচিহ্ন অনুসরণ করতে করতে গুহার মুখে এসে উপস্থিত হলো। কিন্তু এর পর ডান দিকে গেল, নাকি বাম দিকে গেল, এর কোন হদিস খুঁজে পাচ্ছিল না। এর মধ্যে আরও কয়েক জন কাফির এসে তথায় একত্রিত হলো কিন্তু সামনে অনুসন্ধান করার জন্য কোন চিহ্ন খুঁজে পেল না। সবাই ওখানে দাঁড়িয়ে রইলো। ছিদ্দিকে আকবর গুহার মুখে কাফিরদের পদচারনা দেখে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়া সাল্লামের চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওনাকে সান্তনা দিয়ে ফরমালেন, কোন চিন্তা কর না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছে।

ইত্যবসরে কাফিরদের মধ্যে একজন বললো, "কেউ গুহার ভিতর গিয়ে একটু দেখে আসেতে পার"। অন্যরা এ কথা শুনে ওকে বোকা বানিয়ে ছাড়লো এবং বললো, গুহার মুখে বৃক্ষের ডাল-পালা ছড়ায়ে রয়েছে এবং মাকড়সা জাল বুনেছে। যদি কেউ ভিতরে যেত, তাহলে এ ডাল-পালা ও জাল ছিন্নভিন্ন অবস্থায় দেখা যেত। তাই এ রকম যেহেতু দেখা যাচ্ছে না, সেহেতু কেউ ভিতরে যাবার প্রশ্নই আসে না।

অতএব ওরা নিরাশ হয়ে ফিরে গেল এবং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) আল্লাহর হেফাজতে সম্পূর্ণ নিরাপদে রইলেন।

(কুরআন করীম পারা ১০ রুকু ১২, মিশকাত শরীফ-৫০ পৃঃ রুহুল বয়ান-৯০২ পৃঃ ১ জিঃ)

সবকঃ (১) কুরআনে পাকে এ ঘটনার প্রেক্ষিতে اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِه বলে আল্লাহ তাআলা ছিদ্দিকে আকবরকে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবী বলে আখ্যায়িত করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি ছিদ্দিকে আকবরকে সাহাবী বলতে অস্বীকার করে, সে কাফির।

(২) হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا (চিন্তা কর না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন) বলে এটা সুস্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ তাআলা ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) এর সাথে আছেন। এতে প্রমানিত হলো যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পরে ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) এর খলিফা হওয়াটা বরহক ছিল এবং তিনি আত্মসাৎকারী ও অত্যাচারী ছিলেন না। কারণ আল্লাহ তাআলা আত্মসাৎকারী ও জালিমের সহায়ক হন না। এর পরও যদি কোন জালিম তাঁকে (রাদি আল্লাহু আনহু) জালিম বলে, তাহলে সে যেন لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا এ আয়াতকে অস্বীকার করলো।

(৩) হিজরতের রাতে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) এর ঘরে গিয়ে ওনাকে সাথে নিয়ে বের হওয়া এবং ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) সব কিছু ত্যাগ করে হুযূরের সাথে বের হয়ে পড়াটা প্রমাণ করে যে, ছিদ্দিকে আকবরের প্রতি হুযূরের এবং হুযূরের প্রতি ছিদ্দিকে

আকবরের সীমাহীন মহব্বত ছিল।

(৪) হুযূরকে গুহার বাইরে রেখে ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) প্রথমে নিজে ভিতরে প্রবেশ করাটা, নিজের কাপড় ছিড়ে গর্ত গুলোর মুখ বন্ধ করাটা এবং একটি গর্তের মুখে নিজের পায়ের গোড়ালী রাখাটা প্রমাণ করে যে, ছিদ্দিকে আকবরের কাছে নিজের জান-মালের চেয়ে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অধিক প্রিয় ছিলেন এবং এটা পূর্ণ ঈমানের নির্দশন, যেটা ছিদ্দিকে আকবরের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে।

(৫) ক্ষতস্থানে হযূরের থুথু মুবারক লাগিয়ে শেফাদান করাটা প্রমাণ করে যে, হুযূরের থুথু মুবারকও বলা মুছিবত দূরীভূতকারী।

(৬) হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশ পালন পূর্বক বৃক্ষ স্বস্থান থেকে সরে গুহার মুখে এসে যাওয়াটা প্রমাণ করে যে, আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশ, হস্তক্ষেপ সৃষ্টিকুলের প্রতিটি অনু-পরমানুর উপর চলে।

(৭) গুহার মুখ পর্যন্ত কাফিরদের আগমন এবং পুনরায় ওখান থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে আসাটা প্রমাণ করে যে, হকের মুকাবিলায় সমস্ত ষড়যন্ত্র ও প্রচেষ্টা বৃথায় পর্যবসিত হয়।

কাহিনী নং ১২৭

আসমানের তারা

একবার এমন এক রাত্রে, যখন আকাশ পরিস্কার ছিল এবং অগণিত তারকারাজি ঝলমল করছিল, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত উম্মূল মুমেনীন আয়েশা ছিদ্দিকা (রাদি আল্লাহু আনহা) এর পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। হযরত আয়েশা আসমানের দিকে তাকিয়ে হুযূরকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আসমানে যতগুলো তারা আছে এতগুলো কি কারো নেকী আছে? হুযূর ফরমালেন, হ্যাঁ। হযরত ছিদ্দিকা আরয করলেন, হুযূর! সেটা কার? হুযূর ফরমালেন, ওমরের।

উম্মুল মুমেনীন হযরত ছিদ্দিকার দৃঢ় ধারণা ছিল যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিদ্দিকে আকবরের নাম বলবেন কিন্তু হযরত ওমরের নাম শুনে আয়শা ছিদ্দিকা আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার আব্বাজানের নেকী গুলো কোথায় গেল? হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন, আয়েশা, ওমরের সমস্ত নেকীগুলো আবু বকরের নেকীগুলোর একটি নেকীর বরাবর মাত্র। (মিশকাত শরীফ ৫৫২ পৃঃ)

সবকঃ ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) এর শান অনেক উর্ধে। নবীগনের পর সবচে উচ্চ মার্যাদা হচ্ছে হযরত আবু বকরের। হিজরতের সময় যে রাত তিনি হুযূরের সাথে কাটিয়ে ছিলেন, সেই একটি নেকীর এত বড় মর্যাদা যে, আসমানের তারকারাজির বরাবর নেকীগুলোও সেই একটি নেকীর বরাবর হতে পারে না।

আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে উম্মতের নেক ও বদ আমল কোনটা অদৃশ্য নয় বরং হুযূর সবের আমলসমূহ সম্পর্কে জ্ঞাত। কতেক নেকী প্রকাশ্যে আবার কতেক নেকী গোপনেও হয়ে থাকে। হযরত ওমরের নেকীগুলোর মধ্যে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয় ধরণের ছিল। কিন্তু এসব নেকীগুলোর জ্ঞান হুযূরের ছিল। তাই তিনি ফরমালেন যে, ওমরের নেকীগুলো আসমানের তারকারাজির বরাবর।

কাহিনী নং ১২৮

পাঁচটি বিষয়

একদিন হযরত মওলা আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) হযরত ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞেস করলেন, জনাব! আপনি কোন্ বিষয়গুলোর দ্বারা এত উচ্চ মর্যাদায় পৌছে গেছেন?

ছিদ্দিকে আকবর ফরমালেন, পাঁটি বিষয়ের দ্বারাঃ

একঃ আমি দু'ধরণের লোক দেখতে পাই। এক ধরণের লোকেরা দুনিয়া তালাশে ব্যস্ত এবং অন্য ধরণের লোকেরা পরকালের জন্য সচেষ্ট। আমি কিন্তু মওলাকে পাবার জন্য চেষ্টা করছি।

দুইঃ আমি যখন থেকে ইসলাম ধর্মের ছায়াতলে এসেছি, এর পর থেকে কখনো পেট ভরে দুনিয়ার খাদ্য গ্রহণ করিনি। কেননা সত্য জ্ঞানের স্বাদ আমাকে দুনিয়াবী খাবার থেকে উদাসীন করে দিয়েছে।

তিনঃ যখন থেকে আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি, এর পর থেকে কখনো পরিতৃপ্তি হয়ে পানি পান করিনি। কেননা খোদা প্রেমের পানি দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়েছি।

চারঃ যখনই আমি এক সাথে দুনিয়াবী ও আখেরাতের কাজের সন্মুখীন হয়েছি, তখন আমি আখেরাতের কাজকে অগ্রাধিকার দিয়েছি এবং দুনিয়াবী কাজের কোন তোয়াক্কা না করে পরকালের কাজকে গ্রহণ করেছি।

পাঁচঃ আমি হুযূর সায়্যেদুল আম্বিয়া (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সংশ্রবে ছিলাম এবং হুযূরের সাথে আমার এ সংশ্রব খুবই ভাল ছিল। (নজহাতুল মাজালিস, ৩০৪ পৃঃ ২হিঃ)

সবকঃ হযরত ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) উম্মতের মধ্যে মওলার সবচে বড় সন্ধানী ও পূর্ণ নৈকট্য লাভকারী, সাত্যের প্রেমিক, পরহিজগার এবং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন।

কাহিনী নং ১২৯

পুলসেরাতের জিম্মাদারী

একদিন ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) হযরত মওলা আলী (রাদি আল্লাহু আনহু)কে দেখে মুচকি হাসলেন। মওলা আলী ছিদ্দিকে আকবরকে জিজ্ঞেস করলেন, জনাব, আমাকে দেখে হাসলেন কেন? ছিদ্দিকে আকবর বললেন, হে আলী, তোমাকে অভিনন্দন, আমাকে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমায়েছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত আলী কাউকে পুলসেরাত অতিক্রম করার অনুমতি দেবেনা, ততক্ষণ কেউ পুলসেরাত অতিক্রম করতে পারবে না। এটা শুনে হযরত আলীও হাসলেন এবং বললেন, হে খালিফাতুল মুসলেমীন! আপনাকেও ধন্যবাদ, আমাকে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমায়েছেন, হে আলী তুমি ঐ ব্যক্তিকে কক্ষনো পুলসেরাত অতিক্রম করার অনুমতি দিও না, যে ব্যক্তির মনে আবু বকরের প্রতি বিদ্বেষ রয়েছে বরং ঐ ব্যক্তিকে অনুমতি দিও, যে আবু বকরকে ভালবাসে।(নজহাতুল মাজালিস ৩০৬ পৃঃ ২ হিঃ)

সবকঃ হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর প্রতি মহব্বত এবং তাঁর গোলামীর দ্বারা ফায়দা তখনই হতে পারে, যখন অন্তরে ছিদ্দিকে আকবরের মহব্বতও থাকে। অন্যথায় আলীর প্রতি নাম সর্বস্ব মহব্বত কোন কাজে আসবেনা।

কাহিনী নং ১৩০

আংটির নক্সা

একবার হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) এর হাতে তাঁর আংটি মুবারক দিয়ে ফরমালেন, এটার উপর لااله الاالله (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) লেখায়ে নিয়ে এসো। ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) সেটা নিয়ে গিয়ে সেটার উপর لااله الاالله محمد رسول الله (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ) লেখায়ে নিয়ে আসলেন। যখন আংটি হুযূরের খেদমতে পেশ করলেন, তখন ওটার উপর লিখা ছিল لااله الاالله محمد رسول الله এবং এর সাথে ছিদ্দিকে আকবরের নামও। হুযূর জিজ্ঞেস করলেন, আবু বকর! আমি তো শুধু লা ইলাহা ইল্লাহা! লিখতে বলেছিলাম। কিন্তু তুমিতো আমার নাম এবং তোমার নামও লেখায়ে নিয়ে এসেছ। ছিদ্দিকে আকবর আরয করলেন, হুযূর, আল্লাহর নামের সাথে আপনার নাম না থাকাটা আমার মন কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না। তাই আপনার নামটা আমি নিজে লেখায়েছি কিন্তু আমার নাম! এটাতো আমি কক্ষনো লেখাইনি। ইত্যবসরে জিব্রাঈল আমীন উপস্থিত হলেন এবং আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহ তাআলা বলেন, "ছিদ্দিকে আকবর আপনার নামকে আমার নাম থেকে আলাদা করতে রাজি হয়নি। আমিও ছিদ্দিকে আকবরের নামকে আপনার নাম থেকে আলাদা করতে রাজি হইনি। ছিদ্দিকে আকবর আমার নামের সাথে আপনার নাম লেখায়েছেন। আমিও ছিদ্দিকে আকবরের নামকে আপনার নামের সাথে লিখে দিয়েছি"। (তফসীরে কবীর ৯১ পৃঃ- ১জিঃ)

সবকঃ ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খালেস সহচর ছিলেন এবং সব জায়গায় হুযূরের সাথে থাকতেন। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাঁর এ সহচায্যের প্রত্যয়নকারী ও সাক্ষী।

কাহিনী নং ১৩১

আল্লাহ তাআলার সত্যায়ন

হযরত ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) একদিন ইহুদীদের একটি মাদ্রাসায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন। ঐদিন তথায় ফখ্খাস নামে ইহুদীদের এক বড় আলেম এসেছিল এবং এ কারণে সেখানে অনেক ইহুদী সমবেত হয়েছিল।

ছিদ্দিকে আকবর ওখানে গিয়ে ফখ্‌খাসকে বললেন, হে ফখ্‌খাস, আল্লাহকে ভয় কর, মুসলমান হয়ে যাও। খোদার কসম, মুহাম্মদ আল্লাহর সাত্যিকার রসূল, যিনি সত্যবাণী নিয়ে এসেছেন এবং তোমরা তাঁর প্রশংসা তৌরীত ও ইনজীল কিতাবে পেয়েছ। অতএব তোমরা মুসলমান হয়ে যাও এবং সত্যিকার রসূলকে স্বীকার কর, নামায পড়, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহকে কর্জে হাসনা প্রদান কর, যাতে তোমরা বেহেশতে যেতে পার। ফখ্‌খাস বললো, হে আবু বকর! আমাদের খোদা কি আমাদের থেকে কর্জ চায়? আপনার কথা থেকে তো এটাই বুঝা যায় যে, আমরা ধনী এবং আল্লাহ ফকীর। এটা শুনে ছিদ্দিকে আকবরের রাগ আসলো এবং ফখ্‌খাসের মুখে একটি থাপ্পর মেরে দিলেন এবং বললেন, খোদার কসম, তোমাদের সাথে আমাদের সন্ধি না থাকলে এক্ষনিই গরদান আলাদা করে ফেলতাম। ফখ্‌খাস থাপ্পর খেয়ে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে গেল এবং ছিদ্দিকে আকবরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিদ্দিকে আকবরকে জিজ্ঞেস করলে ছিদ্দিকে আকবর আরয করলেন, হুযূর! সে এ রকম বলেছিল যে, আমরা ধনী এবং আল্লাহ ফকীর। এ কথায় আমার রাগ এসে যায়। ফখ্‌খাস সেটা অস্বীকার করলো এবং বললো যে, এ রকম কথা সে কখনো বলেনি। ঐ সময় ছিদ্দিকে আকবরের সমর্থনে আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন।

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَاءُ.

অর্থাৎ আল্লাহ ওসব লোকদের এ কথা বলতে শুনেছেন যে, আল্লাহ তাআলা ফকীর এবং আমরা ধনী।

আল্লাহ তাআলার এ সত্যায়ন ও সাক্ষ্যের দ্বারা ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) এর সত্যতা পরিস্কার হয়ে গেল।

(কুরআন করীম পারা ৪, রুকু ১০, রুহুল বয়ান, ৩৯৩ পৃঃ ১জিঃ)

সবকঃ ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) দ্বীনের ব্যাপারে খুবই স্পর্শকাতর ছিলেন। তাঁর আন্তরিক জজ্‌বার এমন শান যে, আল্লাহ তাআলাও তাঁর আন্তরিক জজ্‌বার প্রশংসা ও প্রত্যয়ন করেছেন। এর পরও যে ব্যক্তি ছিদ্দিকে আকবরের প্রশংসা করেনা, সে মুলতঃ আল্লাহ বিদ্বেষী।

কাহিনী নং ১৩২

বেলালের মুক্তি

হযরত বেলাল (রাদি আল্লাহু আনহু) ছিলেন একজন হাবশী গোলাম। যখন তিনি মুসলমান হয়ে যান, তখন তাঁর মুনিব উমাইয়া, যে রসূলের বড় দুশমন ও কাফির ছিল, তাঁকে খুবই নির্যাতন করতে লাগলো। ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) এ খবর শুনে অনেক মুখ্যবান স্বর্ণ দিয়ে ক্রয় করে হযরত বেলালকে মুক্ত করে দিলেন। ছিদ্দিকে আকবরের এ বদান্যতা আল্লাহর কাছে খুবই পছন্দ হলো এবং কুরআনে পাকে ইরশাদ ফরমান- তিনি কেবল আল্লাহর রেজামন্দির জন্য সম্পদ ব্যয় করেন এবং শীঘ্রই তিনি সন্তুষ্ট হবেন। (কুরআন করীম পারা-৩০ রুকু-১৮, রুহুল বয়ান ৬৬১ পৃঃ ৪জিঃ)

সবকঃ ছিদ্দিক আকবর (রাদিয়া আল্লাহু আনহু) স্বীয় ধনসম্পদ, সোনা চান্দি সব কিছু ইসলামের জন্য কুরবান করে দিয়েছেন। স্বয়ং আল্লাহ তাআলাও কুরআন শরীফে তাঁর প্রশংসা করেছেন এবং ইরশাদ করেছেন যে, আমি ওকে সন্তুষ্ট করবো। অতএব যে ছিদ্দিকে আকবরের প্রতি সন্তুষ্ট নয়, আল্লাহও তার উপর সন্তুষ্ট নয়।

কাহিনী নং ১৩৩

গযওয়ায়ে তাবুক

গযওয়ায়ে তাবুকের সময় হুযূর (সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সাহাবায়ে কিরামকে বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য তৈরী হয়ে যাও। তখন সময়টা ছিল খুবই অভাব অনটনের এবং দুর্ভিক্ষ বিরাজমান ছিল। এমনকি একটি খেজুর দু'জন লোক ভাগ করে খেয়ে জিন্দেগী অতিবাহিত করছিলেন। যুদ্ধস্থল অনেক দূরে ছিল এবং শত্রুও অধিক শক্তিশালী ছিল। হযরত উসমান (রাদি আল্লাহ আনহু) এ যুদ্ধে বড় সাহসিকতার সাথে সম্পদ ব্যয় করেছিলেন। তিনি দশ হাজার মুজাহেদকে অস্ত্রসস্ত্র দিয়েছেন। তাছাড়া দশ হাজার দিনারের বিনিময়ে সাজ সরঞ্জাম সহ নয়শ উট ও একশ ঘোড়া ক্রয় করে দিয়েছিলেন। অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামও যথেষ্ট খরচ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে সবের আগে হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাদি আল্লাহু আনহু) তাঁর সমুদয় সম্পদ হুযূরের সমীপে পেশ করেন। হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, "ঐদিন ঘটনাক্রমে আমার হাতে কিছু সম্পদ মওজুদ ছিল।

আমি মনে মনে স্থির করলাম যে, আজ আমি এতটুকু দান করবো যেন আবু বকর থেকেও অগ্রগামী হয়ে যেতে পারি। অতঃপর আমি আমার সমস্ত সম্পদকে দুভাগ করে এক ভাগ ঘরে রেখে বাকী অংশ হুযূরের খেদমতে নিয়ে আসলাম এবং মনে মনে সন্তুষ্টি প্রকাশ করছিলাম যে আজ আমি অনেক প্রদান করেছি আর আবু বকর থেকে অগ্রগামী হতে পারবো। কিন্তু দেখলাম যে, হযরত আবুবকর ছিদ্দিক ঘরের সমস্ত মালামাল নিয়ে আগ থেকে হুযূরের খেদমেত হাজির এবং স্বীয় সমস্ত পূঁজি বারগাহে মাহবুবে পেশ করে দিয়েছেন"। হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) এ অবস্থা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং চিন্তা করতে লাগলেন যে, তাঁর থেকে অগ্রগামী হওয়া অসম্ভব।

হুযূর (সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ছিদ্দিকে আকবরের বদান্যতা দেখে ভীষণ খুশী হলেন এবং ফরমালেন, হে ছিদ্দিক! সবকিছু এখানে নিয়ে এসেছ, নাকি ঘরের জন্য কিছু রেখে এসেছ? ছিদ্দিকে আকবরের উত্তর অনেকটা এ রকম ছিলঃ

پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس

صدیق کے لئے خداکا رسول بس۔

অর্থাৎ কীট প্রতঙ্গের জন্য আলোক বর্তিকা, বুলবুল পাখীর জন্য ফুল এবং ছিদ্দিকের জন্য রসূলে খোদা যথেষ্ট।

অল্প কিছুক্ষণ পর জিব্রাঈল আমীন উপস্থিত হলেন এবং আরয করলেন, ইয়া রসূলল্লাহ! আল্লাহ তাআলা ছিদ্দিকে আকবরকে সালাম দিয়েছেন এবং ছিদ্দিকে আকবরকে জিজ্ঞেস করতে বলেছেন যে তিনি এ অভাব অনটনের অবস্থায় আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট, নাকি অসন্তুষ্ট? হুযূর (সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এ পয়গাম যখন ছিদ্দিকে আকবরকে শুনালেন, তখন ছিদ্দিকে আকবর এ পয়গামের আনন্দে আত্ম হারা হয়ে বলতে লাগলেন-

اسخط عن ربی؟ انا عن ربی راض. انا عن ربی راض، انا عن ربی راض.

অর্থাৎ আমি কি আমার রব থেকে নারাজ হবো? আমি আমার রবের প্রতি রাজি, রাজি, রাজি।

(কনজুল ঈমান ২৭৫, পৃঃ- তারিখে খোলাফা ৩১ পৃঃ)

সবকঃ ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) সমস্ত সাহাবীগণের মধ্যে অধিক

ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তিনি আল্লাহর পথে সবকিছু উজাড় করে দিয়েছিলেন। তাঁর এমন শান যে, যে খোদার রেজামন্দির জন্য সমস্ত সৃষ্টিকূল ব্যাকুল, সে খোদা হুযূর (সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বদৌলতে ছিদ্দিকে আকবরের রেজামন্দি কামনা করেন এবং তাঁর কাছে বিশেষ সালাম প্রেরণ করেন। অতএব যে বদবখ্‌ত ছিদ্দিকে আকবরের দুশমন, সে আল্লাহর দুশমন।

কাহিনী নং ১৩৪

সাহসী ও বাহাদুর

একদিন হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) একটি সমাবেশে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনারা কি জানেন, সবলোক থেকে সাহসী ও বাহাদুর কে? সবাই একবাক্যে বললেন, জনাব, আপনি। তিনি বললেন, কক্ষনো নয়, বরং আমার থেকে অধিক সাহসী ও বাহাদুর ছিলেন ছিদ্দিকে আকবর। এটা পরীক্ষিত সত্য। বদরের যুদ্ধ যখন সম্মূখীন, তখন আমরা হুযূর (সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর জন্য একটি আস্তানা তৈরী করেছিলাম এবং ওখানে হুযূরকে বসায়ে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল যে, হুযূরকে পাহারা ও হেফাজতের জন্য কোন্ ব্যক্তি এখানে দাঁড়াবে, যেন মুর্তি পূজারীদের কেউ হুযূরের কাছে ঘেঁষ্‌তে না পারে? আমি কসম করে বলছি, ঐ সময় একমাত্র হযরত আবু বকর ছিদ্দিকই এগিয়ে এসেছিলেন এবং ঐ কথায় সম্মত হয়ে স্বীয় মাথার উপর খোলা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। (নজহাতুল মাজালিস ৩১০ পৃঃ ২জিঃ)

সবকঃ ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) সবচে অধিক দানশীল ছিলেন, আবার সবচে অধিক সাহসীও ছিলেন। হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) স্বয়ং এ কথার সাক্ষ্য দিয়েছেন।

কাহিনী নং ১৩৫

খেলাফত গ্রহণের পর প্রথম ভাষণ

হযরত ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) খেলাফতের তখ্‌তে আসীন হওয়ার পর এক সমাবেশে নিম্নের ভাষণটি দান করেন।

প্রিয় ভাইয়েরা! খলীফা নির্বাচনের লটারীতে আমার নাম উঠেছে, আমি আপনাদের খলীফা মনোনিত হয়ে গেলাম। অথচ আমি আপনাদের থেকে উত্তম ও

আফজল ছিলাম না। কিন্তু আপনাদের নেতা হয়ে গেলাম। তবে আমার নেতৃত্ব বাদশাহ কিসরা, কায়সরের মত নয়। আমার কথায় বা কাজে কাউকে অন্যায় ভাবে কষ্ট দিতে চাইনা। খুবই মনোযোগ সহকারে শুনুন, আপনাদের মধ্যে যারা শক্তি শালী আমার কাছে ঐ সময় পর্যন্ত দুর্বল, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি ওদের থেকে দুর্বলদের হক আদায় করতে না পারি এবং আপনাদের মধ্যে যারা দুর্বল, ওরা আমার কাছে শক্তিশালী, যদি যথসময়ে আমার সহায়তায় ওদের হক আদায় করা না যায়।

আর একটি বিষয় স্মরণ রাখবেন, জিহাদ থেকে কখনো অমনোযাগী হবেন না। এ কথা সব সময় স্মরণ রাখবেন, যে জাতি যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসে, সে জাতি পৃথিবীতে ভবঘুরের মত ও অপমানের বোঝা নিয়ে বেঁচে থাকে। ন্যায় এবং ন্যায়ের পথে চলা হচ্ছে আমানত এবং বিপদগামী ও মিথ্যা বলা হচ্ছে খেয়ানত। যতক্ষণ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুগামী থাকবো, ততক্ষণ আপনাদের উপর আমার আনুগত্য ওয়াজিব এবং যখন আমাকে এর ব্যতিক্রম দেখবেন, তখন বিনা সংকোচে আমার আনুগত্য অস্বীকার করবেন। তখন আমার আনুগত্য আপনাদের উপর ওয়াজিব নয়। আপনাদের অবশ্য কর্তব্য যে আমাকে সোজা রাস্তায় পরিচালনা করা। (তারিখে ইসলাম- ১৩০ পৃঃ)

সবকঃ ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) সর্ব সম্মতিক্রমে মুসলমানদের খলিফা মনোনিত হন। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর সত্য বাণী প্রচার এবং রসূলের আহকাম বাস্তবায়ন। দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। তিনি নিজেকে আল্লাহর রসূরের একজন গোলাম মনে করতেন। তিনি প্রজা সাধারণকে এ ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন যে তাদের খলিফার মধ্যে শরীয়ত বিরোধী কোন আচরণ দেখলে যেন তাঁর আনুগত্য না করে।

কাহিনী নং ১৩৬

একান্ত গোপন খাদেম

মদীনার এক প্রান্তে এক অন্ধ বৃদ্ধা বাস করতো, যার আপনজন বলতে কেউ ছিলনা। হযরত ওমর ফারুক (রাদি আল্লাহু আনহু) প্রতি রাতে ওর ঘরে যেতেন। ঘরের কাজকর্ম করে দিতেন এবং পানি এনে দিতেন। এক রাতে ওর ঘরে গিয়ে দেখেন যে, ঘরের সমস্ত কাজ অন্য একজন এসে করে গেছেন। এর পরের

রাতেও এসে দেখেন যে, সে রাতেও অন্যজন এসে সব কাজ করে গেছেন। এভাবে প্রতিরাতে এসে তিনি দেখেন যে, তাঁর আগে অন্যজন এসে বুড়ীর সব কাজ করে যান। তিনি অবাক হয়ে গেলেন, এ কে, যিনি আমার আগে এসে বুড়ীর সব কাজ করে দিয়ে যান? একরাতে তিনি খুবই আগে এসে এ গোপন খাদেমকে দেখার অপেক্ষায় রইলেন। কিছুক্ষণ পর দেখলেন যে, আগমনকারী এসে বুড়ীর কাজ করতে লাগলেন। ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এ গোপন খাদেমকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। কারণ এ গোপন খাদেম হলেন খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাদি আল্লাহু আনহু)। (তারিখে খোলাফা- ৫১পৃঃ)

সবকঃ এত বড় একজন খলিফা হওয়ার পরও জনগণের খেদমত করার অনুপ্রেরণায় এক অন্ধ বৃদ্ধার খেদমত করার জিন্মাদারী নিজে নিয়ে নিলেন। তিনি যে রসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সত্যিকার খলিফা, এটা তারই নিদর্শন। তিনিই খেলাফতের হকদার ছিলেন। তা নাহলে দুনিয়া পূজারী ও আত্ম অহংকারী শাসকদের মধ্যে এ ধরণের আচরণের কোন নজির আছে কি? মুসলমানদের আমীর মুলতঃ মুসলমানদের খাদেম হয়ে থাকে। ওনার কর্তব্য যে ধনী-গরীব সমস্ত প্রজাদের খবর রাখা এবং সবের কাজে আসা।

কাহিনী নং- ১৩৭

মাহবুবের বিরহ বেদনায়

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) এর এরকম হৃদ্যতা ছিল যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বেছাল শরীফের পর তিনি মাহবুবের বিরহ বেদনায় একেবারে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন এবং অল্প দিনের মধ্যে রোগাক্রান্ত হন। তাঁর চিকিৎসার জন্য একজন ডাক্তার ডাকা হয়। ডাক্তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর বললেন, এ রোগী কারো প্রতি মহব্বতের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁর মাহবুব তাঁর থেকে পৃথক হয়ে গেছেন। এ কারণেই তাঁর এ অসুখ হয়েছে। স্বীয় বন্ধুর দর্শন ছাড়া এর অন্য কোন চিকিৎসা নেই। যে ভাবে হোক, ওনার মাহবুবকে ওনাকে দেখাবার ব্যবস্তা করুন। (সীরাতুস সালেহীন ৯০ পৃঃ)

সবকঃ ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সত্যিকার আশেক ছিলেন।

কাহিনী নং- ১৩৮

দীদারে মাহবুব

ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) এক রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তশরীফ এনেছেন, তাঁর দেহ মুবারকে ছিল দু'টি সাদা কাপড়। কিছুক্ষণ পর সেই সাদা কাপড় দু'টি সবুজ হয়ে গেল এবং এমন ভাবে ঝক ঝক করছিল যে, ওদিকে দৃষ্টিপাত করা যাচ্ছিল না। অতঃপর হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সামনে এগিয়ে এসে হযরত আবু বকরকে 'আস্সালামু আলাইকুম' বললেন, মুসাহেফা করলেন এবং স্বীয় নূরানী হাত হযরত আবু বকরের বুকের উপর রাখলেন, যার ফলে হৃদ্পিন্ড ও বুকের কষ্ট দুরীভূত হয়ে গেল। এরপর বললেন, হে আবু বকর! এখনও কি আমার সাথে সাক্ষাতের সময় আসেনি? হযরত আবু বকর হুযূরের মুখে এ কথা শুনে এমন ভাবে কান্নাকাটি করেছেন যে, ঘরের সবাই তা শুনেছেন। ক্রন্দনরত অবস্থায় আরয করলেন, واشرفا اليك يا رسول الله হে আল্লাহর রসূল! আপনার সাথে আমার সাক্ষাতের সৌভাগ্য কখন হবে? হযরত আবু বকরের ক্রন্দনরত এ আরজি শুনে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমালেন, ভয় করো না, তোমার আমার সাক্ষাতের সময় ঘনিয়ে এসেছে। এ স্বপ্ন দেখার পর হযরত আবু বকর (রাদি আল্লাহু আনহু) খুবই উৎফুল্ল হলেন। (সীরাতুস সালেহীন ৯ ২পৃঃ)

সবকঃ হুযূরের প্রতি ছিদ্দিকে আকবরের এবং ছিদ্দিকে আকবরের প্রতি হুযূরের ভীষণ মহব্বত ছিল।

কাহিনী নং ১৩৯

অছিয়ত

হযরত ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) তাঁর শেষবারের অসুখের সময় হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু)কে ডেকে অছিয়ত করলেন, হে আলী! যখন আমার মৃত্যু হবে, তখন তুমি আমাকে তোমার নিজ হস্তে গোসল দিও, কেননা তুমি সেই হস্ত দ্বারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে গোসল করায়েছ। অতঃপর আমার পুরানো কাপড় দ্বারা কাফন পারায়ে সেই হুজরার সামনে নিয়ে রাখিও, যেখানে হুযূরের মাযার রয়েছে। এর পর যদি বিনা চাবিতে তালা এমনিতে

খুলে যায়, তাহলে আমাকে ভিতরে দাফন করিও, অন্যথায় সাধারণ মুসলমানদের কবরস্থানে নিয়ে গিয়ে দাফন করিও। (সীরাতুস সালেহীন ৯১ পৃঃ)

সবকঃ ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) যার বিরহে নিজকে উৎসর্গ করে দিচ্ছেন, মৃত্যুর পরও তিনি তাঁর সেই মাহবুবের পাশেই স্থান কামনা করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে মনে প্রাণে ভালবাসতেন এবং তাঁর সত্যিকার আশেক ছিলেন।

কাহিনী নং- ১৪০

আবু ওবাইদার স্বপ্ন

যে সময় সাহাবায়ে কিরামের মুজাহিদ বাহিনী সিরিয়া জয়ে ব্যস্ত ছিল এবং দামেস্ক জয়ের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল কিন্তু দামেস্ক বিজয়ে নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছিল, এবং সাহাবায়ে কিরামের মনে এক প্রকার উৎকণ্ঠার ভাব সৃষ্টি হয়েছিল, ঠিক সে নৈরাজ্যের সময় হযরত আবু ওবাইদা (রাদি আল্লাহু আনহু) স্বপ্ন দেখলেন যে, তাঁর তাবুতে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তশরীফ এনেছেন এবং আবু ওবাইদাকে সুসংবাদ দিলেন, হে আবু ওবাইদা! মুসলমানদেরকে বলে দাও, আজ এ স্থান জয় হয়ে যাবে, তোমরা আশ্বস্থ থেকো-এ বলে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাড়াতাড়ি ফিরে যাবার মনস্থ করলেন। হযরত আবু ওবাইদা আরয করলেন, ইয়া রাসুলল্লাহ! এ সময় হুযূরের এত তাড়াতাড়ি কিসের? ফরমালেন, হে আবু ওবাইদা! আজ আবু বকরের ওফাত হয়েছে। আমি ওর জানাযার প্রস্তুতি বাদ দিয়ে এখানে এসেছি, এক্ষনি তথায় যেতে হবে। এ বলে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চলে গেলেন। (সীরাতুস সালেহীন ৯৩ পৃঃ)

সবকঃ ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) এর সাথে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর এক বিশেষ সম্পর্ক ছিল। এখানেও এবং ওখানেও ছিদ্দিকে আকবরের উপর হুযূরের বিশেষ রহমতের দৃষ্টি রয়েছে।

কাহিনী নং- ১৪১

জানাযা

হযরত ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) তাঁর ইন্তেকালের আগে হযরত

আলী (রাদি আল্লাহু আনহু)কে বলে দিয়েছিলেন যে, তাঁর জানাযা তৈরী করে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রওজা পাকের সামনে রেখে যেন এভাবে আরয করা হয়, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রসূলল্লাহ! আবু বকর আপনার দরজায় উপস্থিত। এর পর যে রকম হুকুম হয় সে রকম যেন করা হয়। অতএব তাঁর অছিয়ত মুতাবেক তাঁর জানাযা হুজরার সাম্‌নে রেখে আরয করা হলো- ইয়া রসূলল্লাহ! আপনার গুহার সাথী আবু বকর আপনার দরজায় উপস্থিত, তাঁর একান্ত বাসনা যে, আপনার হুজরায় সমাধিত হওয়া। যদি অনুমতি পাওয়া যায়, তাহলে হুজরা শরীফে দাফন করা যেতে পারে। এটা শুনে হুজরা শরীফের দরজা যেটা বন্ধ ছিল, এমনিতে খুলে গেল এবং আওয়াজ আস্‌লো-

اُدْخِلُوا الْحَبِيْبَ اِلَى الْحَبِيْبِ فَاِنَّ الْحَبِيْبَ اِلَى الْحَبِيْبِ مُشْتَاقٌ.

অর্থাৎ বন্ধুকে বন্ধুর সাথে মিলায়ে দাও। কেননা বন্ধু বন্ধুর সাথে সাক্ষাতের জন্য ললায়িত। যখন হুজরা শরীফে হযরত আবু বকর (রাদি আল্লাহু আনহু) কে দাফন করার অনুমতি পাওয়া গেল, তখন জানাযা ভিতরে নিয়ে গেলেন, এবং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাঁধ মুবারকের কাছাকাছি দাফন করে দিলেন। (সীরাতুস সালেহীন ৯৬ পৃঃ)

সবকঃ হযরত ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) এর উচ্চ শান-মান এ কথার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনিই গুহায় দু'জনের অন্যতম ছিলেন এবং মাযারেও দু'জনের অন্যতম হলেন। নবীগণের পর ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) হলেন অদ্বিতীয়।

কাহিনী নং- ১৪২

হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ)

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদিন আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করলেন- হে আল্লাহ! ওমর বিন খাত্তাবের অস্তিত্ব দ্বারা ইসলামকে ইজ্জত দান কর। হুযূরের দুআ কি কবুল না হয়ে থাকতে পারে। এদিকে হুযূর দুআ করছেন, অন্যদিকে হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হলেন। রাস্তায় তাঁর সাথে এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হলে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ওমর, তুমি কোথায় যাচ্ছ? তিনি

বললেন, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে কতল করার জন্য যাচ্ছি। লোকটি বললেন, ভাল কথা, তবে এ রকম করলে বণী হাশেম থেকে কি নিরাপদ থাকা যাবে? আর নিজের ঘরের খবর কিছু রাখ কি? তোমার বোন ফাতিমা ও তোমার ভগ্নিপতি সাঈদ বিন যায়েদওতো মুসলমান হয়ে গেছে। হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) এ খবর শুনে রাগে থর থর করে কাঁপতে লাগলেন এবং বললেন, ঠিক আছে, প্রথমে ওদেরকে শায়েস্তা করি- এ বলে তিনি বোনের ঘরের দিকে গেলেন এবং কিছুক্ষণ ঘরের বাইরে অবস্থান করলেন, এ সময় তিনি বোনের কণ্ঠস্বর শুনলেন। অতপর অতর্কিত ভাবে ঘরে প্রবেশ করে বোনকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মুখে কিসের আওয়াজ শুনলাম? বোনের মুখ থেকে কোন কথা বের হচ্ছিল না। ঐ সময় ওমরের বোন ও ভগ্নিপতিকে এক সাহাবী সূরা তোয়াহা পড়াচ্ছিলেন, হযরত ওমরের আভাস পেয়ে ওনাকে ঘরের এক কিনারে লুকায়ে রাখলেন এবং ওমরের ভগ্নিপতি হযরত সাঈদ সাহস করে ওমরের সাম্‌নে গিয়ে বললেন, ভাইজান! আচ্ছা, আমরা যদি হকের উপর থাকি, তবুও কি আপনি আমাদেরকে খারাপ মনে করবেন? এ কথা শুনে হযরত ওমরের রাগ আরও বৃদ্ধি পেল। তিনি তাঁর ভগ্নিপতিকে জোরে ধাক্কা দিলেন এবং দু চারটি ঘুষি মেরে দিলেন। স্বামীর এ অবস্থা দেখে হযরত ওমরের বোন ফাতিমা অস্থির হয়ে দৌড়ে গেলেন এবং স্বামীকে ভাই থেকে আলাদা করলেন। কিন্তু হযরত ওমর ওকেও ছাড়লেন না। ওকেও মেরে রক্তরঞ্জিত করে দিলেন। রাগ স্তমিত হওয়ার পর বোনকে ডেকে বললেন, যেটা তোমরা পড়ছিলে, সেটা আমাকে দেখাও। হযরত ফাতেমা বললেন, ভাই, ওটা কেবল পবিত্র লোকেরাই স্পর্শ করতে পারে, প্রথমে আপনি পবিত্র হয়ে নিন। হযরত ওমর বোনের বাতলানো পদ্ধতি মুতাবেক অযু করলেন এবং সেই পুস্তিকাটা হাতে নিলেন এবং পড়তে লাগলেন-

طٰهٰ مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰى اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى....
اِنَّنِىْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ

পর্যন্ত পড়ার পর তাঁর অন্তরে এমন ভাবাবেগ সৃষ্টি হলো যে তিনি অশ্রুসজল নয়নে বলতে লাগলেন, আমাকে এক্ষুনি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট নিয়ে চল। হযরত ওমরের মুখে একথা শুনে সেই সাহাবী যিনি হযরত ওমরে বোন ও ভগ্নিপতিকে কুরআন শিক্ষা দিচ্ছিলেন, ভীষণ আনন্দিত হলেন এবং লুকানো অবস্থা থেকে বের হয়ে এসে বললেন, ওমর, তোমার প্রতি শুভ সংবাদ,

আমি রসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে আল্লাহ তাআলার দরবারে এ ভাবে দুআ করতে শুনেছি, হে আল্লাহ! ওমর বিন খাত্তাবের দ্বারা ইসলামকে ইজ্জত দান কর। এর পর হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সমীপে উপস্থিত হওয়ার জন্য রওয়ানা দিলেন। কাছে গিয়ে দেখেন, হযরত হামজা (রাদি আল্লাহু আনহু) সহ আরো কয়েক জন লোক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। লোকেরা হযরত ওমরকে দেখে ভয় পেয়ে গেলেন এবং ওনার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গেলেন। হযরত হামজা (রাদি আল্লাহু আনহু) বললেন, আল্লাহ তাআলা যদি ওমরের কল্যাণ কামনা করেন, তাহলে ওকে ইসলামের বদৌলতে হেদায়েত করবেন আর যদি অন্য কিছু কামনা করেন, তাহলে ওমরকে হত্যা করাটা আমাদের জন্য কোন কঠিন কাজ নয়। এদিকে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে হযরত ওমরের আগমণ বার্তা পৌঁছার সাথে সাথে তিনি ঘর থেকে বের হলেন এবং ওমরের কাপড় টেনে ধরে বললেন, ওমর! তুমি কি এখনো বিরত হবে না? পুনরায় হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই দুআটি উচ্চারণ করলেন, 'হে আল্লাহ! ওমর বিন খাত্তাবের অস্তিত্ব দ্বারা ইসলামের ইজ্জত দান কর'। হুযুরের পবিত্র মুখ থেকে এ শব্দগুলো যখনই বের হলো, হযরত ওমর তখন জোর গলায় বলে উঠলেন-

اَشْهَدُ اَنْ لَّآاِلٰهَ اِلَّاللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ـ

(আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং আপনি আল্লাহর রসূল।

(তারীখুল খোলাফা ৭৯ পৃঃ নজহাতুল মাজালেস ৩১৩ পৃঃ ২জিঃ)

সবকঃ সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম (রাদি আল্লাহু আনহুম) অনেক উচ্চ শান-মানের অধিকারী। কিন্তু হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) এর এটা একটা আলাদা শান যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত ওমরকে আল্লাহ থেকে চেয়ে নিয়েছেন। যে জিনিসটা একান্ত কামনা করে অর্জন করা হয়, সেটা খুবই প্রিয় হয়ে থাকে। তাই যারা হযরত ওমর (রাদি আল্লাহ আনহু) এর বিরোধী, ওরা মুলতঃ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মর্জির বিরোধী।

কাহিনী নং- ১৪৩

সত্যের ডাক

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর যখন ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) ঈমান আনলেন এবং মুসলমান হয়ে গেলেন, তখন ইসলামে নব জাগরন সৃষ্টি হলো এবং কাফিরদের মধ্যে হতাশা দেখা দিল। মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম ছিল এবং তাঁরা তাদের অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় কার্য্যাদি প্রকাশ্যে আদায় করতে পারতেন না। কিন্তু হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) এর ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে মুসলমানদের মধ্যে এক বিশেষ জজবা সৃষ্টি হয়ে গেল। হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) একদিন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সমীপে আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা তো সত্য ধর্মের উপর আছি এবং কাফিরেরা বিপথে আছে। তাই আমরা নিজেদের ধর্মকে কেন গোপন রাখবো? ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই জাতে পাকের কসম, যিনি আপনাকে সত্য ধর্ম সহকারে প্রেরণ করেছেন। এমন কোন সমাবেশ হয়নি, যেটাতে আমি কুফরীর সহায়তার জন্য যোগদান করিনি। কিন্তু এখন ইসলামের প্রসার ও সহায়তার জন্য নিশ্চয় আমি ওসব সমাবেশে যোগদান করবো। এটা বলার পর হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) নবীর বারগাহ থেকে বের হলেন এবং কাবা শরীফ তওয়াফ করলেন। তিনি কাবা শরীফের আশে পাশে ঘুরা ফেরা করতে ছিলেন এবং মুখে জোরে জোরে কলেমা শরীফ পড়তে ছিলেন। মক্কার মুশরীকরা এটা শুনে তাঁর উপর ঝাপিঁয়ে পড়ে এবং সবাই মিলে তাঁকে আক্রমন করে। হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) একাই সবের সাথে মুকাবিলা করলেন এবং ওদের মধ্যে থেকে একজন মুশরিককে মাটিতে ফেলে ওর বুকের উপর বসলেন এবং তাঁর দু'টি আঙুলি ওর দু'চোখে ঢুকায়ে দিলেন। লোকটির চিৎকারে সমস্ত মুশরিক ওমরের ভয়ে পালিয়ে গেল। এর পর থেকে হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) প্রতিটি সমাবেশে প্রকাশ্যে সত্যের ডাক দিয়েছেন এবং কাফিরদেরকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন, যারা সত্য নবী ও সত্য ধর্মের বিরোধীতা করবে, আমার তালোয়ার এর ফয়সালা করবে। এর পর একদিন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে আরয করলেন, ইয়া রসূলল্লাহ, কোন সভা-সমাবেশ বাকী রাখিনি, যেটাতে সত্যবাণী ঘোষণা করিনি। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটা শুনে খুবই সন্তুষ্ট হলেন এবং কাবা শরীফ তওয়াফ

করার জন্য বের হলেন। হযরত হামজা (রাদি আল্লাহু আনহু) পিছনে পিছনে ছিলেন, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রকাশ্যে তওয়াফ করলেন এবং মুসলমানগণ কাফিরদের সাম্নে নামায আদায় করলেন। (নজহাতুল মাজালিস ৩১৪ পৃঃ ২জিঃ)

সবকঃ হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) এর বদৌলতে ইসলামের জয় যাত্রা সাধিত হয়েছিল। তাই যাদের মনে ওমরের প্রতি বিদ্বেষ রয়েছে, তা ইসলামের প্রতি বিদ্বেষের নামান্তর।

কাহিনী নং ১৪৪

জাহান্নামের তালা

হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম একবার হযরত ওমর (রাদি আল্লাহ আনহু) এর ছেলে হযরত আবদুল্লাহ (রাদি আল্লাহু আনহু)কে বললেন, হে জাহান্নামের তালার ছেলে! হযরত আবদুল্লাহ স্বীয় পিতা সম্পর্কে এ ধরণের উক্তি শুনে খুবই নাখোশ হলেন এবং ঘরে গিয়ে হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু)কে বললেন, আব্বাজান, আবদুল্লাহ বিন সালাম আপনাকে জাহান্নামের তালা বলেছেন। হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) এ কথা শুনে আবদুল্লাহ বিন সালামের কাছে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমার সম্পর্কে এ রকম শব্দ কেন প্রয়োগ করলেন? আবুদল্লাহ বিন সালাম বললেন, এর কারণ হচ্ছে, আমাকে আমার আব্বাজান এবং ওনাকে ওনার বাপ দাদারা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের বরাত দিয়ে বলেছেন যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বলেছেন, আমাকে জিব্রাইল আলাইহিস সালাম জানায়েছেন যে, শেষ যুগের নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উম্মতের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করবেন, যাকে ওমর বিন খাত্তাব বলা হবে। সেই মুবারক আত্মা যতদিন উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে থাকবে, ততদিন জাহান্নামের দরজা বন্ধ থাকবে। তিনি জাহান্নামের তালা সদৃশ হবেন। কিন্তু যখন তিনি ইন্তেকাল করবেন, তখন জাহান্নামের দরজা খুলে যাবে এবং লোকেরা কু প্রবৃত্তির বসবর্তী হয়ে নানা পেরেশানীতে এদিক সেদিক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। (নজহাতুল মাজালিস ৩১৮ পৃঃ ২ জিঃ)

সবকঃ হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) এর পবিত্র সত্বা সম্পর্কে কুৎসা রটনাকারী নিজের জন্য জাহান্নামের দরজা উন্মুক্ত করে।

কাহিনী নং- ১৪৫

হযরত ওমরের ব্যক্তিত্ব

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন এক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসলে এক মেয়ে তাঁর সমীপে এসে আরয করলো, ইয়া রসূলল্লাহ! আমি মানত করেছিলাম যে আপনি সহি সালামতে যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসলে আপনার সামনে দফ বাজাবো এবং সংগীত পরিবেশন করবো। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন, তুমি যদি তাই মানত করে থাক, তাহলে মানত পূর্ণ কর। অতঃপর মেয়েটি দফ বাজাতে লাগলেন। ইত্যবসরে হযরত আবু বকর তশরীফ আনলেন, মেয়েটি দফ বাজাতে রইলেন। কিছুক্ষণ পর হযরত আলী তশরীফ আনলেন, মেয়েটি তখনও যথারীতি দফ বাজাতে রইলেন। কিন্তু যখন হযরত ওমরের আগমনের আভাস পেল, তখন তাড়াতাড়ি দফটা উরুর নীচে লুকায়ে ফেললো এবং নিজে সেই দফের উপর বসে গেল। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ দৃশ্য দেখে বললেন, ওমর! শয়তান তোমাকে ভীষণ ভয় করে। এ মেয়েটি আমার সামনেতো দফ বাজাচ্ছিল, কিন্তু তোমাকে দেখে সে দফ লুকায়ে ফেললো। (মিশকাত শরীফ-৫৫ পৃঃ)

সবকঃ এটা হযরত ওমর (রাদি আল্লাহ আনহু) এর ব্যক্তিত্ব যে, শয়তান তাঁর অস্থিত্বকে ভয় করে বরং তাঁর নাম শুনলেও কেঁপে উঠে। এটাও বুঝা গেল যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এমন ক্ষমতা আছে যে, যাকে ইচ্ছে এবং যেটা ইচ্ছে, সেটার অনুমতি দিতে পারেন।

কাহিনী নং- ১৪৬

হযরত ওমরের প্রভাব

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মেরাজ থেকে ফিরে আসার পর ফরমায়েছেন, আমি জান্নাতে এক বিরাট মহল দেখেছি, যেটার আঙ্গিনায় বসে এক মহিলা অযু করতে ছিল। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম এ মহলটা কার? আমাকে বলা হলো যে, এ মহলটা ওমরের। হে ওমর! আমি মহলের ভিতরে যেতাম কিন্তু তোমার প্রভাবের কথা স্মরণ করে ভিতরে যাইনি, ফিরে চলে আসলাম। হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) আরয করলেন, ইয়া রসূলল্লাহ! আমিকি আপনাকে প্রভাব

দেখাই? আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান, ইয়া রসূলল্লাহ! এ রকম কি হতে পারে? অতপর ওমর কাঁদতে লাগলেন। (মিশকাত শরীফ ৫৪৯ পৃঃ তারীখুল খোলাফা-৮৩ পৃঃ)

সবকঃ হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) এত প্রভাবশালী ও মর্যাদাবান ছিলেন যে যার সাক্ষ্য স্বয়ং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দিতেছেন। এর পরও যে, হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) এর ব্যক্তি সত্বার উপর অভদ্রোচিত আক্রমণ করে, সে বড় বেআদব।

কাহিনী নং- ১৪৭

ফারুকী ইনসাফের শান

কোন এক সময়ের ঘটনা, হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) মদায়েনে সেনা বাহিনী প্রেরণ করলেন। যখন সেনাবাহিনী দজলা নদীর কিনারে পৌঁছেলেন তখন তথায় কোন জাহাজ বা নৌকা ছিল না। সেনা বাহিনীর জেনারেল হযরত সাদ বিন আবি ওকাছ (রাদি আল্লাহু আনহু) কিভাবে পার হওয়া যায়, তা চিন্তা করতে ছিলেন। এসময় খালিদ বিন ওলীদ (রাদি আল্লাহু আনহু) বাহিনী থেকে এগিয়ে এসে বললেন, হে নদী! তুমি যদি আল্লাহর হুকুমে প্রবাহিত, তাহলে তোমাকে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইজ্জত ও হযরত ওমরের ন্যায় বিচারের দোহাই দিয়ে বলছি, তুমি আমাদের রাস্তা করে দাও, যাতে আমরা সহজে পার হয়ে যেতে পারি- এ বলে উভয় জেনারেল সাহস করে ঘোড়া সহ নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁদের দেখা দেখি তাঁদের অনুগত বাহিনীর সবাই ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। নদী এ পবিত্র বাহিনীকে রাস্তা করে দিলেন এবং ওনাদের ঘোড়াগুলোর পায়ের তলায়ও পানি লাগেনি, সবাই সহীহ সালামতে পার হয়ে গেলেন। (নজহাহুল মাজালিস ৩১৯ পৃঃ ৩ জিঃ)

সবকঃ হযরত ওমর (রাদি আল্লাহ আনহু) এর ন্যায় বিচারের বরকত হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বদৌলতে প্রকাশ পেয়েছে এবং কোন নৌজান ছাড়া সমস্ত বাহিনী নদী পার হয়ে গেল। উক্ত ঘটনার দ্বারা এটাও বুঝা গেল যে, সত্যিকার মুসলমানগণ নিজেদের নবীর ইজ্জত এবং নিজেদের আমীরের ন্যায় বিচারের প্রতি আস্থা রাখেন এবং যত বড় বাঁধা আসুক না কেন, কোন পরওয়া করেন না।

কাহিনী নং- ১৪৮

গায়বী আওয়াজ

একবার হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) কোন এক দেশে জিহাদের জন্য হযরত সারিয়া (রাদি আল্লাহু আনহু)কে সেনানায়ক নিয়োগ করে সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেন। হযরত সারিয়া (রাদি আল্লাহু আনহু) সে দেশে গিয়ে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করতে লাগলেন। এদিকে মদীনা মনোয়ারায় এক জুমার খুতবা দেয়ার সময় হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বলে উঠলেন, "হে সারিয়া, পাহাড়ের সন্নিকটে থাকো, পাহাড়কে নিজেদের পিছনে রেখো।" লোকেরা খুতবার মধ্যে এ ধরণের অপ্রাসঙ্গিক কথা শুনে বিস্মিত হলেন। সারিয়াতো দূরের কোন দেশে জিহাদ করতেছেন, এখান থেকে ওনাকে ডাক দেয়ার কি অর্থ হতে পারে? কিছুদিন পর জিহাদের ময়দান থেকে এক বার্তা বাহক এসে বললেন, কাফিরদের সাথে আমাদের জোর লড়াই চলছিল এবং কাফিরেরা আমাদের উপর জয়ী হবার প্রায় কাছা কাছি পৌঁছে গিয়েছিল। হঠাৎ আমরা গায়বী আওয়াজ শুনতে পেলাম- হে সারিয়া, পাহাড় সংলগ্ন থেকো এবং পাহাড়কে নিজেদের পিছনে রেখো। আমরা সেই নির্দেশ অনুযায়ী জিহাদ করলাম। পাহাড়কে আমাদের পিছনে রেখে পিঠকে নিরাপদ করলাম অতঃপর জোরালোভাবে শত্রুদের উপর আক্রমণ চালালাম। ফলে শত্রুরা পরাভূত হলো এবং আল্লাহ আমাদেরকে জয় যুক্ত করলেন। (মিশকাত শরীফ)

সবকঃ ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর যুগে ফারুকে আযমের বরকতে মুসলমানগণ অনেক বড় বড় যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন। এটাও জানা গেল যে, আল্লাহর মকবুল বান্দাদের চোখের সামনে কোন পর্দা থাকে না তাঁরা অনেক দূরের জিনিস দেখে ফেলেন এবং অসহায়দের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। ওনাদের সাহায্যে বিফলতা থেকে সফলতা অর্জিত হয়। আল্লাহ ওয়ালাগণ দূরের আওয়াজও শুনেন। যেমন হযরত সারিয়া হযরত ওমরের আওয়াজ শুনেছিলেন।

কাহিনী নং- ১৪৯

ঈমানী দৃষ্টি

ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর খেলাফত কালে হযরত আলী (রাদি

আল্লাহু আনহু) এমন একটি স্বপ্ন দেখলেন যে, মসজিদে নববীতে স্বয়ং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফজরের নামায পড়াচ্ছেন এবং হযরত আলীও হুযূরের একতেদায় নামায পড়ছেন। সালাম ফিরানোর পর হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)মসজিদের দেয়ালের সাথে পিঠ মুবারক লাগিয়ে বসলেন। ইত্যবসরে এক মহিলা এক খাঞ্চা খেজুর নিয়ে হাজির হলেন এবং হুযূরের সামনে সেই খাঞ্চা রেখে দিলেন। হুযূর আকরম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেখান থেকে একটি খেজুর উঠায়ে হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু)কে দিলেন এবং অবশিষ্ট খেজুর গুলো অন্যান্য নামাযীদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। হযরত আলীর ঘুম ভাঙ্গার পর লক্ষ্য করলেন যে সেই খেজুরের স্বাদ ও মিষ্টি তখনও তাঁর মুখে ছিল। ঠিক ফজরের সময় তাঁর ঘুম ভেঙ্গেছিল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মসজিদে নববীতে গেলেন, এবং দেখলেন যে হযরত ওমর ফারুক (রাদি আল্লাহু আনহু) নামায পড়াচ্ছেন। তিনি জমাতে শরীক হয়ে গেলেন। সালাম ফিরানোর পর হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) মসজিদের দেয়ালে সেই রকম ঠেস দিয়ে বসে গেলেন, যে রকম হযরত আলী স্বপ্নে হুযূরকে দেখে ছিলেন। কিছুক্ষণ পর একজন মহিলাও এক খাঞ্চা খেজুর নিয়ে উপস্থিত হলেন এবং হযরত ওমর ফারুকের সামনে রাখলেন। হযরত ওমর ওখান থেকে একটা খেজুর নিয়ে হযরত আলীকে দিলেন এবং অবশিষ্ট খেজুরগুলো অন্যান্য নামাজীদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু)কে বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন! আমাকে আর একটি খেজুর দিলে কি হতো? হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) বললেন, হে আলী, রাত্রে যদি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনাকে আর একটি খেজুর দিতেন, তাহলে এ সময় আমিও আপনাকে আর একটি দিতাম। যখন সরকার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেননি, তখন আমি কি করে দিব।

হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) বললেন, হে ওমর! এ স্বপ্নের কথা আপনার কি করে জানা হয়ে গেল? হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) বললেন, হে আলী! মুমিন বান্দা ঈমানী নূর দ্বারা সব কিছু দেখে ফেলেন। (নজহাতুল মাজালিস ১৫৭পৃঃ ২ জিঃ)

সবকঃ যে জায়নামাযে হযরত আলী স্বপ্নে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে নামায পড়াতে দেখেছেন, সেই জায়নামাযে জাগ্রতাবস্থায় হযরত ওমর

ফারুককে নামায পড়াতে দেখলেন। এতেই বুঝা যায় যে, ফারুকে আযম হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সত্যিকার স্থলাভিষিক্ত। মুমিনের দৃষ্টি থেকে কোন কিছু গোপন থাকে না। যারা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে এরকম বলে যে, তাঁর কাছে দেয়ালের পিছনের খবরও নেই, তাঁদের থেকে বড় জাহিল ও মুর্খ আর কেউ নেই।

কাহিনী নং- ১৫০

ন্যায় বিচার

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে এক ইহুদীও এক মুনাফেকের মধ্যে কোন এক বিষয়ে ঝগড়া হয়েছিল। ইহুদী লোকটি চাচ্ছিল যে কোন ভাবে ওকে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দরবারে নিয়ে যেতে। শেষ পর্যন্ত সে আপ্রাণ চেষ্টা করে ওকে হুযূরের সমীপে নিয়ে গেল। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘটনার বিবরণ শুনে ইহুদীর পক্ষে রায় দিলেন। মুনাফেক লোকটি ইহুদীকে বললো, আমি ওমরের কাছে যাবো এবং ওনার রায় গ্রহণ করবো। ইহুদী লোকটি বললো, তুমি দেখছি বড় অদ্ভুত লোক! কেউ কি উচ্চ আদালত থেকে নিম্ন আদালতে যায়? যখন তোমাদের নবী ফয়সালা দিয়েছেন, তখন ওমরের কাছে যাবার কি প্রয়োজন? মুনাফেক লোকটি কোন যুক্তি মান্‌তে রাজি নয়। সে ওকে নিয়ে হযরত ওমরের কাছে গেল এবং ওমরের রায় চাইলো। ইহুদী লোকটি বললো, জনাব, প্রথমে আমর বক্তব্যটা শুনুন, আমরা এর আগে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে রায় নিয়েছি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার পক্ষে রায় দিয়েছেন। কিন্তু এ লোকটি সেই রায়ের উপর সন্তুষ্ট নয়। তাই আপনার কাছে এসেছে। এ কথা শুনে হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) বললেন, তাই নাকি, ঠিক আছে, তোমরা অপেক্ষা কর আমি এক্ষুনি আসতেছি এবং তোমাদের ফয়সালা করে দিচ্ছি- এ বলে তিনি ঘরের ভিতরে গেলেন এবং একটি তলোয়ার নিয়ে এসে বললেন, "যে হুযূরের ফায়সালা মানে না ওর ফয়সালা এটা" বলে ওর গরদান দিখন্ডিত করে ফেললেন।

এ খবর যখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কানে পৌছলো, তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন, বাস্তবিকই ওমরের তলোয়ার কোন মুমিনের উপর আঘাত হানে না। এর পর আল্লাহ তাআলাও এ

আয়াত নাজিল করেন।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ۔

অর্থাৎ আপনার প্রভূর কসম! এ লোক কখনো মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ আপনার হুকুম মান্য করে না এবং আপনার ফয়সালা গ্রহণ করে না। (তারীখে খোলাফা- ৮৮ পৃঃ)

সবকঃ হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বোচ্চ বিচারক এবং তাঁর রায়ই মুমিনদের জন্য মেনে নেয়া অপরিহার্য। যে তাঁর ফায়সালা মানেনা, সে অপরাধী। হযরত ওমরের এ আচরণকে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সমর্থন দিয়েছেন এবং স্বয়ং আল্লাহ তাআলাও সমর্থন করেছেন।

কাহিনী নং- ১৫১

পানির উপর হুকুমদারী

মিসরের নীলনদ প্রতি বছর শুকায়ে যেত এবং একটি সুন্দরী যুবতী নদীর নামে বলি না দেয়া পর্যন্ত ওরকম শুক্না রয়ে যেত এবং প্রবাহিত হতো না। হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) এর খেলাফত কালে মিসর বিজয়ের পর হযরত আমর ইবনুল আস (রাদি আল্লাহু আনহু) তথাকার গভর্ণর নিযুক্ত হন। কিছুদিন পর তিনি শুনলেন যে নীল নদ শুকায়ে গেছে। তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, প্রতি বছর এ নদী এ ভাবে কি শুকায়ে যেতো? লোকেরা বললো, হ্যাঁ জনাব, এভাবে শুকায়ে যেতো এবং একটি সুন্দরী যুবতী বলি না দেয়া পর্যন্ত প্রবাহিত হতো না। হযরত আমর ইবনুল আস বললেন, একজন নিরাপরাধ যুবতীকে অন্যায় ভাবে হত্যা করা ইসলাম অনুমোদন করে না। ধৈর্যধারণ করুন এবং আল্লাহ তাআলা কি করে দেখুন। অতঃপর তিনি উক্ত ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) এর কাছে একখানা চিঠি দিলেন। এ চিঠি যখন হযরত ওমরের কাছে পৌছলো এবং ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন, তখন তিনি দুটি চিঠি লিখলেন- একটি নদীর নামে এবং একটি গভর্ণরের নামে। নদীর নামে লিখিত চিঠির বিষয়বস্তু ছিল-

من عبد الله عمر بن الخطاب الى نيل مصر اما بعد ان كنت تجرى با مرالله فانا نسئل اجراءك من الله وان كنت تجرى من عندك فلا حاجة لنابك.

অর্থাৎ এ চিঠি আল্লাহর বান্দা ওমর বিন খাত্তাবের পক্ষ থেকে নীল নদীর নামে; হে নদী, তুমি যদি আল্লাহর হুকুমে প্রবাহিত ছিলে, তাহলে আমি আল্লাহ কাছে এখনও তোমার প্রবাহ কামনা করি। আর যদি তুমি নিজের ইচ্ছায় প্রবাহিত হও এবং নিজের ইচ্ছায় থেমে যাও, তাহলে আমাদের কাছে তোমার কোন প্রয়োজন নেই, তোমার কোন পরওয়া করি না।

আমীরুল মোমেনীনের এ অদ্ভুত নির্দেশনামার কথা শুনে সমগ্র মিসরে হৈ চৈ পড়ে গেল। লাখ লাখ লোক এ দৃশ্য দেখার জন্য নীলনদের পাড়ে সমবেত হলো। মিসরের গভর্ণরও অনেক লোক সহ হযরত ফারুকে আযমের চিঠি নিয়ে নদীর কিনারে পৌছলেন এবং নদীর মাঝখানে গিয়ে ফারুকে আযমের নির্দেশনামা নদীকে পৌছায়ে দিয়ে কিনারায় ফিরে আসলেন। কয়েক মুহূর্ত পর দেখা গেল, নীলনদ এমন জোরে শোরে প্রবাহিত হতে লাগলো যে বলি দিয়েও আগে কখনো এ রকম প্রবাহিত হয়নি এবং অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর ১৮ ফুট অধিক উচ্চতায় পানি প্রবাহিত হতে লাগলো। এর পর থেকে আজ পর্যন্ত সেই প্রবাহ অব্যাহত রয়েছে। (তারীখুল খোলাফা ৯০ পৃঃ)

সবকঃ ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) আল্লাহ এবং তাঁর হাবীব হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সত্যিকার অনুগত ছিলেন এবং এ পরিপূর্ণ আনুগত্যের ফলশ্রুতিতে নদীও তাঁর অনুগত ছিল এবং তাঁর হুকুমত পানির উপরও চলতো। কিন্তু আজ আমরা আল্লাহ ও রসূল থেকে মুখ ফিরায়ে নিয়েছি। ফলে এ পানি জলোচ্ছাসের আকৃতিতে আমাদেরকে ধ্বংস করছে।

কাহিনী নং- ১৫২

ফকীরের মত বাদশাহ

বুযর জমহর (নওশিরওয়া বাদশাহের বুদ্ধিমান উজির) ওমর ফারুক (রাদি আল্লাহু আনহু) এর খেদমতে স্বীয় দূত প্রেরণ করলো, যেন সে মুসলমানদের এত বড় প্রভাবশালী বাদশার বেশ ভূষা ও চাল চলন কি রকম, তা দেখে যায়। সেই দূত মদীনা মনোয়ারায় গিয়ে মুসলমানগণকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, আপনাদের বাদশাহ কোথায় আছেন? মুসলমানগণ জবাব দিলেন, তিনি তো আমাদের বাদশাহ নন বরং আমীর। তিনি এ মাত্র ঘর থেকে বের হয়েছেন। তখন সে, যে পথে ওমর

গেছেন, সে পথে খুঁজতে লাগলেন। কিছু দূর গিয়ে দেখেন, হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) রাস্তার এক কিনারে চাবুকটা মাথার নিচে রেখে সূর্যের তাপে শুয়ে রয়েছেন এবং নুরানী কপাল থেকে ঘাম বের হয়ে মাটি ভিজে গেছে। হযরত ওমরের এ অবস্থা দেখে, দূতের মনে দারুন রেখাপাত করলো এবং মনে মনে চিন্তা করতে লাগলো, সারা দুনিয়ার বড় বড় বাদশাহগণ যার ভয়ে কম্পমান, আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি একজন সাধারণ মানুষের মত জীবন যাপন করেন। সে হযরত ওমরকে সম্বোধন করে বললো, হে আমীরুল মোমেনীন! আপনি ন্যায় পরায়ন শাসক; এজন্য নির্ভয়ে শুয়ে রয়েছেন আর আমাদের বাদশাহ হচ্ছে জালিম; এজন্য সদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনাদের ধর্ম সঠিক। আমি যদি দূত হয়ে না আসতাম, তাহলে এক্ষুনি মুসলমান হয়ে যেতাম। তবে আমি আবার এসে মুসলমান হয়ে যাব। (কিমিয়ায়ে সাদাত ২৬৭ পৃঃ)

সবকঃ ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এঁত বড় শান-মানের অধিকারী হওয়া সত্বেও মনমানসিকতা ছিল সাধারণ ধর্ম পরায়ন ও সহজ সরল মানুষের মত। আল্লাহ ওয়ালাগণের স্বভাব চরিত্র এ রকমই হয়ে থাকে।

কাহিনী নং- ১৫৩

সন্মানিত অবগুণ্ঠনকারী

সন্মানিত ও পবিত্র শহর মদীনা মনোয়ারার ঘটনা, তখন ছিল হযরত ফারুকে আযমের খেলাফত কাল। ফারুকে আযমের মাথায় খেলাফতে নববীর তাজ শোভা পাচ্ছিল এবং চারি দিকে ন্যায় পরায়ন ও ন্যায় বিচারের জয়গান শুনা যাচ্ছিল। রাত প্রায় আধা আধি হয়েছে, প্রিয় নবীর আবাস ভূমির ভাগ্যবান বাসিন্দারা নিজ নিজ ঘরে ঘুমায়ে পড়েছেন। প্রায় অর্ধ রাত্রে এ পবিত্র শহরে এক অবগুণ্ঠনকারী নিজের একজন সাথীকে সঙ্গে নিয়ে শহরে টহল দিতে লাগলেন। অলি গলি এবং প্রতিটি ঘর-বাড়ীর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে এগুচ্ছিলেন। হঠাৎ একটি ঘরে মৃদু আলো দেখতে পেলেন। অবগুণ্ঠনকারী ওখানে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সাথীকে সম্বোধন করে বললেনঃ

অবগুণ্ঠকারীঃ তুমি লক্ষ্য করছ, ঐ ঘরে আলো দেখা যাচ্ছে। আমার মনে হয় ঘরের অধিবাসী এখনও জাগ্রত।

সাথীঃ জি, হ্যাঁ, হুযূর তাই হবে। বাচ্চাদের কান্নার আওয়াজও ভেসে আসতেছে। ওদের মা কি যেন বলছে এবং ওদেরকে শান্ত করার জন্য চেষ্টা করছে।

অবগুণ্ঠনকারীঃ চুপ করে শুন এবং লক্ষ্য কর ঘটনাটা কি।

অতঃপর উভয়ে একেবারে নিশ্চুপ হয়ে কান লাগিয়ে ঘরের আওয়াজ শুনতে লাগলেন। তাঁরা মা ও বাচ্চাদের মধ্যে নিম্নের কথোপকথনগুলো শুনতে পেলেনঃ

১ম বাচ্চাঃ আম্মাজান, সময় অনেকক্ষণ অতিবাহিত হলো? মনে হয় প্রায় অর্ধরাত হয়ে গেছে। এখনো খাবার তৈরী হলোনা এবং আমরাও কিছু খেলাম না।

২য় বাচ্চাঃ আম্মজান, দেখ, তোমার বাচ্চা ক্ষুধায় মারা যাচ্ছে, আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু খেতে দাও, আম্মাজান, কিছু খেতে দাও।

৩য় বাচ্চাঃ (ক্রন্দনরত অবস্থায়) হে আল্লাহ, দয়া করুন, আমাদের ডেকসির খাবারটা তাড়া তাড়ি তৈরী করে দিন, যেন আমরা খেতে পারি এবং জান রক্ষা করতে পারি।

মাঃ আমার ছোট্ট মনিরা, নিরাশ হয়ো না, সবর কর এবং আল্লাহর উপর ভরসা রেখো। দেখ, তোমাদের সামনেতো ডেকসি চুলায় দিয়েছি। আল্লাহর হুকুম হলে এখনই সবরের ফল পাবে এবং সবাই মিলে খাবার খেতে পারবে।

এ কথোপকথন শুনে সেই অবগুণ্ঠনকারী আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁর সাথীকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। বাচ্চারা এবং ওদের মা আগুন্তুক ব্যক্তিদ্বয়কে দেখে ঘাবড়িয়ে গেল এবং মহিলাটি বলেউঠলোঃ

তোমরা কে? এবং আমার ঘরে কেন প্রবেশ করেছ?

অবগুণ্ঠনকারীঃ বোন, আমরা কোন চোর ডাকাত নই। বিশেষ একটি মহৎ উদ্দেশ্যে তোমার ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তোমার ও তোমার বাচ্চাদের কথোকথন শুনে শিহরিয়ে উঠলাম এবং আসল ঘটনা জানার জন্য ঘরে প্রবেশ করলাম।

মহিলাঃ ভাই, তোমাদের কাজে তোমরা চলে যাও। জানা নেই, পরিচয় নেই আমি অভাগিনীর কাহিনী শুনে কি করবে? আর শুনলেও আমার কি উপকার হবে

এবং না শুনলে তোমাদের কি ক্ষতি হবে?

অবগুণ্ঠনকারীঃ বোন, তুমি আমাকে শত্রু মনে কর না এবং এখানে আমার আগমনটা অনর্থক মনে কর না, আমাকে তোমার শুভাকাঙ্খাকী মনে কর।

মহিলাঃ আমি গরীব অভাবী ও বড় দুঃখিনী মহিলা। এ বাচ্চাগুলোর জন্য খুবই চিন্তান্বিত। সেই কাহিনীর কথা বাদ দাও, আমার আঘাত এবং মনের ব্যথাকে জাগ্রত করনা।

অবগুণ্ঠনকারীঃ বোন, আমার আগ্রহের প্রতি তোমাকে সায় দিতেই হবে। আসল ঘটনা প্রকাশ করতেই হবে।

মহিলাঃ ঠিক আছে, তাহলে শুন, আমার অভিযোগ হচ্ছে আমীরুল মোমেনীন ওমরের বিরুদ্ধে। তিনি আমাদের আমীর। আল্লাহ তাআলা ওনাকে আমদের হেফাজত ও খেদমতের জন্য খেলাফতের আসনে বসায়েছেন। কিন্তু তিনি এ বিধবা গরীব মহিলার খবর রাখেননি। দুদিন যাবত আমি ও আমার এয়াতীম বাচ্চারা উপবাস। আজ ক্ষিধায় বাচ্চারা একেবারে কাতর হয়ে গেছে, তাই ওদের মন ভুলানোর জন্য রাত্রির প্রারম্ভ থেকে ডেক্‌সি চুলায় চড়ায়ে রেখেছি এবং ডেকসিতে পানি ছাড়া আর কিছু নেই। এভাবে ওদের শান্তনা দিতে দিতে সকাল হয়ে যাবে, এবং সকালে আল্লাহ যা করে, তাই হবে। আফ্‌সোস্‌! আমীরুল মোমেনীনের কাছে আমার এয়াতীম ও ক্ষুধার্ত বাচ্চাদের কোন খবর নেই।

অবগুণ্ঠনকারীঃ (ব্যথাতুর কণ্ঠে) বোন, তুমি যে এ অবস্থায় আছ, ওমর কি করে জানবে? তুমি ওর কাছে গিয়ে তোমার অবস্থার কথা কেন অবহিত করনি?

মহিলাঃ বাহ! কি সুন্দর কথা! প্রজাদের হেফাজত ও দেখা শুনা করার জন্য আল্লাহ তাআলা খলীফা নিয়োজিত করেছেন। তাই এটা খলীফার কর্তব্য যে সমস্ত প্রজাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকা। উনি যদি এভাবে প্রজাদের অবস্থা সম্পর্কে বেখবর থাকে তাহলে খেলাফতের মসনদে বসার ওনার কোন অধিকার নেই। আজ তো তিনি আমার এয়াতীম বাচ্চাদের খোঁজ খবর নিলেন না, কাল ইনশা আল্লাহ আমি কমলী ওয়ালা আঁকা মওলার বারগাহে ওমরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবো।

অবগুণ্ঠনকারীঃ এ কথা শুনে কেঁদে দিলেন এবং কালবিলম্ব না করে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর একটি বস্তা নিজের পিঠের উপর করে নিয়ে

এসে পুনরায় সেই মহিলার ঘরে ঢুকলেন এবং কাঁধ থেকে বস্তা নামিয়ে কাপড় ঝাড়লেন। অতঃপর সাথীকে সম্বোধন করে বললেনঃ

অবগুণ্ঠনকারীঃ আল হামদু লিল্লাহ্‌! আটার বস্তা নিজেই বহন করে নিয়ে এলাম।

সাথীঃ হুযুর, আমীতো বলেছিলাম যে বস্তাটা আমি বহন করি। কিন্তু আপনি আমাকে বহন করতে দিলেন না।

অবগুণ্ঠনকারীঃ আফ্‌লা! (অবগুণ্ঠনকারীর সাথীর নাম) কেয়ামতের দিনও কি তুমি আমার বোঝা বহন করবে? যদি না কর, তাহলে এখানকার বোঝাটা নিজে বহন করাটা সঙ্গত হয়েছে।

মহিলাঃ (এ দৃশ্য দেখে) ভাই, আল্লাহ তোমাদের উপর হাজার হাজার বরকত নাজিল করুক। তোমরা ফেরেস্তার মত মানুষ। আমি খুবই দুঃখিত যে আমার দুঃখের কাহিনী শুনায়ে তোমাদেরকে অনর্থক কষ্ট দিলাম।

অবগুণ্ঠনকারীঃ ওসব কথা বাদ দাও। আমাকে আমার কর্তব্য আদায় করার সুযোগ দাও।

অতঃপর অবগুণ্ঠনকারী নিজেই বস্তা থেকে আটা বের করলেন এবং নিজেই খামির বানিয়ে রুটি তৈরী করলেন এবং নিজেই চুলায় আগুন জালালেন। সাথীর বর্ণনা মতে চুলায় এমন ভাবে ফুঁক দিচ্ছিলেন যে অবগুণ্ঠনকারীর দাড়ী থেকে ধোয়া বের হচ্ছিল। রুটিও সেই ফেরেস্তার মত লোকটি সেঁকলেন এবং নিজেই বাচ্চাদেরকে খাওয়ালেন। ক্রন্দনরত বাচ্চাদেরকে খাওয়ানোর পর আনন্দদায়ক কথা বলে হাসালেন এবং বললেন আমি চাচ্ছি যে, যে চোখে আমি এ বাচ্চাদেরকে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখেছি, সে চোখে ওদেরকে যেন হাসতে দেখি।

অবগুণ্ঠনকারীর এ মায়াবী আচরণ দেখে সেই মহিলা খুবই প্রভাবিত হলো এবং বললো, ওহে হৃদয়বাণ ব্যক্তি, তুমি তো আমাদের অভাব পূর্ণ করে দিলে এবং আমাদেরকে সুখী করলে।

অবগুণ্ঠনকারীঃ বোন, বাস্তবিকই কি তুমি আমার উপর সন্তুষ্ট?

মহিলাঃ খোদা সাক্ষী, আমি তোমার উপর খুবই সন্তুষ্ট।

অবগুণ্ঠনকারীঃ তাহলে বোন, আমার খাতিরে ওমরের অপরাধ মাফ করে দাও এবং কাল কেয়ামতের দিন আকা মওলার কাছে ওর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করো না।

মহিলাঃ আমি কিছু বুঝলাম না, আমীরুল মোমেনীনের প্রতি তোমার এত দরদ কেন?

অবগুণ্ঠনকারীঃ প্রথমে তুমি ওকে মাফ করে দাও। এর পর আমি এর কারণ বলবো।

মহিলাঃ ঠিক আছে, আমি ওকে তোমার খাতিরে মাফ করে দিলাম এবং সাথে সাথে আল্লাহর কাছে এ দুআও করছি, ওকে খেলাফতের মসনদ থেকে সরায়ে সে জায়গায় যেন তোমাকে বসায়।

অবগুণ্ঠনকারীঃ বোন, শুন, তোমার এ দুআও বৃথা যায়নি।

মহিলাঃ সেটা কি করে?

অবগুণ্ঠণকারীঃ (মুখ থেকে পর্দা সরায়ে বললেন) এ দিকে দেখ।

মহিলাঃ (আশ্চর্যান্বিত হয়ে) আরে, আমীরুল মোমেনীন আপনি। (কনজুল উম্মাল, হেকায়াতে সাহাবা- ৩৫ পৃঃ)

সবকঃ হযরত ফারুকে আযমের খেলাফত আল্লাহর রহমত স্বরূপ ছিল। এর দ্বারা সবাই উপকৃত হয়েছিল। হযরত ওমর ফারুক (রাদি আল্লাহু আনহু) আল্লাহর খাঁটি বান্দা এবং আল্লাহর বান্দাগণের উত্তম সেবক ছিলেন। অতএব যে হযরত ওমরের উপর সন্তুষ্ট নয়, সে যেন আল্লাহর রহমতের উপর সন্তুষ্ট নয়।

কাহিনী নং- ১৫৪

ফারুকে আযম ও এক গেঁয়ো লোক

হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) স্বীয় খেলাফত কালে মাঝে মধ্যে রাত্রি কালীন চৌকিদারের ভূমিকাও পালন করতেন এবং শহরের চারিদিকে ঘুরে ফিরে দেখতেন। এ রকম এক রাত্রে এক মাঠের পাশ দিয়ে যাবার সময় ওখানে একটি তাবু খাটানো দেখলেন, যেটা আগে ছিল না। তিনি কাছে গিয়ে দেখলেন যে এক ব্যক্তি তাবুর বাইরে বসে আছে এবং তাবুর অভ্যন্তরে কারো বেদনার আওয়াজ শুনা যায়। তিনি সালাম করে লোকটির কাছে গিয়ে বসলেন, এবং জিজ্ঞেস করলেন,

ভাই আপনি কে? লোকটি বললো, আমি একজন মুসাফির, গ্রামের অধিবাসী, আমীরুল মোমেনীনের সাথে সাক্ষাত করে আমার সমস্যার কথা ব্যক্ত করার জন্য এসেছি। তিনি পুনরায় জানতে চাইলেন যে, তাবুর অভ্যন্তর থেকে কার আওয়াজ আসতেছে? লোকটি বললো, ভাই আপনি চলে যান, নিজ কাজ করুন। তিনি কিন্তু নাছোরবান্দা, বার বার বলছেন, ভাই নিশ্চয় আপনি কোন অসুবিধায় আছেন, তাবুর অভ্যন্তরে কেউ কষ্টে আছে, আমাকে ব্যাপরটা খুলে বলুন। অগত্যা লোকটি বললো, আমার স্ত্রী সন্তান সম্ভবা, প্রসব বেদনা হচ্ছে। তিনি জানতে চাইলেন অন্য কোন মহিলা কাছে আছে কি না? লোকটি বললো, কেউ নেই। তখন তিনি ওখান থেকে ঘরে গেলেন এবং তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মে কুলসুমকে বললেন, তোমার জন্য একটি বড় ছওয়াব অর্জনের সুযোগ এসেছে। উম্মে কুলসুম জিজ্ঞেস করলেন সেটা কি? তিনি বললেন, একজন গ্রাম্য মহিলার প্রসব বেদনা হচ্ছে এবং ওর কাছে অন্য কোন মহিলাও নেই। তিনি বললেন, ঠিক আছে, আপনার অনুমতি পেলে আমি প্রস্তুত। হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) বললেন, ডেলিভারীর সময় যেসব জিনিসের প্রয়োজন যেমন তৈল, ছেঁড়া কাপড় ইত্যাদি সাথে নিয়ে নাও এবং একটি ডেক্‌সি ও কিছু ঘি এবং কিছু দানাপানি, সাথে নিয়ে নাও। তিনি ওসব নিয়ে বের হলেন, হযরত ওমরও সাথে গেলেন। হযরত উম্মে কুলসুম তাবুর ভিতরে প্রবেশ করলেন। এক ফাঁকে তিনি আগুন জ্বালিয়ে ডেকসিতে দানা পানি ও ঘি দিয়ে খাবার তৈরী করলেন। এর মধ্যে মহিলাটির গর্ভপাত হলো। তাবুর অভ্যন্তর থেকে উম্মে কুলসুম আওয়াজ করে বললেন, "আমীরুল মোমেনীন, আপনার বন্ধুকে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিন"। 'আমীরুল মোমেনীন' শব্দ শুনে লোকটি ঘাবড়িয়ে গেল। হযরত ওমর বললেন, ভয়ের কোন কারণ নেই। হযরত উম্মে কুলসুম সেই পাকানো ডেকসি থেকে কিছু খাবার মহিলাকে খাওয়ালেন, অতঃপর ডেকসিটি তাবুর বাইরে দিয়া দিলেন। হযরত ওমর সেই গেয়োঁ লোকটাকে বললেন, এখান থেকে তুমিও খাও। রাতভর জেগে অনেক কষ্ট করেছ। এর পর তিনি স্ত্রীকে সাথে নিয়ে ঘরে ফিরে আসলেন এবং লোকটাকে বলে আসলেন, আগামী কাল এসো, তোমার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে। (হেকায়েতে সাহাবা ৬২ পৃঃ)

সবকঃ জাতির সরদার জাতির সেবকই হয়ে থাকেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে এর বাস্তবতা সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। হযরত ওমর ফারুক (রাদি আল্লাহু আনহু) এত বড় শান মানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও গরীব গেঁয়ে লোকটির

সেবা করলেন সারারাত। এ যুগে রাজা-বাদশাহ নয়, একটু স্বচ্ছল কোন ব্যক্তিকেও কি এরকম পাওয়া যবে, যে গরীবের প্রয়োজনে, মুসাফিরের সাহায্যে এভাবে নিজের স্ত্রীকে জংগলে নিয়ে যাবে? এভাবে নিজে চুলা জ্বালিয়ে রান্না করে দিবে? আপন বুজুর্গগণের চরিত্র সামনে রাখা মুসলমানগণের উচিত।

কাহিনী নং- ১৫৫

ফারুকে আযম ও এক বুড়ী

একবার হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) প্রজাদের অবস্থা পর্যবেক্ষনের জন্য এদিক সেদিক ঘুরে ফিরে দেখছিলেন। এক বৃদ্ধা মহিলাকে তাবুতে বসা অবস্থায় দেখে তিনি ওর কাছে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, হে বৃদ্ধা, ওমর সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? সে বললো, আল্লাহ ওমরের অকল্যাণ করুক। হযরত ওমর বললেন, তুমি এ বদদোয়া কেন করলে, ওমর কি অপরাধ করলো? বুড়ী বললো, আজ পর্যন্ত ওমর আমি গরীব বুড়ীর কোন খোঁজ খবর নেননি এবং আমাকে কখনো কিছু দেন নি। হযরত ওমর বললেন, ওমর কি জানে যে এ তাবুতে সাহায্য পাবার উপযোগী এক বৃদ্ধা বাস করে? সে বললো, সুবহানাল্লা! এক ব্যক্তি লোকদের আমীর নিযুক্ত হলেন, আর তিনি তাঁর রাজ্যের পূর্ব পশ্চিমের খবর রাখেন না? বড় আশ্চর্যের ব্যাপার! এ কথা শুনে ওমর কেঁদে দিলেন এবং নিজকে নিজে সম্বোধন করে বললেন, হে ওমর! তোমার চেয়ে এ বুড়ী অধিক জ্ঞানী প্রমাণিত হলো। অতঃপর তিনি সেই বুড়ীকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আল্লাহর মখলুক! ওমরের দ্বারা তোমার যে কষ্ট হয়েছে, সেটা কত দামে বিক্রি করবে? আমি চাচ্ছি, ওমরের এ অপরাধ মূল্য দিয়ে তোমার থেকে ক্রয় করে ওমরকে রক্ষা করতে। বুড়ী বললো ভাই, আমার সাথে রসিকতা করছ? হযরত ওমর বললেন, রসিকতা করছিনা, সত্যি সত্যি, বলছি, ওমরের দ্বারা তোমার যে কষ্ট হয়েছে, সেটা বিক্রি করে দাও। এর মূল্য যা চাইবে তা দিয়ে দিব। বুড়ী বললো, তাহলে আমাকে পঁচিশ দিনার দাও। একথা চলাকালীন সময়ে তথায় হযরত আলী ও হযরত ইবনে মাসউদ (রাদি আল্লাহু আনহুমা) এসে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, "আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া আমীরুল মুমেনীন"। বুড়ী ওনাদের মুখে "আমীরুল মুমেনীন" শব্দ শুনে হতবাক হয়ে গেল এবং কপালে হাত রেখে বললো, সর্বনাশ! ইনিতো স্বয়ং আমীরুল মেমেনীন ওমর। আমি ওনার সামনে ওনাকে দোষারোপ করলাম। হযরত ওমর

বুড়ীর এ বিব্রতকর অবস্থা দেখে বললেন, বুড়ী, ভয় করো না। আল্লাহ রহম করুক, তুমি পরিপূর্ণ সত্য কথা বলেছ। এর পর তিনি একটি দলীল লিখলেন, যার মধ্যে বিসমিল্লার পর লিখা ছিল "এ দলীল সেই বিষয় সম্পর্কিত যে, ওমর বিন খাত্তাব এ বৃদ্ধার কাছ থেকে পঁচিশ দিনারের বিনিময়ে তাঁর খেলাফতের প্রারম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত ভুল ত্রুটির কারণে বুড়ীর যে কষ্ট হয়েছে, তা ক্রয় করে নিলেন। এখন এ বুড়ী কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে ওমরের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করবে না।

এখন ওমর সেই অভিযোগ থেকে মুক্ত। হযরত আলী ইবনে আবি তালেব এবং ইবনে মসউদ এ বেচাকেনার সাক্ষী।"

এ দলীল লিখে বুড়ীকে পঁচিশ দিনার দিয়ে দিলেন এবং দলীলটি তাঁর ছেলেকে জমা দিয়ে বললেন, যখন আমি মারা যাব, তখন আমার কাফনে এ দলীলটা রেখে দিও। (হায়াতুল হায়ওয়ান ৪৩ পৃঃ ১ম জিঃ)

সবকঃ হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) নিঃসন্দেহে জান্নাতী হওয়া সত্বেও তাঁর এ অবস্থা দেখে আমাদের চিন্তা করা দরকার। কাল কিয়ামতের দিন যখন আমল নামা প্রকাশ পাবে, তখন কি জবাব দিব? আজকালকার যুগের শাসকদেরও চিন্তা করা দরকার যে তাঁরা নিজেদের জনসাধারণের কত টুকু খবর রাখছেন।

কাহিনী নং- ১৫৬

মজাদার হালুয়া

হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) এর যুগে যখন আজার বাইজান বিজয় হয়, তখন মুসলমানেরা নানা ধরণের জিনিস গনিমত হিসেবে লাভ করেন। ওতবা নামে এক ব্যক্তি খুবই মজাদার হালুয়া লাভ করেছিলেন, যা তিনি হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) এর কাছে তোহফা হিসেবে পাঠিয়ে দেন। হযরত ওমর এ হালুয়া দেখে এবং স্বাদ গ্রহণ করে বললেন, এ হালুয়া কি সবাই খেয়েছে, নাকি শুধু আমার জন্যই নিয়ে আসা হয়েছে? আনয়নকারী বললো, হুযূর, কেবল আপনার জন্যই নিয়ে আসা হয়েছে। তক্ষুনি তিনি প্রেরকের নামে নিম্নের চিঠিটা লিখলেন; আল্লাহর বান্দা আমীরুল মুমেনীন ওমরের পক্ষ থেকে ওতবা বিন মরকদের নামেঃ

পর সমাচার এইযে, স্মরণ রেখ, এ হালুয়াতো তোমার প্রচেষ্টায় অর্জিত হয়নি এবং তোমার মা-বাপের প্রচেষ্টায়ও অর্জিত হয়নি। আমরাতো ঐ জিনিসই খাব,

যেটা সকল মুসলমান নিজ নিজ ঘরে পেট ভরে খায়।(ফতুহুল বুলদান- ৪৭৩ পৃঃ)

সবকঃ এটাই ছিল আমাদের খলিফাগণের চরিত্র, যারা প্রজাদের প্রতিটি বিষয়ে খেয়াল রাখতেন। তাঁরা এমন কোন কিছু খেতেন না, যা সাধারণ লোকদের জন্য সহজলভ্য ছিলনা। তাঁরা প্রজাদেরকে নিজের সন্তানদের থেকে অধিক প্রিয় মনে করতেন।

কাহিনী নং- ১৫৭

ইস্কান্দরীয়া বিজয়

ইস্কান্দরীয়া বিজয়ে বিলম্ব হওয়াতে ওমর ফারুক (রাদি আল্লাহু আনহু) তথাকার কমান্ডার হযরত আমর বিন আস (রাদি আল্লাহু আনহু) এর কাছে ফরমান পাঠালেন যে, তোমরা ওখানে গিয়ে সম্ভবত অলসতা ও বিলাসিতায় মেতে উঠেছ। তোমাদের উচিত যে সবাই মিলে এক সাথে ঝটিকা আক্রমন করে শহর দখল করে বিশ্রাম নেয়া। তাঁর নির্দেশ মুতাবিক আক্রমন করা হলো এবং ইস্কান্দরীয়া বিজয় হলো। ইস্কান্দরীয়ার বিজয় সংবাদ নিয়ে বিশেষ বার্তাবাহক দুপুরের সময় মদীনা শরীফ পৌঁছলো। তখন ফারুকে আযম আরাম করছেন ভেবে সোজা মসজিদে নববীর দিকে রওয়ানা দিল। এক মহিলা জিজ্ঞেস করায় সে বললো ইস্কান্দরীয়া জয় হয়েছে এবং আমি এ সংবাদ পৌঁছানোর জন্য ইস্কান্দরীয়া থেকে আসতেছি। মহিলা জটপট এ খবর ফারুকে আযমকে পৌঁছায়ে দিল। হযরত ওমর ফারুক বার্তা বহকের সাথে সাক্ষাতের জন্য বাইরে তশরীফ আনলেন। এর মধ্যে বার্তা বাহকও উপস্থিত হলো। হযরত ফারুকে আযম বললেন, তুমি সোজা আমার কাছে কেন চলে আসোনি? আরয করলো, আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত হবে মনে করে। ওমর ফারুক বললেন, তুমি আমার ব্যাপারে এরকম ধারণা কেন করলে? আমি যদি দিনে আরামের খাতিরে নিদ্রা যাই, তাহলে খেলাফতের কাজ কে আঞ্জাম দিবে? এর পর ইস্কান্দরীয়ার বিজয় বার্তা শুনে তিনি সিজদায় পতিত হলেন। (ফতুহুল বলদান ৪৭৪ পৃঃ)

সবকঃ জাতির নেতৃত্ব আরাম ও বিলাসিতার জন্য নয় বরং সবসময় সজাগ ও হুশিয়ার থাকাটাই হচ্ছে নেতৃত্ব।

কাহিনী নং ১৫৮

প্রজা এবং কিয়ামত

হযরত ওমর ফারুক (রাদি আল্লাহু আনহু) এর খেলাফত কালে লোকেরা আরয করলেন, আপনি এত কষ্ট কেন করতেছেন? না দিনে স্বস্থির নিশ্বাস ফেলছেন, না রাত্রে বিশ্রাম নিচ্ছেন। তিনি বললেন, যদি দিনে আরাম করি, তাহলে প্রজারা কষ্ট পায় আর রাত্রে যদি আরাম করি এবং আল্লাহর যিকির বাদ দি, তাহলে কিয়ামতের মাঠে আমি কি করে মুখ দেখাবো। (ফতুহুল বলদান- ৪৭৪ পৃঃ)

সবকঃ প্রজাদের সহযোগিতা এবং খোদার বন্দেগীতে নিয়োজিত থাকাটাই হচ্ছে মুসলমান শাসকের বৈশিষ্ট্য।

কাহিনী নং- ১৫৯

রোমের রাজ প্রতিনিধি

একবার রোমের বাদশাহ কায়সরের এক প্রতিনিধি মদীনা শরীফ এসে লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, খলীফার শাহী মহলটা কোন্ জায়গায়? লোকেরা ওর কথা শুনে হেসে বললেন, এ সিংহ পুরুষের কাছে রাজপ্রাসাদের কোন প্রয়োজন নেই। সবর ও শোকর হচ্ছে তাঁর প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য। হযরত ওমর যদিওবা আমীরুল মুমেনীন, সাধারণ গরীবের ঘরের মতও তাঁর ঘর নয়। লোকদের মুখে এ অদ্ভুত কথা শুনে, তা দেখার জন্য রাজ প্রতিনিধির আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পেল এবং চারিদিকে খোজা খুঁজি করতে লাগলো আর মনে মনে চিন্তা করতে লাগলো যে, কি আশ্চর্য ব্যাপার, এত বড় একজন বিশ্ববিজয়ীর মামুলী জীবন যাত্রা। শেষ পর্যন্ত এক বৃদ্ধা ওকে সন্ধান দিয়ে বললো হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) খেজুর গাছের ছায়ার নিচে শুয়ে আছেন। রাজ প্রতিনিধির শরীর ছিল রিষ্ট পুষ্ট কিন্তু হযরত ওমরকে দেখে সমস্ত শরীর কেঁপে উঠলো। মনে মনে বলছিল, ইয়া আল্লাহ! কি হলো, কায়সর, কিসরাকে অনেকবার দেখেছি, অনেক বাঘ ভাল্লুক শিকার করেছি, কখনো এ চেহারার রং পরিবর্তন হয়নি, কিন্তু এখন আমার শরীরের প্রতিটি জোড়ায় জোড়ায় কাঁপতেছে, সারা শরীর থেকে ঘাম বের হচ্ছে। এ ব্যক্তির চেহারার মধ্যে আসমানী প্রভাব রয়েছে। এর মধ্যে আল্লাহর কোন রহস্য নিহিত রয়েছে। (মসনবী শরীফ)

সবকঃ যে আল্লাহকে ভয় করে, ওকে সবাই ভয় করে। জ্বীন, ভূত ওর কাছে আসে না।

কাহিনী নং ১৬০

ফারুকে আযম ও এক চোর

এক নিলজ্জ চোর হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) এর খেলাফতকালে ধরা পড়লো এবং ওকে হযরত ওমরের দরবারে নিয়ে আসা হলো। অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর ওর হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। এ রায় শুনে চোর চিৎকার করে বলে উঠলো, মেহেরবাণী করে আমার প্রথম অপরাধ মার্জনা করুন। উপস্থিত অনেকে ক্ষমা করার জন্য সুপারিশ করলেন। কিন্তু হযরত ওমর কারো কথা শুনলেন না বরং তাঁরই সামনে রায় কার্যকর করার জন্য হুকুম দিলেন এবং বললেন, আমি নিশ্চিত যে, এটা ওর প্রথম অপরাধ নয়, সে মিথ্যা বলতেছে। সে আল্লাহর ক্ষমা থেকে অনেক দূরে চলে গেছে, ওকে তওবা করার সুযোগও দেয়া যায় না। (মসনবী শরীফ)

সবকঃ এটা জেনে নিন যে বান্দা দু'একবার অপরাধ করলে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন। কিন্তু নিলজ্জ অপরাধীরা যখন বার বার অপরাধ করতে থাকে, তখন আল্লাহ তাআলা ওকে অপদস্ত করেন।

কাহিনী নং- ১৬১

ফারুকে আযমের শাহাদত

হযরত ওমর ফারুক (রাদি আল্লাহু আনহু) এক রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন যে একটি লাল মোরগ তাঁর শরীরে দু'তিনটি ঠোকর মারলো। তিনি এ স্বপ্নের কথা জুমার খোতবায় বর্ণনা করলেন এবং স্বপ্নের এটাই তাবীর করা হলো যে কোন কাফির হযরত ওমরকে শহীদ করে দিবে। বুধবার ফজরের নামাযের সময় তাঁকে আহত করা হলেছিল। তাঁর এটা নিয়ম ছিল যে নামায শুরু করার আগে কাতার সমূহ সোজা করাতেন। যখন সব কাতার সোজা হয়ে যেত, তখন তিনি আল্লাহ আকবর বলে নিয়ত বাঁধতেন। বুধবারেও কাতার সমূহ সোজা করায়ে যখন নিয়ত বাঁধলেন, তখন ফিরোজ নামে এক অগ্নি উপাসক মুশরিক গোলাম, দু'ধারী চাকু দ্বারা তাঁকে অতর্কিত আক্রমন করে তাঁর পেট ক্ষত বিক্ষত করে ফেলে। হযরত ওমরকে

আক্রান্ত করে পালিয়ে যাবার পথে অনেক সাহাবাকেও মারাত্মক আঘাত করে। শেষ পর্যন্ত এক আনছারী স্বীয় কম্বল দিয়ে জড়িয়ে ওকে ধরে ফেলেন। এ জালিম ধরা পরার পর নিজের পরিনতির কথা ভেবে নিজের হাতে নিজেকে ছুরি মেরে আত্মহত্যা করে।

হযরত ওমর (রাদি আল্লাহ আনহু) হযরত আবদুর রহমান বিন আউফকে তাঁর বদলে নামায পড়াতে বললেন এবং নিজে ওখানে বসে নামায পড়লেন, মারাত্মক আহত হওয়ার পরও ওখানে উপস্থিত রইলেন। যখন লোকেরা নামায থেকে ফারেগ হলেন, তখন হযরত ওমর হযরত ইবনে আব্বাসকে বললেন, দেখুনতো- আমার হত্যাকারী কে? হযরত ইবনে আব্বাস বললেন, জনাব, এক অগ্নি উপাসক মুশরিক গোলাম আপনাকে আঘাত করেছে, যার নাম ফিরোজ। হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) এটা শুনে বললেন, আল্লাহর লাখো শোকর, আমার মৃত্যু কোন কলেমা পাঠকারী মুসলমানের হাতে হয়নি। তাঁর জখমটা এত মারাত্মক ছিল যে, তাঁকে যে শরবত পান করানো হয়েছিল, সেটা জখমের স্থান দিয়ে বের হয়ে আসলো। তাঁকে শেষবারের মত দেখার জন্য লোক আসতে লাগলো, এক নওজোয়ান এসে তাঁকে দেখে চলে যাচ্ছিল। যাওয়ার সময় হযরত ওমর লক্ষ্য করলেন যে যুবকটির লুঙি মাটির সাথে হেঁচরাচ্ছে। তিনি যুবকটাকে পুনরায় ডেকে আনায়ে বললেন, বাবা, তোমার লুঙিটা একটু উঁচু করে পরিধান কর। এটা আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় এবং তোমার কাপড়টাও মাটিতে খারাপ হওয়া থেকে নিরাপদ থাকবে।

যখন তাঁর অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেল, তখন তিনি তাঁর ছেলে আবদুল্লাহকে বললেন, বেটা, তুমি উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকার কাছে যাও এবং ওনাকে আমার সালাম দেয়ার পর বল যে, আপনার হুজরায় হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লাম) এর পদতলে দাফন হওয়ার প্রত্যাশায় ওমর আপনার অনুমতি কামনা করছে। বাপের আদেশ মতে হযরত আবদুল্লাহ (রাদি আল্লাহু আনহু) হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাদি আল্লাহু আনহা) এর কাছে গেলেন। তিনি গিয়ে দেখেন যে, হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা হযরত ওমরের শোকে কাঁদতেছেন। হযরত আবদুল্লাহ হযরত ওমরের সালাম ও পয়গাম পেশ করলেন। উম্মুল মুমেনীন তা শুনে বললেন, জায়গাটা আমার জন্যই রেখে ছিলাম। কিন্তু আমি আমার জান থেকে ওমরের জানকে অধিক পছন্দ করি। তাই অনুমতি দিয়াদিলাম। সানন্দে তাঁকে যেন সেই মুবারক জায়গায় দাফন করা হয়। হযরত আবদুল্লাহ অনুমতি নিয়ে ফিরে এসে

সবকঃ যে আল্লাহকে ভয় করে, ওকে সবাই ভয় করে। জ্বীন, ভূত ওর কাছে আসে না।

কাহিনী নং ১৬০

ফারুকে আযম ও এক চোর

এক নিলর্জ্জ চোর হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) এর খেলাফতকালে ধরা পড়লো এবং ওকে হযরত ওমরের দরবারে নিয়ে আসা হলো। অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর ওর হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। এ রায় শুনে চোর চিৎকার করে বলে উঠলো, মেহেরবাণী করে আমার প্রথম অপরাধ মার্জনা করুন। উপস্থিত অনেকে ক্ষমা করার জন্য সুপারিশ করলেন। কিন্তু হযরত ওমর কারো কথা শুনলেন না বরং তাঁরই সামনে রায় কার্যকর করার জন্য হুকুম দিলেন এবং বললেন, আমি নিশ্চিত যে, এটা ওর প্রথম অপরাধ নয়, সে মিথ্যা বলতেছে। সে আল্লাহর ক্ষমা থেকে অনেক দূরে চলে গেছে, ওকে তওবা করার সুযোগও দেয়া যায় না। (মসনবী শরীফ)

সবকঃ এটা জেনে নিন যে বান্দা দু'একবার অপরাধ করলে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন। কিন্তু নিলর্জ্জ অপরাধীরা যখন বার বার অপরাধ করতে থাকে, তখন আল্লাহ তাআলা ওকে অপদস্ত করেন।

কাহিনী নং- ১৬১

ফারুকে আযমের শাহাদত

হযরত ওমর ফারুক (রাদি আল্লাহু আনহু) এক রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন যে একটি লাল মোরগ তাঁর শরীরে দু'তিনটি ঠোকর মারলো। তিনি এ স্বপ্নের কথা জুমার খোতবায় বর্ণনা করলেন এবং স্বপ্নের এটাই তাবীর করা হলো যে কোন কাফির হয়রত ওমরকে শহীদ করে দিবে। বুধবার ফজরের নামাযের সময় তাঁকে আহত করা হলেছিল। তাঁর এটা নিয়ম ছিল যে নামায শুরু করার আগে কাতার সমূহ সোজা করাতেন। যখন সব কাতার সোজা হয়ে যেত, তখন তিনি আল্লাহ আকবর বলে নিয়ত বাঁধতেন। বুধবারেও কাতার সমূহ সোজা করায়ে যখন নিয়ত বাঁধলেন, তখন ফিরোজ নামে এক অগ্নি উপাসক মুশরিক গোলাম, দু'ধারী চাকু দ্বারা তাঁকে অতর্কিত আক্রমন করে তাঁর পেট ক্ষত বিক্ষত করে ফেলে। হযরত ওমরকে

আক্রান্ত করে পালিয়ে যাবার পথে অনেক সাহাবাকেও মারাত্মক আঘাত করে। শেষ পর্যন্ত এক আনছারী স্বীয় কম্বল দিয়ে জড়িয়ে ওকে ধরে ফেলেন। এ জালিম ধরা পরার পর নিজের পরিনতির কথা ভেবে নিজের হাতে নিজেকে ছুরি মেরে আত্মহত্যা করে।

হযরত ওমর (রাদি আল্লাহ আনহু) হযরত আবদুর রহমান বিন আউফকে তাঁর বদলে নামায পড়াতে বললেন এবং নিজে ওখানে বসে নামায পড়লেন, মারাত্মক আহত হওয়ার পরও ওখানে উপস্থিত রইলেন। যখন লোকেরা নামায থেকে ফারেগ হলেন, তখন হযরত ওমর হযরত ইবনে আব্বাসকে বললেন, দেখুনতো- আমার হত্যাকারী কে? হযরত ইবনে আব্বাস বললেন, জনাব, এক আগ্নি উপাসক মুশরিক গোলাম আপনাকে আঘাত করেছে, যার নাম ফিরোজ। হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) এটা শুনে বললেন, আল্লাহর লাখো শোকর, আমার মৃত্যু কোন কলেমা পাঠকারী মুসলমানের হাতে হয়নি। তাঁর জখমটা এত মারাত্মক ছিল যে, তাঁকে যে শরবত পান করানো হয়েছিল, সেটা জখমের স্থান দিয়ে বের হয়ে আসলো। তাঁকে শেষবারের মত দেখার জন্য লোক আসতে লাগলো, এক নওজোয়ান এসে তাঁকে দেখে চলে যাচ্ছিল। যাওয়ার সময় হযরত ওমর লক্ষ্য করলেন যে যুবকটির লুঙি মাটির সাথে হেঁচরাচ্ছে। তিনি যুবকটাকে পুনরায় ডেকে আনায়ে বললেন, বাবা, তোমার লুঙিটা একটু উঁচু করে পরিধান কর। এটা আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় এবং তোমার কাপড়টাও মাটিতে খারাপ হওয়া থেকে নিরাপদ থাকবে।

যখন তাঁর অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেল, তখন তিনি তাঁর ছেলে আবদুল্লাহকে বললেন, বেটা, তুমি উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকার কাছে যাও এবং ওনাকে আমার সালাম দেয়ার পর বল যে, আপনার হুজরায় হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লাম) এর পদতলে দাফন হওয়ার প্রত্যাশায় ওমর আপনার অনুমতি কামনা করছে। বাপের আদেশ মতে হযরত আবদুল্লাহ (রাদি আল্লাহু আনহু) হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাদি আল্লাহু আনহা) এর কাছে গেলেন। তিনি গিয়ে দেখেন যে, হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা হযরত ওমরের শোকে কাঁদতেছেন। হযরত আবদুল্লাহ হযরত ওমরের সালাম ও পয়গাম পেশ করলেন। উম্মুল মুমেনীন তা শুনে বললেন, জায়গাটা আমার জন্যই রেখে ছিলাম। কিন্তু আমি আমার জান থেকে ওমরের জানকে অধিক পছন্দ করি। তাই অনুমতি দিয়াদিলাম। সানন্দে তাঁকে যেন সেই মুবারক জায়গায় দাফন করা হয়। হযরত আবদুল্লাহ অনুমতি নিয়ে ফিরে এসে

হযরত ওমরকে যখন জানালেন, তখন তিনি বললেন, আলহামদুলিল্লাহ অনুমতি পাওয়া গেল। কিন্তু হে আবদুল্লাহ, তোমাকে আর একটি কাজ করতে হবে যে, যখন আমি মারা যাবো, তখন আমার জানাযা তৈরী করে হযরত আয়েশা ছিদ্দিকার সামনে নিয়ে রাখবে এবং বলবে এ মুহূর্তে ওমরের জানাযা আপনার সামনে হাজির এবং আপনার অনুমতি চাচ্ছে। যদি সেই সময় অনুমতি দেন, তাহলে আমাকে ভিতরে দাফন করিও। আমার সন্দেহ হচ্ছে, হয়তো আমার কারনে অনুমতি দিয়েছেন তাই মৃত্যুর পর পুনরায় অনুমতি নিয়া নিও। এর পর বললেন, বেটা, আমার মাথা বালিশ থেকে সরায়ে মাটিতে রেখে দাও যেন আমি আমার মস্তক মাটিতে রেখে আল্লাহর সামনে ঘঁসতে পারি, যাতে আমার প্রভু আমার প্রতি রহম করেন। বেটা, আমার মৃত্যুর পর চোখ বন্ধ করে দিও এবং আমার কাফনের ব্যাপারে মধ্য পন্থা গ্রহণ করিও, অপচয় করিওনা। আমি যদি খোদার কাছে ভাল সাব্যস্ত হই, তাহলে দুনিয়ার কাফন থেকে অনেক উত্তম কাফন পাওয়া যাবে। আর আমি যদি খারাপ সাব্যস্থ হই, তাহলে এ কাফনও আমার কাছে থাকবে না। বেটা, এ মুহূর্ত যদি দুনিয়ার সমস্ত ধন-দৌলত আমার হাতে হতো, তাহলে আমি কিয়ামত দিবসের সেই ভীবিষীকা থেকে বাঁচার জন্য সব সম্পদ দান করে দিতাম। এ কথা শুনে হযরত ইবনে আব্বাস বললেন, আল্লাহর কসম, আমিতো আপনার সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, কিয়ামতের দিন আপনি নামে মাত্র ভয়ার্থ বিষয়গুলি দেখবেন, কেননা আপনি মুমিনগণের আমীর, মুমিনগণের হেফাজতকারী, মুমিনগণের সরদার। আপনি কুরআন-হাদীসের আলোকে একান্ত ন্যায় বিচার কারী। হযরত ইবনে আব্বাসের এ বক্তব্য হযরত ওমরের খুবই পছন্দ হলো এবং ভীষণ কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও জোশে ও আনন্দে শোয়া থেকে উঠে বসে গেলেন এবং বললেন, হে ইবনে আব্বাস, তুমি কি কিয়ামত দিবসে আল্লাহর সামনে এ কথাগুলোর সাক্ষ্য দিবে? হযরত ইবনে আব্বাস বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দিব। এটা, শুনে হযরত ওমর আশ্বস্থ হলেন। এর পর অনেক নসিহত ও ওসিয়ত করে ইন্তেকাল করলেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।) জানাযা তৈরী করে হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাদি আল্লাহু আনহা) এর হুজরার সামনে নিয়ে রাখা হলো এবং উচ্চস্বরে আরয করলেন, হে উম্মুল মুমেনীন, ওমরের জানাযা আপনার হুজরার সামনে উপস্থিত এবং পুনরায় আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করছেন, হুজরা শরীফের অভ্যন্তরে দাফন করার নির্দেশ যেন দেয়া হয়। হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাদি আল্লাহু আনহা)

ক্রন্দনরতাবস্থায় বললেন আমি অনুমতি দিলাম। অতঃপর তাঁকে হুজরা শরীফে হুযুরের পদতলে দাফন করা হয়।

যে দিন হযরত ওমর ইন্তেকাল করেন, সেদিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল, সমগ্র মদীনা অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল। এক দিকে সূর্যগ্রহণ, অন্যদিকে শোকাতুর মানুষের আহাজারীতে কিয়ামতের দৃশ্য ফুটে উঠেছিল। মদীনার শিশুরা নিজ নিজ মায়ের কাছে জিজ্ঞেস করছিল যে, আজ কি কিয়ামত?

ইন্তেকালের পর হযরত আব্বাস (রাদি আল্লাহু আনহু) তাঁকে স্বপ্ন দেখেন এবং জিজ্ঞেস করেন, হে আমীরুল মুমেনীন! আপনার সাথে কেমন আচরণ করা হল? তিনি বললেন, وجدت ربی رحیما (আমি আমার প্রভূকে বড় মেহেরবান পেয়েছি) (সীরাতুস সালেহীন- ৯৪ পৃঃ)

সবকঃ হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) সন্দেহাতীত ভাবে জান্নাতী হওয়া সত্বেও কি করে আল্লাহর সামনে হাজির হবে, সে ভয়ে অস্থির ছিলেন। সকরাতের সময়ও সৎ উপদেশদানে বিরত ছিলেন না। তাঁকে দেখতে আগত এক যুবককে লুঙি উঁচু করে পরার উপদেশ দানে ভুল করেননি। তাঁর জীবনী থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার। সদা শরীয়তের অনুশাসন মেনে চলা এবং আল্লাহর সামনে হাজির হওয়ার ভয় সদা মনে জাগরুক রাখা একান্ত প্রয়োজন।

কাহিনী নং- ১৬২

হযরত ওসমান জিন নুরাইন (রাঃ)

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চার কন্যা ছিল- যয়নাব, রোকেয়া, উম্মে কুলসুম এবং ফাতেমা (রাদি আল্লাহু আনহুন্না)। হযরত রোকেয়ার বিবাহ হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) এর সাথে হয়েছিল। হযরত রোকেয়ার ইন্তেকাল হলে হযরত ওসমান খুবই শোকাভূত হয়ে পড়েন। তখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর দ্বিতীয় কন্যা হযরত উম্মে কুলসুমকেও তাঁর সাথে বিবাহ দেন এবং ইরশাদ করেন, হে ওসমান, আমার যদি একশ মেয়েও থাকে এবং একটার পর একটা মারা যায়, তাহলে একের পর একট তোমার সাথে বিবাহ দিতে থাকবো। (মওয়াহেবে লাদুনীয়া ১৯৬ পৃঃ ১ জিঃ)

সবকঃ এ বিশেষত্ব একমাত্র হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) লাভ

করেছেন যে, তিনি নবীর দু'কন্যাকে বিবাহ করেছেন। তিনি ছাড়া আর কেউ দুনিয়ার বুকে কোন নবীর দু'কন্যাকে বিবাহ করার সৌভাগ্য লাভ করেনি। এ জন্য তাঁকে জিন নুরাইন লকবে ভূষিত করা হয়েছে।

কাহিনী নং- ১৬৩

হযরত ওসমানের প্রতি লজ্জাবোধ

একবার হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় বাসগৃহে শোয়াবস্থায় ছিলেন এবং তাঁর রান মুবারক বা পায়ের গোছা থেকে কাপড় সরানো ছিল। সে সময় হযরত ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) এসে ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন। হুযূর অনুমতি দিলেন এবং তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুরূপ শুয়ে রইলেন, পায়ের গোছাটাও সেরকম কাপড় সরানো অবস্থায় রইলো এবং আলাপ আলোচনা করতে লাগলেন। কিছুক্ষন পর হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) আসলেন এবং ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন। হুযূর তাঁকেও অনুমতি দিলেন এবং হুযূর তখনও যথারীতি শুয়ে রইলেন এবং পায়ের গোছাটা আগের মত কাপড় সরানো অবস্থায় রইলো এবং এ অবস্থায় আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন। অল্প কিছুক্ষণ পর হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) আসলেন এবং ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন। তখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন এবং স্বীয় কাপড় ঠিক করে নিলেন। অতঃপর হযরত ওসমানকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাদি আল্লাহু আনহা) ফরমান, ওনারা চলে যাবার পর আমি হুযূরের কাছে আরয করলাম, ইয়া রসূলল্লাহ! এটা কিছু বুঝলাম না যে ছিদ্দিকে আকবর আসলেন, আপনি যথারীতি শুয়ে রইলেন, ফারুকে আযম আসলেন, তখনও আপনি শুয়ে রইলেন কিন্তু যখন হযরত ওসমান আসলেন, আপনি সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেলেন এবং কাপড় ঠিক ঠাক করে নিলেন।

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন, হে আয়েশা! আমি ঐ ব্যক্তির প্রতি কি করে লজ্জাবোধ না করতে পারি, যার প্রতি ফিরিশতাগণও লজ্জাবোধ করেন। (মিশকাত শরীফ ৫৫৩ পৃঃ)

সবকঃ হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) এর এটা বিশেষ শান যে,

ফিরিশতাগণ ও আল্লাহর রসূলও তাঁর প্রতি লজ্জাবোধ করেন। তাই যে ব্যক্তি হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) এর শানে বেআদবী করে, সে বড় বেআদব ও নির্লজ্জ।

কাহিনী নং ১৬৪

ওসমান গণী বদান্যতার খনি

জংগে তাবুকের সময় হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসলমানগনকে আল্লাহর পথে অকাতরে ব্যয় করার জন্য অনুপ্রেরণা দিচ্ছিলেন। হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) দাঁড়িয়ে আরয করলেন, ইয়া রসূলল্লাহ! আমি সাজ-সরঞ্জাম সহ একশ উট প্রদান করতেছি। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুনরায় আহবান জানালে হযরত ওসমান আরয করলেন, আমি সাজ-সরঞ্জাম সহ দু'শ উট দিচ্ছি। এরপর হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবার আহবান জানালেন হযরত ওসমান আরয করলেন, ইয়া রসূলল্লাহ! আমি সাজ-সরঞ্জামসহ তিনশ উট দিচ্ছি। তাছাড়া এক হাজার দিনারও হুযূর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে পেশ করলেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত ওসমান গণীর এ বদান্যতা দেখে তাঁর প্রদত্ত দিনারগুলোর উপর হাত রেখে ফরমালেন- ওসমানের এ বদান্যতার পর ওকে কোন কিছু কষ্ট দিবে না। (মিশকাত শরীফ ৫৫৩ পৃঃ)

সবকঃ হযরত ওসমান গণী (রাদি আল্লাহু আনহু) অনেক বড় ধনী ছিলেন। বদান্যতার দিক দিয়েও তিনি বড় উদার ছিলেন। আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলের নির্দেশে তাঁর সব কিছু দিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করতেন না।

কানিহী নং- ১৬৫

জান্নাতের ঝর্ণা

মক্কা মোয়াজ্জমার মুহাজিরগণ হিজরত করে যখন মদীনা মনোয়ারায় আসলেন, তখন তাঁরা তথাকার লবনাক্ত পানি পান করে তৃপ্তি বোধ করছিলেন না। সেখানে এক ব্যক্তির মালিকনাধীন রোমা নামে একটি ঝর্ণা ছিল, যার সুপেয় পানি সে বিক্রি করতো। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওকে বললেন, তুমি তোমার এ ঝর্ণাটা আমার কাছে বেহেশতের ঝর্নার বিনিময়ে বিক্রি করে দাও এবং আমার থেকে বেহেশতের ঝর্না নিয়ে নাও। সে আরয করলো, ইয়া রসূলল্লাহ! আমি একজন দুর্বল লোক, আমার ও আমার ছেলে মেয়েদের জীবিকার একমাত্র উৎস

হলো ঐ ঝর্নাটি। এ খবর হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) এর কানে পৌছলে, তিনি ৩৫০০/ টাকা নগদ দিয়ে সেই ঝর্নাটা ক্রয় করে নিলেন এবং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খেদমতে হাজির হয়ে আরয করলেন, ইয়া রসুলল্লাহ! আপনি যেভাবে ঐ ব্যক্তিকে বেহেশতের ঝর্না দান করতে চেয়েছিলেন, আমি যদি সেটা ঐ ব্যক্তি থেকে ক্রয় করে আপনাকে দিয়া দি, তাহলে আমাকে বেহেশতের ঝর্নাটা দিয়ে দিবেন? তিনি ফরমালেন, হ্যাঁ, দিবা দিব। তখন হযরত ওসমান বললেন, হুযূর, সেই ঝর্নাটা আমি ক্রয় করে নিয়েছি এবং মুসলমানগণের জন্য সেটা ওয়াকফ করে দিলাম। (তিবরানী শরীফ, আল আমন ওয়াল উলা- ২৬৩ পৃঃ)

সবকঃ আল্লাহ তাআলা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বেহেশতের পূর্ণ কর্তৃত্ব দান করেছেন। তাঁর এ সার্বিক ক্ষমতা না থাকলে, বেহেশতের ঝর্না প্রদানের কথা বলতেন না।

কাহিনী নং- ১৬৬

মুবারক হাত

একবার হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বায়তুল্লাহ শরীফ যেয়ারতের উদ্দেশ্যে ওমরার নিয়তে মক্কা মুয়াজ্জমার অভিমুখে রওয়ানা হলেন। বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরামও তাঁর সাথে ছিলেন। পথে হুদাইবিয়া নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করলেন এবং হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু)কে আগাম বার্তা বাহক হিসেবে মক্কার কোরাইশদের কাছে পাঠালেন যেন তাদেরকে গিয়ে বলেন যে ,আমরা কোন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে আসিনি, আমরা একমাত্র বায়তুল্লাহ শরীফ যেয়ারতের জন্য এসেছি এবং যে সব মুসলমান মক্কা-মুয়াজ্জমায় আছেন, তাদেরকে যেন বলা হয়, ভয় করো না, অতি শীঘ্রই মক্কা-মুয়াজ্জমা জয় হয়ে যাবে। হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বার্তা বাহক হয়ে মক্কা-মুয়াজ্জমায় পৌছলেন এবং মক্কার কুরাইশদেরকে হুযূরের বাণী শুনালেন। মক্কার কুরইশরা বললো, এ বছরতো আমরা মুহাম্মদকে মক্কায় আসতে দিব না। আপনি যদি কাবা তওয়াফ করতে চান, তাহলে সানন্দে করতে পারেন। হযরত ওসমান বললেন, এ রকম হতে পারে না, আমি রসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বাদ দিয়ে কখনো তওয়াফ করবো না। তিনি ওদের থেকে বিদায় হয়ে মক্কার গরীব

মুসলমানদের কাছে গেলেন এবং ওদেরকে আশু মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ জানালেন।

এদিকে হুদাইবিয়ায় অবস্থানরত সাহাবায়ে কিরাম হযরত ওসমান সম্পর্কে বলাবলি করতে লাগলেন যে, ওসমান বড় সৌভাগ্যবান, এতক্ষণে তিনি মক্কা-মুয়াজ্জমায় পৌছে গেছেন এবং বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফে নিয়োজিত হয়ে গেছেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন, ওসমান আমাকে ছাড়া তওয়াফ করবে না।

হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) ফিরে আসতে একটু দেরী হওয়ায় তাঁর সম্পর্কে এ গুজবটা ছড়িয়ে গেল যে, মক্কার কুরাইশরা হযরত ওসমানকে শহীদ করে ফেলেছে। এ গুজবে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাফিরদের মুকাবেলায় জিহাদে অটল থাকার জন্য সাহাবায়ে কিরাম থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করেন। যেহেতু হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) উপস্থিত ছিলেন না, সেহেতু হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় বাম হাত তাঁর ডান হাতের উপর রেখে বললেন এটা ওসমানের হাত। আমি ওসমান থেকেও প্রতিশ্রুতি নিচ্ছি। তফসীরে খাজায়েনুল এরফান ৭২২পৃঃ তারীখুল খোলাফা ১০৭ পৃঃ)

সবকঃ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মুবারক হাতকে ওসমানের হাত বলেছেন। এতে প্রতিভাত হয় যে, হুযূরের সাথে হযরত ওসমানের একটা বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। যারা হযরত ওসমানের বিরোধী এ দৃষ্টিকোন থেকে তারা হুযূরেরও বিরোধী। হযরত ওসমানের কাছে হুযূর এত প্রিয় ও সন্মানিত ছিলেন যে, তিনি হুযূরকে বাদ দিয়ে বায়তুল্লাহ শরীফ তওয়াফেরও গুরুত্ব দিলেন না। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটা জানতেন যে, হযরত ওসমান শহীদ হননি বরং সহীহ সালামতে আছেন। এ জন্যইতো তিনি তাঁর হাত মুবারককে ওনার হাত বলে বায়াত গ্রহণ করেন।

কুরআন মজীদ যেটা হযরত ওসমানের হাতে সংগৃহীত হয়েছে, এ দৃষ্টিতে সেটা আল্লাহর হাতেই সংগৃহীত হয়েছে। কেননা হযরত ওসমানের হাত হুযূরের হাত এবং হুযূরের হাত আল্লাহরই হাত। অতএব হুযূরের ওসীলায় হযরত ওসমানের হাত আল্লাহর হাতই হলো এবং হযরত ওসমানের হাতে সংগৃহীত কুরআন যেন আল্লাহর হাতেই সংগৃহীত।

কাহিনী নং- ১৬৭

অতুলনীয় দাওয়াত

একবার হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) হুযূরকে তাঁর ঘরে দাওয়াত দিলেন এবং আরয করলেন, ইয়া রসূলল্লাহ! আপনি আপনার বন্ধুবান্ধব সহ আমার গরীবালয়ে তশরীফ নিয়ে যাবেন এবং সামান্য ডাল রুটি গ্রহণ করবেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ দাওয়াত গ্রহণ করলেন এবং যথা সময়ে সাহাবায়ে কিরামকে সাথে নিয়ে রওয়ানা হলেন। হযরত ওসমানও হুযূরের সাথে সাথে যেতে লাগলেন এবং ওনার ঘরের দিকে যাওয়ার পথে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যতটি কদম মুবারক রাখতে ছিলেন, তিনি তা গণনা করছিলেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, হে ওসমান! কি ব্যাপার, আমার কদম গণনা করছ কেন? হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহ আনহু) আরয করলেন, ইয়া রাসূলল্লাহ! আমার মা-বাপ আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, আমি মনস্থ করেছি যে, আপনার প্রতিটি কদমের জন্য আপনার ইজ্জত ও সন্মানার্থে এক একটি গোলাম আজাদ করবো। তিনি তাই করেছেন। তাঁর ঘর পর্যন্ত হুযূর যতবার কদম মুবারক রেখেছেন, তিনি ততজন গোলাম আজাদ করে দিয়েছেন, (জামেউল মুজেজাত- ৬৫ পৃঃ)

সবকঃ হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) বড় ধনী ও বড় দানী ছিলেন এবং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সত্যিকার আশেক ছিলেন।

কাহিনী নং- ১৬৮

মোহর মুবারক হরণ

হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) এর কাছে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যে মোহর মুবারক ছিল, যেটার উপর محمد رسول الله (মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ) খুদানো ছিল। এক দিন হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) একটি কূপের পাশে বসে ছিলেন এবং ঘটনাক্রমে সেই মোহরটা তাঁর হাত থেকে কূপে পড়ে গেল। সেই কূপে কোমর পর্যন্ত পানি ছিল। তিনি ঘোষণা দিলেন, যে ব্যক্তি মোহরটা কূপ থেকে খুঁজে বের করে দেবে ওকে এক লাখ মুদ্রা পুরস্কার দেব। লোকেরা আপ্রাণ চেষ্টা করলো, সেই কূপের মাটি পর্যন্ত বের করে ফেললো, কিন্তু

মোহর খুঁজে পেল না।

এ মোহরের বরকতে সবাই তাঁর অনুগত ছিল কিন্তু মোহর হারায়ে যাবার পর তাঁর প্রতি লোকদের ধ্যান ধারণা কিছুটা পরিবর্তন হয়ে গেল। তাঁর বিরুদ্ধে নানা রকম ভিত্তিহীন অভিযোগ করতে লাগলো একেবারে নগণ্য বিষয়ের জন্যও তাঁকে দোষারোপ করতে লাগলো। এক ব্যক্তি মদীনা শরীফে কবুতর উড়াতে শুরু করলো, তিনি কবুতর গুলোর পালক কেটে দিলেন। ফলে সেই কবুতর উড়ানো কারী তাঁর শত্রু হয়ে গেল। অন্য একজন তীর নিক্ষেপন শুরু করলো।তিনি মানুষের ক্ষতির কথা চিন্তা করে সেটা বন্ধ করে দিলেন। ফলে সেই তীর নিক্ষেপকারীও তাঁর শত্রু হয়ে গেল। মোহর হারানোর পর এভাবে বিনা কারণে লোকেরা তাঁর বিরোধী হতে লাগলো। সীরাতুস সালোহীন- ৯৯ পৃঃ)

সবকঃ শাহাদতের সৌভাগ্য লাভ করাই ছিল এ সবকিছুর মূল কারন। এ শাহাদতের খবর হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওনাকে অনেক আগেই বলে দিয়েছিলেন। যেমন একবার হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত আবু বকর, ওমর ও ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহুম)কে সাথে নিয়ে এক পাহাড়ে গিয়ে ছিলেন। সেই পাহাড়টা নড়ে উঠলে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর পা মুবারক দিয়ে পাহাড়ে আঘাত করে ফরমালেন, হে পাহাড়, স্থির হও। তোমার উপর এক নবী, এক ছিদ্দিক এবং দুই শহীদ দাঁড়ানো আছে। (মেশকাত শরীফ ৫৫৪ পৃঃ)

শহীদদ্বয় ছিলেন, হযরত ওমর ও ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহুমা) হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত ওসমানের কানেও একবার তাঁর শাহাদতের পূর্ণ কাহিনী বর্ণনা করে ছিলেন। (নজহাতুল মাজালিস) এজন্য মোহর হারানোর পর থেকে তাঁর শাহাদতের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল।

কাহিনী নং- ১৬৯

এক ফিৎনাবাজ ইহুদী

আবদুল্লাহ বিন সাবা নামে এক কুটিল ও ফিতনাবাজ ইহুদী ছিল। সে হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) এর যুগে লোক দেখানো মুসলমান হয়েছিল। এ মুনাফেক

কিছু দিন মক্কা-মদীনায় অবস্থান করলো কিন্তু ওর কোন চাল এখানে সফল হলো না। অতঃপর সে সেখান থেকে বসরা শহরে গেল এবং ওখানে কিছু কুৎসা রটালো, এরপর কুফা শহরে গেল কিন্তু কোথাও সে তার অসৎ উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে চরিতার্থ করার সুযোগ পেল না।

যখন মিসরে গেল, তখন সে মিসরবাসীকে প্রথমে এ কথাটি জিজ্ঞেস করলো, বলুন, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মর্তবা বেশী, নাকি ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর? সবাই একবাক্যে বললো যে আমাদের হুযূরের মর্তবা বেশী। সে বললো, তাহলে তো বড় আফসোসের বিষয় যে, কিয়ামতের আগে ঈসা তো পুনরায় দুনিয়ায় আসবেন এবং কাফিরদেরকে ধ্বংস করবেন, কিন্তু আমাদের হুযূর আসবেন না এবং তাঁর শত্রুরা যা ইচ্ছে তা করবে। এ রকম কি হতে পারে? মিশরবাসীর অনেকেই এ কথাটা মেনে নিল। তার এ চাল যখন সফল হলো, তখন সে আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বললো, প্রত্যেক নবীর একজন অসিয়তকৃত লোক থাকে এবং আমাদের নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অথিয়তকৃত লোক হচ্ছেন হযরত আলী (কর্রমাল্লাহু অজহাহু)। খেলাফতের হকদার অছিয়তকৃত ব্যক্তিই হয়ে থাকে। ওসমান খেলাফত দখল করে নিয়েছে। তোমরা যেকোন প্রকারে ওসমানকে উৎখাত করে আলীকে বসাও।

এ বেদ্বীন ইহুদী হযরত আলীরও শুভাকাঙ্খী ছিল না। মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করাটা ছিল ওর উদ্দেশ্য। কিছু লোক তার এ কুমন্ত্রনায় সায় দিল এবং বলতে লাগলো আমরা ওসমানকে যে কোন প্রকারে খেলাফত থেকে উৎখাত করবো। সে পরামর্শ দিল যে, তোমরা প্রথমে হযরত ওসমানের পক্ষ থেকে নিয়োজিত মিসরের শাসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কর এবং লোকদেরকে তোমাদের সমর্থক বানাতে চেষ্টা কর এবং মিসর ও বসরায় বিভিন্ন জায়গায় চিঠি লিখ যেন প্রত্যেক জায়গা থেকে শাসকদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপিত হয়। এ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে শাসকদের সম্পর্কে মিথ্যা অভিযোগ লিপি হযরত ওসমানের কাছে প্রেরিত হলো এবং জনমতও বিভ্রান্ত হতে লাগলো। কুফা ও বসরার অনেক লোকও এ ষড়যন্ত্রে জড়িত হয়ে পড়লো। এমনকি মিসর, কুফা ও বসরার অধিবাসীরা একজোট হয়ে হযরত ওসমানের কাছে চিঠি লিখলো যে, আপনিতো সবদিক দিয়ে আরামে আছেন কিন্তু আপনার প্রশাসকগণ আমাদের উপর বড় অত্যাচার করতেছে। আপনি ওদেরকে অপসারণ করুন। হযরত ওসমান

উত্তরে লিখলেন যে, যার যার উপর আমার শাসকগণ জুলুম করেছে, তারা যেন এবার নিশ্চয় হজ্ করতে আসে, আমার প্রশাসকগণও আসবে। তখন প্রমাণ সাপেক্ষ সব জুলুমের বিচার হবে। প্রশাসকগণ যথাসময়ে আসলেন কিন্তু অভিযোগকারীদের মধ্যে কেউ আসলো না। হযরত ওসমান প্রশাসকগণকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কেন জুলুম করেন? ওনারা সবাই জবাব দিলেন যে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। আমরা কখনো কোন জুলুম করি নি। তখন হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) বুঝতে পারলেন যে, এসব অভিযোগ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। (সীরাতুল সালেহীন ১০০ পৃঃ)

সবকঃ হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) এর বিরুদ্ধে এ ষড়যন্ত্র ইহুদীরাই করেছিল। ইহুদীদের এটাই কাম্য ছিল যে, মুসলমানগণ পরস্পর মারা মারি করে ধ্বংস হয়ে যাক এবং তারা তৃপ্তিবোধ করুক।

কাহিনী নং- ১৭০

প্রশাসক পরিবর্তন

কুখ্যাত মুনাফিক ইবনে সাবার ষড়যন্ত্রে মিসর কুফা ও বসরার অধিবাসীগণ হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু)এর বিরোধী হয়ে গেল এবং বসরার লোকেরা একবার ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করে হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) এর কাছে চিঠি লিখলে, তিনি এর উত্তর দেন কিন্তু দ্বিতীয় বার একই রকম ভিত্তিহীন চিঠি লিখলে তিনি এর উত্তর দিলেন না। অতঃপর ইবনে সাবার প্ররোচনায় এক হাজার মিসরী, এক হাজার কুফী এবং পাঁচশ বসরী লোক একজোট হয়ে হজ্জের নাম করে মদীনা মনোয়ারার দিকে রওয়ানা হলো এবং মদীনায় এসে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেললো। হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) যখন দেখলেন যে এ সব লোকের মনোভাব খুবই খারাপ, তখন তিনি হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর কাছে গেলেন এবং বললেন, তুমি আমার আত্মীয়, এসব লোক তোমার কথা মেনে নিবে। তুমি ওদেরকে নিষেধ কর যেন আমার রক্ত দ্বারা তাদের হাত রঞ্জিত না করে, তাদের উদ্দেশ্য কি জেনে নাও, আমি পূর্ণ করবো। হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) ওদের সামনে গেলেন এবং কঠোর ভাবে ওদেরকে দমন করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের উদ্দেশ্য কি? ওরা বললো, মিসরের বর্তমান প্রশাসককে অপসারণ করা হোক এবং তাঁর জায়গায় মুহাম্মদ বিন আবু বকরকে

প্রশাসক নিয়োগ করা হোক। হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) তাদের এ দাবী মেনে নিলেন এবং আগের প্রশাসককে অপসারণ করে মুহাম্মদ বিন আবু বকরকে নিয়োগ দিলেন।মিসরবাসী এতে সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেল। (তারীখুল খোলাফা- ১১ পৃঃ সীরাতুস সালেহীন ১১০ পৃঃ)

সবকঃ এসব বিদ্রোহী নামে মাত্র হযরত আলীর সমর্থক ছিল। মূলতঃ এরা ইবনে সাবার ষড়যন্ত্রের শিকার ছিল। স্বয়ং হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) এর সমর্থক ছিলেন। তিনি কঠোর ভাবে ওসব বিদ্রোহীদের দমন করেছিলেন। অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে তিনি হযরত ওসমানকে বলেছিলেন, হে আমীরুল মুমেনীন, আমাকে অনুমতি দিন আমি আপনার পক্ষে এ বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করবো। কিন্তু হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) অনুমতি দেন নি বরং বলেছেন, হে আলী, আমি চাইনা যে আমার জন্য মানুষের রক্ত ঝরুক।

কাহিনী নং- ১৭১

জাল চিঠি

মরওয়ান নামে হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) এর এক আত্মীয় ছিল, সে খুবই ধুরন্ধর ও ফিতনাবাজ ছিল। হযরত ওসমান কর্তৃক মিসরের প্রশাসককে বরখাস্ত করে মুহাম্মদ বিন আবু বকরকে নিয়োগ দানটা মরওয়ানের খুবই খারাপ লাগলো, কারণ বরখাস্তকৃত প্রশাসক তার নিকট আত্মীয় ছিল। সে মিসরের প্রশাসকের নামে এভাবে একটি জাল চিঠি লিখলো 'এ চিঠি আমীরুল মুমেনীনের পক্ষ থেকে প্রেরিত হলো, যখন মুহাম্মদ বিন আবু বকর তোমার কাছে পৌছবে, তখন ওকে কতল করে দিও এবং ওর সাথে অমুক অমুক সাত ব্যক্তিকেও কতল করে দিও'।

এভাবে লিখে সংগোপনে ওটার উপর হযরত ওসমানের সীল মেরে তাঁরই এক গোলামকে উটের উপর আরোহণ করায়ে মিসর পাঠিয়ে দিল। পথে মুহাম্মদ বিন আবু বকরের লোকের সাথে এ গোলামের দেখা হয়ে গেল। ওরা গোলামকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কোথায় যাচ্ছ। সে বললো মিসর যাচ্ছি। জিজ্ঞেস করলো, কেন যাচ্ছ? বললো, আমীরুল মুমেনীনের একটি বাণী মিসরের প্রশাসকের কাছে

নিয়ে যাচ্ছি। ওরা বললো মিসরের প্রশাসকতো আমাদের সাথে আছেন, বাণীটা ওনাকে বলতে পার। সে বললো, বর্তমান যিনি মিসরে আছেন, তাঁকে পৌছাতে হবে ওরা জিজ্ঞেস করলো, তোমার কাছে কোন চিঠি আছে? সে বললো, না, আমার কাছে কোন চিঠি নেই। ওদের সন্দেহ হওয়ায় তল্লাসী চালালো এবং ওর কাছে হযরত ওসমানের পক্ষ থেকে মিসরের বরখাস্ত কৃত প্রশাসকের নামে একটি চিঠি খুঁজে পেল, যেথায় লিখা ছিল যে মুহাম্মদ বিন আবু বকরকে লোকেরা জোর জবরদস্তি করে প্রশাসক নিয়োগ দানে বাধ্য করেছে। এরা যখন মিসর পৌছবে, তখন মুহাম্মদ বিন আবু কবরের হাত-পা কেটে দিও এবং ওর সাথে আগত সবাইকে খতম করে দিও।

এ চিঠি দেখে সবাই রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল এবং মদীনা মনোয়ারায় ফিরে এসে মদীনার সমস্ত লোককে সমবেত করে সেই চিঠি নিয়ে হযরত ওসমানের খেদমতে হাজির হলেন এবং চিঠি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এ চিঠি আপনি লেখায়েছেন? হযরত ওসমান সেই চিঠি দেখে হতবম্ভ হয়ে গেলেন এবং বললেন, এ চিঠি আমি কক্ষনো লেখাইনি। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো পত্রবাহক যে উটে করে যাচ্ছিল, সেটা কি আপনার নয়? তিনি বললেন হ্যাঁ, উটটাতো আমার। ওরা জিজ্ঞেস করল, উটে আরোহন করে যে গোলামটি চিঠি নিয়ে যাচ্ছিল, সেই গোলামটাও কি আপনার নয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ সে গোলামটা আমার। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো চিঠির উপর সীলটা কি আপনার নয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ সীলটাও আমার। ওরা বললো, তাহলে এ চিঠিটা কি করে আপনার নয়? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, এ চিঠি আমি লিখিনি এবং লেখাইনি, আমার সীলটা কেউ চুরি করে নিয়ে গিয়ে চিঠিতে মেরে দিয়েছে। তখন উপস্থিত বিদ্রোহীরা বললো, উনি এমন বৃদ্ধ হয়ে গেছেন যে ওনার সীল ও চিঠির খবরও নেই। তাই যে কোন অবস্থায় ওনাকে খেলাফত থেকে অপসারণ করতে হবে। অন্যথায় ওনাকে হত্যা করা হবে। (তারীখুল খোলাফা ১১১ পৃঃ সীরাতুস সালেহীন ১০২ পৃঃ)

সবকঃ হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) এর বিরুদ্ধে ইবনে সাবার ষড়যন্ত্র এবং মরওয়ানের চালবাজির দ্বারা এসব অঘটনের সূত্রপাত হয়েছিল এবং তাঁর শাহাদতের সময়ও ঘনিয়ে এসেছিল।

কাহিনী নং- ১৭২

হযরত ওসমানের শাহাদত

কুখ্যাত মুনাফিক ইবনে সাবার ষড়যন্ত্র ও মারওয়ানের চালবাজির দ্বারা বসরা, কুফা ও মিসরের অধিবাসীরা নিরাপরাধ হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) এর রক্তে তাদের হাত রঞ্জিত করা ছাড়া থাকতে পারলো না। তারা বিরাট দল পাকিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মদীনা শরীফ এসে উপস্থিত হলো। ঐ সময় সাহাবায়ে কিরাম হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) এর কাছে ওদেরকে মেরে পিটে মদীনা শরীফ থেকে বের করে দেয়ার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু তিনি অনুমতি দিলেন না। বরং বললেন, তোমাদের উপর আল্লাহর কসম, আমার জন্য কোন মুসলমানের এক ফোটা রক্তও ঝরায়ো না। আমি কিয়ামতের দিন আল্লাহকে কি জবাব দিব? সাহাবায়ে কিরাম পুনরায় বললেন, আপনি মক্কা মুয়াজ্জমায় চলে যান বা সিরিয়ায় চলে যান, সেখানে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া আছেন এবং তাঁর বিরাট বাহিনীও আছে। তিনি বললেন, বন্ধুগণ, আমি শেষ সময় কিভাবে আমার নবীর রওজা মুবারক ত্যাগ করে চলে যাব? তবে মসজিদে নববীতে যাচ্ছি এবং ওদেরকে জিজ্ঞেস করবো, তারা বিনা কারণে আমাকে কেন হত্যা করতে চায়।

সেমতে তিনি মসজিদে নববীতে তশরীফ নিয়ে গেলেন এবং বিদ্রোহীদেরকে সম্বোধন করে বললেন, "হে মিসরের লোকেরা, তোমরা আমাকে কেন হত্যা করতে চাচ্ছ? আমার আয়ুষ্কালতো প্রায় শেষ হয়ে আসছে, অল্প মাত্র বাকী আছে। আমিতো এমনিতে মারা যাব।" খোদার কসম করে বলছি, কোন সময় লোকেরা যখন কোন নবীকে হত্যা করেছে, তখন এর পরিনামে হাজার হাজার লোক খুন হয়েছে। আমি সায়্যেদুল মুরসালীন (সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লাম) এর খলীফা। আমার বদলেও আশি হাজার লোক খুন হবে। যদি মুসলমানেরা আমার হত্যাকারীদের প্রতিশোধ না নেয়, তাহলে আসমান থেকে আল্লাহ তাআলা পাথর বর্ষণ করে আমার হত্যাকারীদেরকে ধ্বংস করবেন। তাই এ রকম আচরণ করো না। খোদার কসম করে বলছি, এখনতো তোমরা আমার মৃত্যু কামনা করছ কিন্তু আমাকে হত্যা করার পর তোমারা হাহুতাস করে বলবে, আহ! যদি হযরত ওসমানের এক এক নিঃশ্বাস এক এক বছরের সমান হতো।" চোরে শুনে না ধর্মের কাহিনী, এসময় এক বিদ্রোহী তাঁর হাতের লাটিটা, যেটা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহিস

ওয়া সাল্লাম) এর তাবররুক হিসেবে ছিল, তাঁর হাত থেকে টেনে নিয়ে নিজের হাঁটুর উপর রেখে ভেঙ্গে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে ওর হাঁটুতে একটি ছিদ্র হলো এবং সমস্ত শরীর গলে গিয়ে সন্ধ্যা হওয়ার আগে মারা গেল। এরপর হাজার হাজার বিদ্রোহী হযরত ওসমানের আসে পাশে এসে সমবেত হলো এবং তাঁর ঘর ঘিরে ফেললো এবং তারা ঘোষনা করলো যে, তাঁকে হত্যা করা ছাড়া এ অবরোধ প্রত্যাহার করবে না। তারা সবের আসা যাওয়া বন্ধ করে দিল, নামাযের জন্যও তাঁকে ঘর থেকে বের হতে দিল না, খাবারের কোন কিছুও ঘরের ভিতরে নিয়ে যেতে দিলনা। এমন কি পানি সরবরাহ পর্যন্ত বন্ধ করে দিল। ঘরে যা ছিল, তা শেষ হয়ে গেলে, ঘরের সবাই তৃষ্ণায় একেবারে কাতর হয়ে গেল। সাত দিন এভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর যখন এক ফোঁটা পানিও পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন হযরত ওসমান ঘরের জানালা দিয়ে মাথা বের করে আওয়াজ দিলেন, এখানে কি আলী আছে? কেউ জবাব দিল না। পুনারয় আওয়াজ দিলেন, এখানে কি সাদ আছে? কোন জবাব আসলো না। পরিশেষে তিনি অবরোধকারী লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন, হে উম্মতে মুহাম্মদী! রোম ও পারস্যের বাদশাহও কাউকে গ্রেপ্তার করলে, খাবার দিয়ে থাকে। কিন্তু আমি তোমাদের কাছে এমন কয়দী হলাম যে পানি পর্যন্ত দিচ্ছ না। এমন কেউ আছে যে আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে এক গ্লাস পানি দেবে? এর পরিবর্তে আমি আমার নবী থেকে হাউজে কাউসারের যে প্রথম গ্লাস পানি লাভ করবো, সেটা ওকে দিয়া দিব। কিন্তু কোন সাড়া পেলেন না। কারণ ওদের কাছে হাউজে কাউসারের পানির কোন গুরুত্ব নেই। যখন হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) এ অবস্থার খবর পেলেন, তখন তিনি তিন মোশক পানি নিয়ে কোমরে তালোয়ার ঝুলায়ে এবং মাথায় হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লাম) এর পাগড়ী মুবারক বেঁধে রওয়ানা হলেন এবং লোকদেরকে বললেন, এমন কাজ কাফিরেরাও করে না যা তোমরা করতেছ। পানি বন্ধ কর না। দেখ, আল্লাহর গজব নাজিল হবে। কিন্তু ওসব জালিমরা তাঁর কথা শুনলো না, বর্শা নিক্ষেপ করে মোশক ফুটা করে দিল এবং পানি পড়ে গেল। এ সময় উম্মুল মুমেনীন জনাব উম্মে হাবীবাও একটি খচ্চরে আরোহণ করে এক মোশক পানি নিয়ে এসেছিলেন এবং মনে করে ছিলেন যে কমবখতরা ওনাকে ইজ্জত করবে। তিনি ওদেরকে বললেন, বনী উমাইয়ার কিছু আমানত ওসমানের কাছে আছে। তাই আমি ওর কাছে যেতে চাচ্ছি যেন সেই আমানতটা নিয়ে আসি। এটা শুনে বিদ্রোহীরা 'মিথ্যা কথা' বলে উড়ায়ে দিল এবং খচ্চরের

মুখে লাকড়ি দিয়ে আঘাত করলো এবং পর্দার বন্ধনী কেটে দিল, ফলে খচ্চর তাঁকে নিয়ে এক দিকে দৌড় দিল এবং তিনি পড়ে যাওয়া থেকে কোন মতে রক্ষা পেলেন। এ ঘটনা দেখে অন্যান্য লোকেরা ঘাবড়িয়ে গেল এবং বললো আল্লাহ তোমাদের সর্বনাশ করবে। নবীর সম্মানিতা স্ত্রীর সাথে এ ধরণের আচরণ করতে পারলে? মদীনাবাসীরা ক্ষেপে গেলেন এবং তলোয়ার হাতে নিয়ে হযরত ওসমানের কাছে গিয়ে আরয করলেন, নবীর সম্মানিতা স্ত্রীও ওদের হাতে বেইজ্জত হচ্ছে, আপনি যুদ্ধের অনুমতি দিন। হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) বললেন, তোমরা আমার জন্য তোমাদের জান মালের ক্ষতি করনা। আমি ইচ্ছে করলে এক্ষনি হাজার হাজার সৈন্য সিরিয়া ও ইরাক থেকে আনাতে পারি। কিন্তু আমি কখনো যুদ্ধ করতে চাই না। অতঃপর সবাইকে কসম দিয়ে ফিরায়ে দিলেন।

এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত ওসমান পানির তৃষ্ণায় ভীষন কষ্ট অনুভব করলেন। তখন তিনি পুনরায় তাঁর মুখ জানালা দিয়ে বের করে বললেন, তোমরা নিশ্চয় জান যে যখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লাম) মদীনা মনোয়ারায় তাশরীফ এনেছিলেন, তখন ওখানে মুসলমানদেরকে ইহুদীর ঝর্ণা থেকে পানি ক্রয় করে পান করতে হতো। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লাম) যখন ঘোষনা দিলেন, কে আছে এ ঝর্নাটা ক্রয় করে মুসলমানদেরকে দিয়া দিবে এবং এর বদলে জান্নাতের ঝর্না নিয়ে নিবে, তখন আমি সেই ঝর্নাটা পাঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে ক্রয় করে তোমাদের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছি। আর আজ চল্লিশ দিন ধরে ওসমানের শিশু সন্তানগণ পানির জন্য কাঁদছে, ওরা পানি পাচ্ছে না। তোমরা জান যে, মসজিদে নববী প্রথমে খুবই সংকীর্ণ ছিল। আমি পচিশ হাজার টাকা দিয়ে জায়গা ক্রয় করে মসজিদের সম্প্রসারণ করেছি। কিন্তু তোমরা আমাকে মসজিদে নববীতে দু রাকাত নামায পড়তে বাঁধা দিচ্ছ। কিয়ামতের দিন কি অজুহাত পেশ করবে?

পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত হযরত ওসমান ঘরে বন্দী রইলেন। এ সময়ে প্রায় দিন তিনি রোযা রাখছিলেন। এক রাত্র স্বপ্ন দেখলেন যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লাম) তাঁর রওজা শরীফ থেকে বাইরে আসলেন। হযরত আবুবকর ও হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহুমা)ও তাঁর সাথে আছেন। হযরত ওসমানের কাছে এসে ফরমালেন, হে ওসমান, তোমার কি ভীষণ পানির তৃষ্ণা লাগছে? তুমিতো চল্লিশ দিন পর্যন্ত রোযা রেখেছ। আগামী কাল তুমি আমাদের কাছে এসে রোযা খুলবে, আমরা

হাউজে কাউসারের পানি দ্বারা তোমার রোযা খোলাবো। হে ওসমান, কাল তুমি শহীদ হবে এবং রক্তের প্রথম ফোঁটা এ আয়াত فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ এর উপর পড়বে।

এ স্বপ্ন দেখে হযরত ওসমান স্বীয় ঘরের দরজা খুলে দিলেন এবং বললেন, আসতে দাও, আজ তো আমাকে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লাম) হাউজে কাউসারের দাওয়াত দিয়ে গেছেন। দরজা খোলার সাথে সাথে বিদ্রোহীরা ভিতরে প্রবেশ করলো এবং কেউ যেন আর দরজা বন্ধ করতে না পারে, সে জন্য কপাটে আগুন লাগিয়ে দিল। দরজার উপরে যে খড়ের ছাউনি ছিল, সেটাতেও আগুন লেগে গেল। ঘরের লোকেরা ঘাবড়িয়ে গেল কিন্তু হযরত ওসমান তখন নামায পড়তে ছিলেন এবং সূরা তোয়াহা শুরু করেছিলেন। ঘরে আগুন লাগছিল কিন্তু তাঁর নামায বা কেরাত পড়ার মধ্যে সামান্যতম ব্যতিক্রমও ছিলনা। নামায থেকে ফারেগ হওয়ার পর কুরআন আনালেন এবং খুলতে ঐ আয়াত চোখের সামনে ভেসে উঠলো, যেটা স্বপ্নে দেখেছিলেন।

এক ব্যক্তি তাঁকে কতল করার জন্য তাঁর কাছে আসলো। তিনি ওকে বললেন, তুমি আমাকে হত্যা করনা। কেননা নবী আলাইহিস সালাম তোমার জন্য দুআ করেছিলেন। আল্লাহ তোমাকে ওসমানের রক্তে হাত রঞ্জিত করা থেকে রক্ষা করুক। তুমি কি আমার নবীর দুআর বিপরীত করবে? সে ব্যক্তি এ কথা শুনতেই নিস্তেজ হয়ে গেল এবং লজ্জিত হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম ঐ সময় সে জালিমদেরকে বললেন, খবরদার! ওসমানকে খুন কর না, এক ওসমানের বদলে আশি হাজার খুন হবে। এখন মদীনা মনোয়ারার হেফাজতে ফিরিশতাগণ নিয়োজিত আছেন। যে সময় ওসমানকে হত্যা করবে, ফিরিশতাগণ চলে যাবে। এক জালিম বলে উঠলো, আরে ইহুদীর বাচ্চা, তুমি কি জান? তোমার কাজে তুমি যাও। হযরত ওসমান বললেন, সবর কর।

ইত্যবসরে সওদান বিন হামরান নামে এক ব্যক্তি আসলো এবং বলতে লাগলো, ওসমান তুমি কোন্ ধর্মের উপর আছ? তিনি বললেন, আমি দীনে মুহাম্মদীর উপর আছি। এর পর সে খুব জোরে তাঁর গলা চেপে ধরলো। আর এক জালিম এসে তাঁর মুখে থাপ্পর মারলো এবং তাঁর দিকে তলোয়ার উঠালো। তিনি হাত দ্বারা তলোয়ার প্রতিহত করতে গিয়ে হাত কেটে গেল। তিনি বললেন, এটা সেই হাত, যেটা ওহী লিখতো। আজ এটা আল্লাহর রাস্তায় কাটা গেল। এটা সেই হাত, যেটা

সায়্যেদুল মুরসালীনের হাত মুবারকের উপর বায়াত করেছিল। এ হাত নবীর হাত মুবারকের সাথে লাগার পর থেকে কোন নাপাক জিনিস স্পর্শ করেনি। তাই তোমরা এ হাতকে একটু ভাল মতে দাফন করিও। সে জালিম বললো, তোমার সাহায্যকারীদের ডাক। তিনি বললেন, আমার সাহায্যকারী আমার কাছে আছেন। এর পর আর এক জালিম এসে বর্শা দিয়ে তাঁর মাথায় তিনটি এবং বুকে তিনটি আঘাত করলো ঐ সময় কুরআন শরীফ তাঁর সামনে ছিল এবং তিনি পড়তে ছিলেন। তাঁর রক্তের প্রথম ফোঁটা সেই আয়াতের উপর পড়ে ছিল। فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ। হে ওসমান! তোমার বদলা নেয়ার জন্য তোমার আল্লাহ যথেষ্ট। তিনি اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰه বলতে বলতে মাটিতে পড়ে গেলেন। সেই জালিম তাঁর বুকের পাজরের উপর আঘাত করে তিনটি পাজর ভেঙ্গে দিল। তাঁর পরিবারের জেওর ও ঘরের আসবাব পত্র লুঠ পাঠ করে নিয়ে গেল।

(তারীখুল খোলাফা- ১১২ পৃঃ সীরাতুস সালেহীন ১০১ পৃঃ)

সবকঃ আবদুল্লাহ বিন সাবা ইহুদী ষড়যন্ত্রের বীজ বপন করেছিল। মিসরবাসী এর শিকার হয়ে মুসলমানদের মধ্যে একটি বড় ফিতনা সৃষ্টি করেছিল। এ ফিতনা হযরত আলীর যুগে আরও ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল এবং ইহুদী ষড়যন্ত্র নানা রূপে আত্ম প্রকাশ করেছিল। হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) তার শাহাদতের সম্পূর্ণ ঘটনা আগে থেকে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লাম) থেকে জেনে ছিলেন এবং তিনি আল্লাহর ইচ্ছায় রাজি ছিলেন। এজন্য তিনি সাহাবায়ে কেরামকে ওদের সাথে যুদ্ধ করার অনুমতি দেন নি এবং সিরিয়া ও ইরাক থেকেও কোন সৈন্য তলব করেন নি।

ইবনে সাবার প্ররোচনায় বিদ্রোহীদের মনে সাহাবায়ে কিরামের ইজ্জত ও হুযূরের সম্মানিত স্ত্রীগণের প্রতি সন্মানবোধ বলতে কিছুই ছিল না।

হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) এর শাহাদত থেকে হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু) এর শাহাদত কোন অংশে কম ছিল না। বরং হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) এর শাহাদত আরও অধিক বেদনাদায়ক ছিল। কারবালায় জালিমরা মাত্র কয়েকদিন পানি বন্ধ করে দিয়েছিল কিন্তু হযরত ওসমানের বেলায় চল্লিশ দিনের অধিক পানি সরবরাহ বন্ধ ছিল। হযরত হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) থেকেও তিনি বড় মজলুম।

কাহিনী নং- ১৭৩

হযরত আলী মরতুজা

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লাম) এর চাচা আবু তালেবের অধিক সন্তান ছিল, যার মধ্যে হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) অন্যতম। একবার মক্কা মুয়াজ্জমায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল এবং মানুষ খুবই কষ্টে পতিত হয়েছিল। আবু তালেব তাঁর একক উপার্জন ও অধিক সন্তানের কারণে সেই দুর্ভিক্ষে খুবই অসুবিধায় পড়েন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লাম) তাঁর অপর চাচা হযরত আব্বাস (রাদি আল্লাহ আনহু)কে পরামর্শ দিলেন, চলুন, আমরা চাচা আবু তালেবের ঘরে গিয়ে ওনার পরিবারের বোঝা কিছুটা হালকা করে দিয়ে আসি। অতএব উভয়ে আবু তালেবের কাছে গিয়ে হযরত আব্বাস (রাদি আল্লাহু আনহু) তাঁর জিন্মায় জাফরকে নিয়ে নিলেন এবং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লাম) হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু)কে তাঁর জিম্মায় নিয়ে নিলেন। হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর বয়স ছিল তখন সাত, কি আট বছর। তিনি সেই বয়সেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।(নুজহাতুল মাজালিস ৩৪৩ পৃঃ ২ জিঃ)

সবকঃ হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লাম) এর হাতে লালিত পালিত হন এবং কম বয়সের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লাম) এর উপর ঈমান আনেন।

কাহিনী নং- ১৭৪

আবু তোরাব

একদিন হযরত আলী (রাদি আল্লাহ আনহু) মসজিদের দেয়ালের কাছে মাটিতে শুইয়ে আরাম করছিলেন এবং তাঁর পিঠ মাটির সাথে লেগেছিল। সেই সময় হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লাম) মসজিদে আসার পথে হযরত আলীকে মাটিতে শুয়ে থাকতে দেখে তাঁকে উঠালেন এবং নিজ হস্ত মুবারক দ্বারা ওনার পিঠ থেকে মাটি ঝেড়ে দিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, اجلس اباتراب। (হে মাটির বাপ, উঠে বস) হুযূরের মুখে আবু তোরাব শব্দটা হযরত আলীর ভীষণ পছন্দ হয়েছিল। তাঁর কাছে তাঁর আসল নাম থেকে এটা খুবই প্রিয় ছিল। আবু তোরাব বললে তিনি যতটুকু খুশী হতেন, আলী বললে ততটুকু খুশী হতেন না। (তারীখুল খোলাফা-

১১৮ পৃঃ)

সবকঃ হযরত আলীর কুনিয়তি নাম আবু তোরাব হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লাম) এর দেয়া ছিল। এ নামে একটি বিশেষ মহব্বত প্রতিফলিত হয়েছে। তাই হযরত আলীর কাছে এ নামটা খুবই প্রিয় ছিল। কারণ এটা প্রিয়জনের দেয়া প্রিয় নাম।

কাহিনী নং- ১৭৫

হায়দরে কর্রার

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবায়ে কিরামের সন্মানিত বাহিনীকে নিয়ে খায়বরের ইহুদীদেরকে দমন করার উদ্দেশ্যে বের হলেন এবং খায়বর গিয়ে ইহুদীদের কিল্লাসমূহ অবরোধ করলেন। ইহুদীরা যখন নিজদেরকে কিল্লাসমূহে অবরুদ্ধ দেখলেন, তখন তারা বাধ্য হয়ে কিল্লাসমূহের ভিতরে অবস্থান নিয়ে প্রতিরোধ করতে লাগলো। ইহুদীরা তাদের এসব কিল্লাসমূহের উপর বেশ আস্থাশীল ছিল। কিন্তু ইসলামের বীর সেনানীরা ওদের তীর ও পাথরের আক্রমণ প্রতিহত করে সাম্‌নে অগ্রসর হয়ে নাআম কিল্লাসহ আরও দু'টি কিল্লা দখল করে নেন। এর পর কামুস কিল্লার প্রতি এগিয়ে যান এবং সেটাও দু'দিনের মধ্যে দখল করে নেন। এভাবে মসআর, তবীহ, সলায়েম নামক কিল্লাসমূহও মুসলমানদের দখলে এসে যায়। এবার খায়বর কিল্লা দখলের পালা। এটা সবচে মজবুত কিল্লা ছিল। এটা দখল করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হলো কিন্তু দখল করা গেল না। কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন, খোদার কসম, কাল আমি ঝান্ডা এমন এক ব্যক্তির হাতে দিব, যে স্বীয় খোদা প্রদত্ত শক্তি বলে এ কিল্লা দখল করবে। দ্বিতীয় দিন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লাম) হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর হাতে ঝান্ডা দিলেন এবং ফরমালেন, যাও, তুমি এ কিল্লা দখল কর। হযরত আলী যখন স্বীয় বাহিনী ও ঝান্ডা নিয়ে খায়বর কিল্লার দিকে এগিয়ে গেলেন, তখন খায়বর কিল্লার অধিপতি মরহাব হযরত আলীর সাথে মুকাবেলা করার জন্য বের হয়ে আসলো, এবং এ কবিতাটি আবৃতি করলোঃ

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ اَنِّىْ مَرْحَبٌ - شَاكِى السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبٌ.

অর্থাৎ সমগ্র খায়বরবাসী জানে যে আমি সেই মরহাব, যে বিজ্ঞ যুদ্ধবাজ ও বীর

পুরুষ। হযরত আলী মরহাবের এ কবিতা শুনে এর উত্তরে নিম্নের কবিতাটি পাঠ করলেনঃ

اَنَا الَّذِىْ سَمَّتْنِىْ اُمِّىْ حَيْدَرَهْ- كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيْهِ الْمَنْظَرَهْ.

অর্থাৎ আমি সেই ব্যক্তি, যার মায়ের দেয়া নাম হচ্ছে হায়দর (বাঘ), যে জংগলের বাঘের চেয়ে ভয়ানক।

এরপর হযরত আলী ও মরহাবের মধ্যে মুকাবেলা শুরু হয়ে গেল। এক পর্যায়ে শেরে খোদা হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর তালোয়ার মরহাবের ঢাল কেটে মাথা দু'টুকরা করে ওর শরীরটাকেও দু'টুকরা করে ফেললো।

মরহাবের এ অবস্থা দেখে ওর অন্যান্য সাথীরা কিল্লা থেকে বের হয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমন করলো। কিন্তু ইসলামের বীর সেনানীরা বীর বিক্রমে জান বাজি রেখে এমন ভাবে পাল্টা আক্রমণ করলেন যে ওরা সম্মুখে দাঁড়াতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত পালিয়ে গেল। হযরত আলী কিল্লার সামনে গিয়ে কিল্লার সদর দরজাকে ধরে এমন জোরে টান দিলেন যে নিমিষে সেটাকে উপড়ায়ে ফেলে দিলেন এবং মুসলমানগণ কিল্লার ভিতরে ঢুকে পড়লেন। মুসলমানগণের এ আক্রমনে ইহুদীদের গর্ব খর্ব হয়ে গেল এবং খায়বার বিজয় হলো। (তারিখে ইসলাম- ২৩০ পৃঃ ১ হিঃ)

সবকঃ হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) বড় বীর বাহাদুর ছিলেন। তিনি শেরে খোদা নামে ভূষিত হয়ে ছিলেন। এ সব কিছু হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লাম) এর অবদান। এ কাহিনী থেকে এটাও বুঝা গেল যে, অহংকারী কাফিরদের মুকাবেলায় তাদের অহংকার খর্ব করার জন্য নিজের গুণাবলীকে গর্ববোধ করে প্রকাশ করা জায়েয।

কাহিনী নং- ১৭৬

লৌহ বর্ম চুরি

একবার হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর লৌহ বর্ম চুরি হয়ে গিয়েছিল এবং সেটা এক ইহুদীর কাছে পাওয়া গিয়েছিল। হযরত আলী ওকে বললেন, এটাতো আমার। ইহুদী বললো, আপনার হলে সাক্ষ্য প্রমাণসহ কাজীর দরবারে

বিচার দিন।

অতএব শেরে খোদা হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) হযরত কাজী শরীহ (রাদি আল্লাহু আনহু) এর আদালতে বিচার দিলেন এবং তিনি ও ইহুদী বাদী বিবাদী হিসেবে উপস্থিত হলেন। কাজী সাহেব নিরপেক্ষ ভাবে উভয়ের বক্তব্য শুনলেন এবং হযরত আলীর কাছে সাক্ষী তলব করলেন। হযরত আলী তাঁর সাহেব জাদা হযরত ইমাম হাসন (রাদি আল্লাহু আনহু) এবং তাঁর গোলাম কন্বরকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করলেন। উল্লেখ্য যে ছেলে ও গোলামের সাক্ষ্য হযরত আলীর মতে জায়েয ছিল কিন্তু কাজী সাহেবের মতে জায়েয ছিল না। এ বিষয়টির ব্যাপারে হযরত আলী ও কাজী সাহেবের মধ্যে মত পার্থক্য ছিল। কিন্তু কাজী হযরত আলীর মতের কোন তোয়াক্কা না করে স্বীয় ইজতেহাদের উপর আমল করে হযরত আলীর অভিযোগ খারিজ করে দেন।

আদালত থেকে বের হয়ে ইহুদী গভীর মনোযাগ সহকারে হযরত আলীর দিকে তাকালেন কিন্তু তাঁর চেহারায় কোন মলিনতা দেখলো না। সে মনে মনে চিন্তা করতে লাগলো যে হযরত আলী বর্তমান খলীফা ও শেরে খোদা নামে খ্যাত হওয়া সর্ত্বেও স্বীয় অভিযোগ খারিজ হয়ে যাওয়ায় ক্রুদ্ধ হলেন না এবং মোটেই অসন্তুষ্ট হলেন না। কোন্ জিনিসটা ওনাকে এর থেকে বিরত রাখলেন? এ প্রশ্নের উত্তর ইহুদীর মনই বলে দিল যে ইসলামই এর মূল কারণ। কাল বিলম্ব না করে সে হযরত আলীর পায়ে পতিত হলো এবং আরয করলো, হুযূর, আমি আপনার লৌহ বর্ম নিয়েছি কিন্তু আপনি আমার মন নিয়েছেন। অতঃপর সে কলেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেল। (মগনিউল ওয়ায়েজীন- ৫৭৬ পৃঃ)

সবকঃ ইসলাম ন্যায় বিচারের শিক্ষা দিয়েছেন। আমাদের পূর্বসূরীগণ সব সময় ন্যায় নীতিতে অটল থাকতেন। ইসলামের দৃষ্টিতে আইন কানুন বড়-ছোট রাজা-বাদশাহ সবের জন্য এক বরাবর। আমাদের বুজুর্গানে কিরাম এ ন্যায় বিচার ও ইসলামী আখলাকের তলোয়ার দ্বারা বিশ্ব জয় করেছিলেন।

কাহিনী নং- ১৭৭

অদ্ভুত ফয়সালা

আমীরুল মুমেনীন হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর খেলাফত কালে এক

যুবক ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং মনে মনে আল্লাহকে স্মরণ করে ন্যায় বিচারের প্রত্যাশা নিয়ে হযরত আলীর দরবারে হাজির হয়ে আরয করলো, হে আমীরুল মুমেনীন, আমার মা আমাকে নয় মাস পেটে ধারণ করেছেন এবং জন্মের পর দু'বছর দুধ পান করায়েছেন। কিন্তু এখন আমি যুবক হয়ে যাওয়ায় আমাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছেন। এমনকি আমি যে ওনার সন্তান, তা অস্বীকার করছেন, এবং বলেন যে তিনি নাকি আমাকে চিনেও না।

আমীরুল মুমেনীনঃ তোমার মা কোথায় থাকে?

যুবকঃ আমুক গোত্রের অমুক ঘরে থাকেন।

আমীরুল মুমেনীনঃ যুবকের মাকে আমার কাছে হাজির করা হোক।

তাঁর নির্দেশের সাথে সাথে সেই মহিলাকে ওর চার ভাই এবং চল্লিশজন সাক্ষী সহ হাজির করা হলো। ওরা কসম করে বললো যে এ মহিলা সেই যুবকটিকে চিনেও না। সে মিথ্যা দাবী করতেছে। ওর উদ্দেশ্য হচ্ছে, এ মহিলাকে ওর গোত্রের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করা। অথচ এ মহিলার এখনো বিবাহও হয়নি, তাই সন্তান কোত্থেকে হলো? সেতো এখনো কুমারী।

আমীরুল মুমেনীনঃ হে যুবক, তুমি কি বল্‌ছ?

যুবকঃ হে আমীরুল মুমেনীন, খোদার কসম, এ আমার মা, সে আমাকে জন্ম দিয়েছে, দুধ পান করায়েছে এবং বড় হওয়ার পর ঘর থেকে বের করে দিয়েছে।

আমীরুল মুমেনীনঃ হে মহিলা, এ ছেলে কি বলতেছে?

মহিলাঃ হে আমীরুল মুমেনীন, খোদার কসম, আমি ওকে চিনি না। সে আমাকে অনর্থক নাজেহাল করতে চাচ্ছে। আমি হলাম একজন কোরাইশী কন্যা এবং এখনও আমি কুমারী।

আমীরুল মুমেনীনঃ এ ব্যাপারে কি তোমার কাছে কোন সাক্ষী আছে?

মহিলাঃ জ্বি হ্যাঁ, (তার সাথে আগত চল্লিশ জনকে দেখায়ে বললো) এরা সব আমার সাক্ষী।

অতঃপর ঐ চল্লিশ জন লোক কসম করে মহিলার পক্ষে সাক্ষী দিল এবং যুবকটাকে মিথ্যুক বললো।

আমীরুল মুমেনীনঃ ঠিক আছে, আজ আমি তোমাদের মধ্যে এমন ফয়সালা করে দেব যেটা আল্লাহর পছন্দ হবে। হে মহিলা, তোমার কোন অভিভাবক আছে কি?

মহিলাঃ কেন থাকবে না। (ভাইদেরকে দেখায়ে বললো) এরা আমার ভাই।

আমীরুল মুমেনীনঃ (ভাইদেরকে সম্বোধন করে) আমার নির্দেশ তোমাদের কাছে এবং তোমাদের বোনের কাছে গ্রহণ যোগ্য হবে তো?

চার ভাইঃ নিশ্চয়! নিশ্চয়! কেন গ্রহনযোগ্য হবেনা। হে আমীরুল মুমেনীন, আপনি যা বলবেন, আমরা তা মেনে নিব।

আমীরুল মুমেনীনঃ আমি আল্লাহকে এবং উপস্থিত সবাইকে সাক্ষী করে এ মহিলাকে এ যুবকের সাথে চারশ দেরহাম নগদ মোহরানার বিনিময়ে বিবাহ দিলাম। অতঃপর তাঁর বিশিষ্ট গোলাম কম্বরকে ঘরে পাঠায়ে চারশ দিরহাম আনায়ে সেই যুবকের হাতে দিয়ে বললেন, এ দেরহাম গুলো মহিলার কোলে ঢেলে দাও এবং ওকে নিয়ে নিরিবিলি কোথাও চলে যাও, এবং কিছুক্ষণ পর আমার কাছে এমন অবস্থায় ফিরে এসো যেন তোমাদের শরীরে গোসলের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

যুবক এ নির্দেশ পেয়ে উঠে দাঁড়ালো এবং দেরহাম গুলো মহিলার কোলে ঢেলে দিল।

মহিলাঃ (চিৎকার দিয়ে) হে আমীরুল মুমেনীন, জাহান্নাম! জাহান্নাম!! আপনি কি আমাকে আমার ছেলের সাথে বিবাহ দিতে চান। খোদার কসম, এটা আমার গর্ভজাত সন্তান। আমার ভাইয়েরা আমাকে এক নিচু বংশের লোকের সাথে বিবাহ দিয়েছিল, যার ঔরসে এর জন্ম হয়। এ প্রাপ্ত বয়স্ক হলে ভাইদের নির্দেশে একে ঘর থেকে বের করে দিয়েছি এবং সন্তান বলতে অস্বীকার করেছি। আসলে এ আমার কলিজার টুকরা।

আমীরুল মুমেনীনঃ তাহলে আর কোন কথা নেই। নিজের ছেলেকে ঘরে ফিরায়ে নিয়ে যাও। (মগনিউল ওয়ায়েজীন- ৫৭৭ পৃঃ)

সবকঃ হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) ছিলেন জ্ঞান ভান্ডারের শাহী দরজা। এ জ্ঞানের বদৌলতেই তিনি বড় বড় সমস্যাদি সহজেই সমাধা করে ফেলতেন। এ ধরণের জটিল বিষয়াবলী দীনি ইলম দ্বারাই বোধগম্য হয়ে থাকে।

কাহিনী নং- ১৭৮

আট রুটি

দু'ব্যক্তি এক সাথে সফরে বের হয়েছিল। ওদের একজনের কাছে পাঁচটি, অন্য জনের কাছে তিনটি রুটি ছিল। পথে খাবার সময় হলে উভয়ে রুটিগুলো একত্রিত করে খেতে বসলেন। সে সময় তৃতীয় এক ব্যক্তি উপস্থিত হলে ওকে ডাকলেন এবং বললো, ভাই আসুন, খানা হাজির। লোকটি দাওয়াত গ্রহণ করলো এবং ওদের সাথে খেতে বসে গেল। তিনজন মিলে রুটিগুলো খেলেন। খাওয়ার পর তৃতীয় ব্যক্তি ওদেরকে আটটি টাকা দিলেন এবং উভয়কে টাকাগুলো ভাগ করে নিতে বলে চলে গেল।

তৃতীয় ব্যক্তিটি চলে যাবার পর ওরা টাকাগুলো ভাগ করতে বসলো। পাঁচ রুটিওয়ালা বললো আমার পাঁচ রুটি ছিল বিধায় আমি পাঁচ টাকা পাবো আর তোমার তিন রুটি ছিল বিধায় তুমি তিন টাকা পাবে। তিন রুটি ওয়ালা বললো, এ রকম হতে পারে না, সমান সমান ভাগ হতে হবে। যেহেতু উভয়ে একসাথে রুটি খেয়েছি, সেহেতু ভাগটাও বরাবর হবে। উভয়ের মধ্যে তর্ক বিতর্কের শেষ না হওয়ায় উভয়ে তাদের এ ঝগড়ার বিচারের জন্য হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর দরবারে হাজির হলো।

হযরত আলী সমস্ত ঘটনা শুনে তিন রুটি ওয়ালাকে বললেন, তুমি যদি তিন টাকা পাও, তাহলে তিন টাকাই নিয়ে নাও। এতে তোমার লাভ। অন্যথায় হিসেব করে নিতে গেলে তোমার ভাগে মাত্র একটাকা পড়ে। সে আশ্চর্য হয়ে বললো, এক টাকা! এটা কিকরে হতে পারে। ঠিক আছে, আমাকে হিসেব বুঝায়ে দিন। হিসেব মতে একটাকা পেলে একটাকা নিব।

হযরত আলী বললেন, তাহলে শোন, তোমার রুটি ছিল তিনটা এবং তোমার সাথীর ছিল পাঁচটা, মোট আট রুটি ছিল আর তোমরা রুটি ভোজনকারী ছিলে তিনজন। আট রুটির প্রতিটাকে তিন টুক্‌রা করলে চব্বিশ টুক্‌রা হয়। এ চব্বিশ টুক্‌রা তোমরা তিন জনের মধ্যে বন্টন করলে প্রত্যেকের ভাগে আট টুক্‌রা পড়ে অর্থাৎ প্রত্যেকে আট টুক্‌রা করে খেয়েছ। আট টুক্‌রা তুমি খেয়েছ, আট টুক্‌রা তোমার সাথী খেয়েছে। এবার মনোযাগ সহকারে শোন যে তোমার তিন রুটি ছিল,

ওগুলোকে তিন টুক্‌রা করলে, নয় টুকরা হয়। তোমার সাথী পাঁচ রুটি ছিল, ওগুলোকে তিন তিন টুক্‌রা করলে মোট পনের টুক্‌রা হয়। তাহলে তোমার নয় টুক্‌রা থেকে তুমি নিজে আট টুক্‌রা খেয়েছ, এবং কেবল এক টুকরা অবশিষ্ট ছিল, যেটা মেহমান খেয়েছে। আর তোমার সাথীর পনের টুক্‌রার মধ্যে সে নিজে খেয়েছে আট টুকরা এবং অবশিষ্ট সাত টুক্‌রা মেহমান খেয়েছে। অতএব তোমার এক টুক্‌রার জন্য তুমি এক টাকা এবং তোমার সাথী সাত টুক্‌রার জন্য সাত টাকা পাবে। এ ফয়সালা শুনে সেই লোকটি বিস্মত হলো এবং বাধ্য হয়ে এক টাকাই নিতে হলো এবং মনে মনে আফসোস করলো যে, তিন টাকা নেয়াটাই ভাল ছিল। (তারীখুল খোলাফা- ১১৬ পৃঃ)

সবকঃ হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) তাঁর মেধা ও প্রজ্ঞা দ্বারা বড় বড় জটিল বিষয় সমূহ সহজে বুঝে নিতে পারতেন। বাস্তবিকই তিনি মুশকিল আছানকারী ছিলেন।

কাহিনী নং- ১৭৯

বনের হিংস্র প্রাণী

এক ব্যক্তি হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর কাছে এসে আরয করলেন, জনাব আমি সফর করার মনস্থ করেছি। কিন্তু পথে হিংস্র প্রাণীর ভয় হচ্ছে। তিনি ওকে একটি আংটি দিয়ে বললেন, যখন তোমার সামনে কোন ভয়ানক পশু আসে, তুমি সঙ্গে সঙ্গে বলে দিও যে, এটা আলী বিন আবি তালেবের আংটি। এর পর লোকটি সফরে বের হলো এবং পথে ঠিকই একটি হিংস্র প্রাণী হঠাৎ ওকে হামলা করার জন্য দৌড়ে এলো। সে সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে বললো, হে হিংস্র প্রাণী, এ দেখ্, আমার কাছে আলী বিন আবি তালেবের আংটি আছে। হিংস্র প্রাণীটি যখন হযরত আলীর আংটি দেখলো, তখন স্বীয় মাথা আসমানের দিকে উঠালো এবং ওখান থেকে দৌড়ে একদিকে চলে গেল। এ মুসাফির সফর থেকে ফিরে এসে সম্পূর্ণ কাহিনী হযরত আলীকে শুনালো। হযরত আলী বললেন, সেই প্রাণীটি আসমানের দিকে মুখ করে এ শপথ করে ছিল যে, আমি এ এলাকায় আর কক্ষনো থাকবো না, যেখানে লোকেরা আলী বিন আবি তালেবের সামনে আমার সম্পর্কে অভিযোগ করে। (নজহাতুল মাজালিস- ৩৫১ পৃঃ ২ জিঃ)

সবকঃ শেরে খোদা (রাদি আল্লাহু আনহু) এর প্রভাব বনের বাঘ ও হিংস্র প্রাণীদের উপরও ছিল।

কাহিনী নং- ১৮০

জিব্রাইলের সন্ধান

হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর কাছে একবার হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম মানুষের আকৃতি ধারণ করে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন, হে আলী, আপনি তো জ্ঞান শহরের দরজা, একটু জিব্রাইলকে খুঁজে দেখুন দেখি এবং বলুন এ মুহূর্তে সে কোথায় আছে? হযরত আলী প্রথমে ডানে বামে দেখলেন, এর পর জমীনের দিকে দেখলেন অতঃপর উপরের দিকে দেখলেন এবং বললেন, এ মুহূর্তে জিব্রাইলকে আসমান সমূহেও দেখা যাচ্ছেনা এবং পৃথিবীর কোথাও দেখা যাচ্ছে না। অতএব আমার ধারণা মতে তুমিই জিব্রাইল। (নজহাতুল মাজালিস- ৩৫২ পৃঃ)

সবকঃ লক্ষ্যনীয় যে, হযরত আলী জ্ঞান-শহরের দরজা হয়ে এতকিছু বলতে পারেন। আর যিনি স্বয়ং জ্ঞানের শহর এবং মওলা আলীরও মওলা অর্থাৎ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জ্ঞানের প্রসারতাকে যে অস্বীকার করে এবং এরকম বলে যে হুযূরের কাছে দেয়ালের পিছনের খবরও নেই, সে কত বড় জাহিল ও অজ্ঞ।

কাহিনী নং- ১৮১

পুত্র সন্তানের মা

হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর খেলাফতকালে এক অন্ধকার রাতে দু'মহিলা সন্তান প্রসব করেছিল। ওদের একজনের হয়েছিল পুত্র সন্তান এবং অন্য জনের হয়েছিল কন্যা সন্তান। কিন্তু পুত্র সন্তানকে নিয়ে উভয়ের মধ্যে ঝগড়া হলো, উভয়ে বলছিল যে, পুত্র সন্তানটা আমি প্রসব করেছি। শেষ পর্যন্ত উভয়কে হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর কাছে নিয়ে আসা হলো। উভয়ে বলছিল যে, পুত্র সন্তানের মা হলাম আমি। হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) বললেন তোমরা উভয়ে তোমাদের স্তন থেকে সামান্য দুধ বের করে বরতনে রেখো। নির্দেশ মত

তাই করা হলো। তিনি উভয়ের দুধ ওজন করে দেখলেন যে, এক জনের দুধ ভারী। তখন তিনি বললেন, যার দুধ ভারী প্রমাণিত হয়েছে, পুত্র সন্তান তারই।

এ ফয়সালা শুনে লোকেরা জানতে চাইলেন, আপনি এ মাসআলাটা কোথা থেকে বের করলেন? তিনি বললেন, কুরআনের আয়াত لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ (অর্থাৎ একজন পুরুষের জন্য দু'জন মহিলার সম অংশ)। এ আয়াত থেকে পরিস্কার বুঝা গেল যে, আল্লাহ তাআলা পুরুষকে প্রত্যেক বিষয়ে প্রাধান্য দিয়েছেন। এমন কি খাদ্যের বেলায়ও। অতএব আমি এ বাস্তবতা সামনে রেখে চিন্তা করেছি যে পুত্র সন্তানের মায়ের দুধ নিশ্চয়ই ভারী হবে। (নজহাতুল মাজালিস- ৩৫৫ পৃঃ ২ হিঃ)

সবকঃ এ ধরণের জটিল সমস্যার সমাধান দীনি ইলমের বদৌলতেই হতে পারে এবং কুরআন বিশারদ কুরআন পাক থেকে সব সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে পারেন।

কাহিনী নং- ১৮২

কঠিন প্রশ্নাবলী

মজর নামে এক তৌরাত বিশারদ কোন এক সময় হযরত আলীকে বললো, আমি আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করতে ইচ্ছুক। হযরত আলী বললেন, ঠিক আছে, যা ইচ্ছে, জিজ্ঞেস কর। সে জিজ্ঞেস করলো; বলুন, সে কোন্ ব্যক্তি, যার মাও নেই, বাপও নেই? এবং সে কোন্ মহিলা যার বাপও নেই, মাও নেই? সে কোন্ ব্যক্তি, যার মা আছে, বাপ নেই? সেটা কোন্ পাথর, সেটা পশু প্রসব করেছে? সে কোন্ মহিলা, যে একইদিনে মাত্র তিন ঘন্টায় সন্তান প্রসব করেছে? ওরা কোন্ দু'বন্ধু, যারা কখনো পরস্পর শুত্রু হবে না? এবং ওরা কোন্ দু'শত্রু, যারা কখনো পরস্পর বন্ধু হবে না?

হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) বললেন, তাহলে শোন, সেই পুরুষ, যার মা-বাপ নেই, তিনি হলেন, আদম আলাইহিস সালাম, যে মহিলার মা-বাপ নেই, তিনি হলেন হাওয়া আলাইহিস সালাম; সেই পুরুষ যার মা আছে বাপ নেই, তিনি হলেন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম। পশু প্রসবকারী পাথর হচ্ছে সেটা, যেটা থেকে হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের উষ্ট্রী জন্ম হয়েছিল; যে মহিলা তিন ঘন্টার মধ্যে সন্তান প্রসব করেছিলেন, তিনি হলেন মরিয়ম আলাইহিস সালাম, যিনি এক ঘন্টার মধ্যে গর্ভধারণ করেন, দুই ঘন্টার মধ্যে প্রসব বেদনা বোধ করেন এবং তিন

ঘন্টার মধ্যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম হয়। যে দু'বন্ধু যারা পরস্পর কখনো শত্রু হবে না তারা হলো শরীর ও রূহ এবং যে দু'শত্রু কখনো বন্ধু হবে না, তারা হলো মৃত্যু এবং জীবন।

মজর উত্তর শুনে বললো, হে আলী, বাস্তবিকই আপনি সঠিক উত্তর দিয়েছেন। এবং আপনি বাস্তবিকই জ্ঞান শহরের দরজা। (জামেউল মুজেজাত- ২৩ পৃঃ)

সবকঃ জ্ঞান শহরের দরজা (রাদি আল্লাহু আনহু) এর জ্ঞান থেকে অনুধাবন করা যায় যিনি জ্ঞানের শহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জ্ঞানের পরিধি কত ব্যাপক।

কাহিনী নং- ১৮৩

ইহুদীর দাড়ি

এক ইহুদীর দাড়ি ছিল খুবই কম। মাত্র হাতে গনা কয়েকটি দাড়ি ছিল চিবুকের উপর। আর হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর দাড়ি মুবারক ছিল খুবই ঘন এবং ভরপুর। এক দিন সেই ইহুদী হযরত আলীকে বললো, হে আলী! আপনি যে বলেন, কুরআনের মধ্যে সবকিছু রয়েছে এবং আপনি জ্ঞান শহরের দরজা, তাহলে বলুন দেখি, কুরআনের কোন্ জায়গায় আপনার ঘন দাড়ি ও আমার পাতলা দাড়ি সম্পর্কে উল্লেখিত আছে? হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) বললেন, হ্যাঁ, উল্লেখিত আছে, শোন-

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ وَالَّذِىْ خَبُثَ لَايَخْرُجُ اِلَّانَكِدًا ·

অর্থাৎ যেটা ভাল জমীন, আল্লাহর হুকুমে ওটাতে অধিক ফলন হয় এবং যেটা খারাপ জমীন, ওটাতে ফলন হয়না, হলেও খুব কম।

হে ইহুদী! আমার চিবুকটা ভাল জমীন তূল্য এবং তোমার চিবুকটা হলো খারাপ জমীন তুল্য।

সবকঃ কুরআন মজীদে সব জ্ঞান রয়েছে কিন্তু তা উদঘাটনে সমঝদারের প্রয়োজন।

কাহিনী নং- ১৮৪

হযরত আলীর ইখলাস

কোন এক যুদ্ধে হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) এক দুশমনকে তলোয়ার

দ্বারা আঘাত করলেন, সে পিঠে আঘাত খেয়ে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করলো, ভয়ে পিছনে না দেখে দৌড়তে লাগলো কিন্তু শেরে খোদার হাত থেকে পালানো সহজ ছিলনা। দৌড়ায়ে ধরে মাটিতে ফেললেন এবং শরীর থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। হঠাৎ সেই অজ্ঞ মুশরিক হযরত আলীর চাঁদের মত চেহরায় থুথু নিক্ষেপ করলো। সঙ্গে সঙ্গে হযরত আলী হাত থেকে তলোয়ার রেখে দিলেন এবং সেই মুশরিক থেকে মুখ ফিরায়ে নিলেন এবং ওকে ছেড়ে এক কিনারে দাঁড়িয়ে বললেন, তোকে মাফ করে দিলাম, চলে যা।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে এ ধরণের ক্ষমা ছিল ব্যতিক্রম। মুশরিক লোকটি আশ্চর্য হয়ে করজোরে আরয করলো, হুযূর অনুমতি দিলে আমি একটি প্রশ্ন করতে পারি। মৃত্যু ছিল আমার অপরাধের শাস্তি কিন্তু আমাকে ক্ষমা করে দেয়ার রহস্য কি? মুচকি হেসে হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) বললেন, তোমার সাথে আমার ব্যক্তিগত কোন শত্রুতা ছিল না। তোমার সাথে শত্রতা হচ্ছে আল্লাহর জন্য। ঐ সময় যদি আমি তোমাকে হত্যা করতাম, তাহলে তখন আমার নফস বুক ফুলায়ে বলতো, থুথু নিক্ষেপ করার উচিত শাস্তি হয়েছে। এ ধারণায় যদি তোমাকে হত্যা করতাম, খোদাকে কি করে মুখ দেখাতাম। হকের ব্যাপারে আমি অটল, নফসের কথামত আমি চলি না। হযরত আলীর এ ইখলাস দেখে সেই মুশরিক মুসলমান হয়ে গেল। পরবর্তীতে ওর পুরা গৌত্র মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। (মসনবী শরীফ)

সবকঃ আদর্শের আঘাত তলোয়ারের আঘাত থেকেও মারাত্মক।

কাহিনী নং- ১৮৫

হযরত আলীর শাহাদাত

যে রকম সাহাবায়ে কিরামের প্রতি ইবনে সাবার দলের শত্রুতা ছিল, সেরকম আহলে বায়তের প্রতি খারেজী দলের শত্রুতা ছিল। উভয় দল ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য মারাত্মক ছিল। হযরত আলী মরতুজা (রাদি আল্লাহু আনহু) এর প্রতি খারেজীদের জঘন্য শত্রুতা ছিল। ইবনে মলজম নামে এক খারেজী হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু)কে শহীদ করার মনস্থ করলো এবং একটি বিশেষ তালোয়ারকে এ হীন উদ্দেশ্যে বিষ মাখিয়ে নিল এবং সুযোগের অপেক্ষায় রইল। হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর খেলাফতের হেড কোয়াটার ছিল কুফায়।

এক দিন ভোরে নামায পড়ার জন্য তিনি মসজিদে যাচ্ছিলেন, সে সময় ইবনে মলজম, যে পথের ধারে লুকিয়ে ছিল, অতর্কিত আক্রমণ করে বসে এবং তাঁর মাথায় তলোয়ারের আঘাত করে। হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) তালোয়ারের আঘাত খেয়ে فزت برب الكعبة (খোদার কসম, আমি আমার উদ্দেশ্যে পৌছে গেছি) বলে চিৎকার দিয়ে উঠলেন, এর পর মাটিতে পড়ে গেলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন যে, আমার হত্যাকারীকে ধরে আমার কাছে নিয়ে এসো। এ নির্দেশ পাওয়া মাত্র লোকেরা ইবনে মলজম খারেজীকে ধরে নিয়ে আসলেন। তিনি বললেন আমার এ মেহমানের জন্য নরম বিচানা বিছিয়ে দাও, উন্নত মানের খাবার তৈরী করে খাওয়াও এবং ওকে ঠান্ডা পানিও পান করাও।

যখম থেকে অধিক রক্ত বের হওয়ায় হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) বেশ দুর্বল হয়ে পড়লেন এবং ভীষণ পানির তৃষ্ণা অনুভব করলেন। ঘরের লোকেরা তাঁর জন্য শরবত বানায়ে আনলেন। তিনি বললেন, প্রথমে আমার হত্যাকারীকে এ শরবত পান করাও। ঘরের লোকেরা যখন এ শরবত ইবনে মলজমের কাছে নিয়ে গেলেন, তখন সেই বদবখত বললো, আমি জানি, তোমরা এতে বিষ মিশিয়েছ-এ বলে সে পান করতে অস্বীকার করলো। হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) এ কথা শুনে কাঁদলেন এবং বললেন, হে অভাগা, তুমি যদি আমার এ শরবত পান করতে তাহলে আমি কিয়ামতের দিন তোমাকে পান না করায়ে হাউজে কাউসারের পানি পান করতাম না। কিন্তু আমি কি করবো, তুমিতো আমার সাথে থাকাটা পছন্দ করলে না। এর পর তাঁর অবস্থা আরও কাহিল হয়ে গেল এবং সেই অবস্থায় তিনি বললেন, আমি ফিরিশতাগণের এক বিরাট জামাত দেখতেছি এবং তাদের সাথে নবীগণের বিরাট কাফেলা দেখ্‌তেছি এবং সবের আগে কাফেলার অধিনায়ক হিসেবে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দেখ্‌তেছি এবং আমাকে বলতেছেন- হে আলী, আনন্দিত হও। তোমাকে বড় স্বস্থি ও আরামের দিকে আহবান করা হচ্ছে। এর পর তিনি কিছু অছিয়ত করলেন। অতঃপর যৎসামান্য মেশক যেটা তাঁর কাছে তবরুক হিসেবে ছিল, বের করলেন এবং কেঁদে দিলেন। জিজ্ঞেস করা হলো, এটা কি ধরণের মেশক? বললেন, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জানাযা মুবারক থেকে এ সামান্য মেশক বাঁচানো হয়েছিল এবং সেটা তবরুক হিসেবে আজকের দিনের জন্য রেখে দিয়ে ছিলাম। যখন আমাকে গোসল দিয়ে কাফন পরাবে, তখন কাফনের উপর এ মেশক লাগিয়ে দিও। এর পর

আস্‌সালামু আলাইকুম বললেন। অতঃপর কলেমা শরীফ পাঠ করে স্বীয় জানকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করে দিলেন। (সীরাতুস সালেহীন- ১১১ পৃঃ)

সবকঃ ওসব আল্লাহ ওয়ালাগণের এটাই জীবনী যে, আল্লাহর পথে আহত হওয়ার পর কসম করে বলে, আমরা আমাদের উদ্দেশ্যে পৌছে গেছি। তাঁরা তাঁদের হত্যাকারীদের সাথে ভাল ব্যবহার করেন। তাঁদের উপর যত বড় বড় মুছিবত ও বিপদ আসুকনা কেন, তাঁরা সর্ব সময় আল্লাহর রেজামন্দিতে রাজি থাকেন। আল্লাহ ওয়ালাগণের মৃত্যু কেবল স্থানান্তর মাত্র। ওনারা একান্ত ধৈর্য সহকারে কলেমা শরীফ পাঠ করে হাকিকী মাহবুবের কাছে পৌছে যান।

কাহিনী নং- ১৮৬

নবীজির চার বন্ধু

একদিন হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম এক খাঞ্চা জান্নাতের আপেল নিয়ে এসে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে রেখে আরয করলেন, ইয়া রসূলল্লাহ! আপনি এখান থেকে ঐ ব্যক্তিকে প্রদান করুন, যিনি আপনার প্রিয়। খাঞ্চাটা একটি নূরানী আবরনী দ্বারা ঢাকা ছিল। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর হাত মুবারক ঢুকায়ে সেখান থেকে একটি আপেল বের করে দেখেন যে এর একদিকে লিখা আছে هذه هدية من الله لابى بكرن الصديق অর্থাৎ এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আবু বকর ছিদ্দিকের জন্য। এবং অন্য দিকে লিখা আছে من ابغض الصديق فهو زنديق অর্থাৎ ছিদ্দিকের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী কাফির। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আর একটি আপেল বের করলেন। এর একদিকে লিখা ছিল هذه هدية من الوهاب لعمرين الخطاب অর্থাৎ এটা ওমর বিন খাত্তাবের জন্য আল্লাহর তোহফা এবং অন্য দিকে লিখা ছিল- من ابغض عمر فهو فى سقر অর্থাৎ ওমরের দুশমনের ঠিকানা জাহান্নাম। এর পর আর একটি আপেল বের করলেন, যার একদিকে লিখা ছিল هذه هدية من الله الحنان المنان لعثمان بن عفان অর্থাৎ এটা ওসমান বিন আফ্‌ফানের জন্য আল্লাহর তোহফা এবং অন্য দিকে লিখা ছিল من ابغض عثمان فخصمه الرحمن অর্থাৎ ওস্‌মানের দুশমন আল্লাহর দুশমন। অতঃপর হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খাঞ্চা থেকে আর একটি আপেল বের করলেন, যার একদিকে লিখা ছিল هذه هدية من الله الغالب لعلى بن ابى طالب অর্থাৎ এটা আলী বিন আবি তালেবের জন্য আল্লাহুর তোহ্‌ফা। এবং অন্য দিকে লিখা

ছিল। من ابغض على ما لم يكن الله وليا অর্থাৎ আলীর দুশমন খোদার বন্ধু নয়। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উদ্ধৃতি সমূহ পড়ে আল্লাহ তাআলার অসীম প্রসংশা করেন। (নজহাতুল মাজালিস- ৩৬ পৃঃ ২ জিঃ)

সবকঃ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এ চার বন্ধু, যাদের কিছু কাহিনী আপনারা ইতি পূর্বে পড়েছেন, তাঁরা বড় মর্তবা মর্যাদার অধিকারী। এ চার বন্ধুর দুশমন আল্লাহ ও নবীর দুশমন। অতএব এ চার জনের প্রতি মহব্বত পোষণ করাটা মুসলমানগণের জন্য একান্ত প্রয়োজন এবং ওনাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ থেকে বিরত থাকাটা ওয়াজিব। অন্যথায় ঈমান হারানোর ভয় আছে।

কাহিনী নং- ১৮৭

পাক পঞ্জাতন

এক দিন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনা মনোয়ারার একটি দরজা দিয়ে এমন ভাবে বের হলেন যে তাঁর ডান পাশে হযরত আবু বকর, বাম পাশে হযরত ওমর, সামনে হযরত আলী এবং পিছে ছিলেন হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহুম)। সে সময় হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন, শোন, আমরা জান্নাতেও এভাবে প্রবেশ করবো। তাই যে কেউ আমাদের মধ্যে সামান্যতমও মতভেদ সৃষ্টি করবে, খোদার শাস্তি থেকে ওর রেহাই নেই। (নজহাতুল মাজালিস- ৩৬২ পৃঃ ২ জিঃ)

সবকঃ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চার বন্ধু এখানে যেমন সাথী ছিলেন, তেমন জান্নাতেও সাথী হবেন

কাহিনী নং ১৮৮

রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ঘোষণা।

এক দিন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) মিম্বরে আরোহণ করে প্রথমে আল্লাহ তাআলার হামদ ও ছানা পাঠ করলেন। অতঃপর আবু বকর কোথায়, বলে ডাক দিলেন। হযরত আবু বকর আওয়াজ দিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! বান্দা হাজির। ফরমালেন, আমার কাছে এসো। হযরত আবু বকর হুযুরের কাছে গেলেন। হুযুর ওনাকে বুকে জড়ায়ে ধরলেন এবং দু'চোখের মাঝখানে চুমু দিলেন। এরপর উচ্চস্বরে ফরমালেন, হে মুসলমানগণ! এ আবু বকর ছিদ্দিক

মুহাজির ও আনসারগণের মুরুব্বি ও বুজুর্গ ব্যক্তি এবং আমার সত্যিকার বন্ধু ও দরদী। যে সময় লোকেরা আমাকে অস্বীকার করেছে, সে সময় তিনি আমাকে স্বীকার করেছেন এবং জানমাল দিয়ে আমার সহায়তা করেছেন। আমার খাতিরে বেলালকে খরিদ করে আযাদ করে দিয়েছেন। তোমরা শুনে রেখো, ওনার দুশমনের উপর খোদার অভিশাপ। এ রকম লোকের প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট এবং আমিও অসন্তুষ্ট। তোমাদের উচিত আমার এ ঘোষণা সবাইকে শুনায়ে দেয়া।

এরপর হযরত ওমরকে ডাক দিলেন, ওমর কোথায়? হযরত ওমর আওয়াজ দিলেন; আমি হাজির। ফরমালেন, আমার কাছে এসো। তিনি হুযুরের কাছে গেলেন। হুযূর ওনাকেও বুকে জড়ায়ে ধরলেন এবং কপালে চুমু দিলেন। অতঃপর উচ্চস্বরে ফরমালেন, হে মুসলমানগণ! এ ওমর বিন খাত্তাবও মুহাজির ও আনসারগণের মুরুব্বি ও বুজুর্গ ব্যাক্তি। এ সেই ব্যক্তি যার অন্তর ও মুখে আল্লাহ তাআলা হক কথা বলার শক্তি দিয়েছেন। তিনি হক কথা বলতে দ্বিধাবোধ করেন না। শুনে রেখো, যে এর দুশমন, আল্লাহ ও রসূল ওর প্রতি অসন্তুষ্ট, ওর প্রতি খোদার অভিশাপ।

এর পর ডাক দিলেন, ওসমান কোথায়? হযরত ওসমান আওয়াজ দিলেন, আমি হাজির। ফরমালেন, আমার কাছে এসো। হযরত ওসমান কাছে গেলেন। হুযূর ওনাকে বুকে জড়ায়ে ধরলেন এবং কপালে চুমু দিয়ে উচ্চস্বরে বললেন, এ ওসমানও মুহাজির ও আনসারগণের মুরুব্বী ও বুজুর্গ ব্যক্তি। এ সেই ব্যক্তি, যার প্রতি আসমানের ফিরিশতাগণও লজ্জাবোধ করে। এ সে ব্যক্তি, যার কাছে একে একে আমার দু'কন্যা বিবাহ দিয়েছি। তাই জেনে রেখো, ওনার দুশমনের উপরও খোদার লানত।

এরপর হযরত আলীর ডাক পড়লো, আলী কোথায়? হযরত আলী আওয়াজ দিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি উপস্থিত আছি। ফরমালেন, আমার কাছে এসো। হযরত আলী হুযুরের কাছে গেলেন। হুযূর ওনাকেও বুকে জড়ায়ে ধরলেন এবং কপালে চুমু দিলেন। অতপর উচ্চস্বরে বললেন, হে মুসলমানগণ! এ হচ্ছে আলী বিন আবিতালিব। এও মুহাজির ও আনসারগণের শেখ ও বুজুর্গ। এ আমার চাচাতো ভাই এবং আমার জামাতা। এর সাথে আমার রক্ত-মাংসের সম্পর্ক। এ আল্লাহর দুশমনদের জন্য তলোয়ার এবং শেরে খোদা হিসেবে খ্যাত। শুনে রেখো, ওনার দুশমনের উপর খোদার লানত। ওনার দুশমনের প্রতি আমি অসন্তুষ্ট এবং আল্লাহও

অসন্তুষ্ট। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসূলের অসন্তুষ্টি কামনা করে, সে যেন আলীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। (নজহাতুল মাজালিস ৩৬৫ পৃঃ ২ জিঃ)

সবকঃ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) প্রকাশ্যে তাঁর চার বন্ধুর মর্যাদার কথা ঘোষণা করেছেন এবং মুসলমানগণকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, ওনাদের প্রতি মহব্বত পোষণ করা একান্ত প্রয়োজন। আর ওনাদের প্রতি শত্রুতা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলে লানতের ভাগী হতে হবে। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর এ চার বন্ধুর প্রতি মহব্বত রাখা।

কাহিনী নং ১৮৯

দ্বীপের অধিবাসী এক জ্বিন

হযরত ইমাম শাফেঈ (রাদি আল্লাহু আনহু) মক্কা মুকাররমায় এমন এক ব্যক্তিকে দেখলেন, যে আগে খৃষ্টান ছিল এবং এখন মুসলমান হয়ে গেছে। ইমাম শাফেঈ ওকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মুসলমান হওয়ার কারণ কি? সে বললো, আমি এক সামুদ্রিক সফরে ছিলাম। দৈবক্রমে আমাদের জাহাজ ভেঙ্গে যাওয়ায় সমুদ্রের ঢেউ আমাকে এমন জনমানবহীন দ্বীপে নিয়ে পোঁছায়, সেখানে ছিল ফলন্ত বৃক্ষ এবং স্বচ্ছ ও পরিস্কার পানির নদী-নালা প্রবাহিত। আমি সে দ্বীপে সারা দিন ঘুরে ফিরে আতিবাহিত করলাম। রাত যখন হলো, তখন দেখি, এক চতুস্পদ জন্তু, যার মাথা উট পাখির মত, চেহারা মানুষের মত, হাত পা উটের মত এবং লেজ মাছের মত, আমার সামনে এসে উচ্চ স্বরে বলতে লাগলো, আল্লাহ ব্যতীত কেউ উপাস্যের উপযোগী নয়। মুহাম্মদ তাঁর রসূল, আবু বকর গুহার সাথী, ওমর বিশ্ব জয়ী, ওসমান শহীদ এবং আলী কাফিরদের জন্য খোদার তলোয়ার। ওনাদের দুশমনদের প্রতি খোদার লানত। আমি এ দৃশ্য দেখে ভয়ে পালিয়ে যেতে চাইলাম। কিন্তু আমাকে বললো, দাঁড়াও, এক কদমও আগে বাড়িয়েও না। অন্যথায় এক্ষনি ধ্বংস হয়ে যাবে। পুনরায় আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো তোমার ধর্ম কি? আমি বললাম, খৃষ্ট ধর্ম। সে খুবই শান্তভাবে বললো, তুমি মুসলমান হয়ে যাও। সমস্ত বিপদ আপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। তখন আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। সে আবার আমাকে বললো, ভাল করে স্মরণ রেখ, তোমার ইসলাম গ্রহণ আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলীর প্রতি মহব্বতের দ্বারা পূর্ণতা লাভ করবে।আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম যে, এ সব কথা তুমি কি করে জানলে? বললো, আমি হচ্ছি জ্বীন,

আমাদের জ্বীনদের একটি জামাত হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাথে দেখা করে তাঁর উপর ঈমান এনেছে। এসব কথা তারা স্বয়ং হুযুরের মুখে শুনেছে। (নজহাতুল মাজালিস ৩৬৭ পৃঃ ২ জিঃ)

সবকঃ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর চার বন্ধুর প্রতি মহব্বত পোষণ ঈমানের অংগ। প্রত্যেক ঈমানদার মানুষ ও জ্বীনের অন্তরে তাঁদের প্রতি মহব্বত থাকাটা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

কাহিনী নং ১৯০

ছিদ্দিকে আকবর ও ফারুকে আযমের দুশমন

একদিন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সাহাবায়ে কিরাম সমেত মসজিদে নববীতে তশরীফ রেখে ছিলেন। এমন সময় এক মুনাফেক আসলো, যার পায়ের গোছা থেকে রক্ত বের হচ্ছিল। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ওকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হয়েছে? সে বললো, অমুক মহল্লার অমুক গলি দিয়ে যাবার সময় একটি মাদী কুকুর কামড় দিয়েছে। কিছুক্ষণ পর আর এক মুনাফেক আসলো। ওর পায়ের গোছা থেকেও রক্ত বের হচ্ছিল। সেও বললো যে, সেই মাদী কুকুরটি তাকেও কামড় দিয়েছে। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সাহাবায়ে কিরামকে ফরমালেন, চলো, সেই কুকুরকে দেখে আসি। সম্ভবতঃ সেটা পাগল হয়ে গেছে।

অতঃপর হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সাহাবায়ে কিরাম সহ ওখানে গেলেন। সেই কুকুরটি হুযূরকে দেখা মাত্র তাঁর পায়ের সামনে গড়াগড়ি দিতে লাগলো। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) যখন কুকুরটাকে জিজ্ঞেস করলেন, এদেরকে কেন কামড় দিয়েছ? তখন কুকুরটা বিশুদ্ধ ভাষায় বললো, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এরা দু'জন মুনাফেক, এরা আপনার গুহার বন্ধু ছিদ্দিকে আকবর ও ফারুকে আযমকে গালি দিচ্ছিল। এতে আমার রাগ এসে যায়। তাই কামড় দিয়েছি। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ওদেরকে জিজ্ঞেস করলে ওরা স্বীকার করে এবং তওবা করে। (জামেউল মুজেজাত-১৯ পৃঃ)

সবকঃ ছিদ্দিকে আকবর ও ফারুকে আযমকে যারা গালি দেয়, তাদের থেকে পশুও উত্তম। সাহাবায়ে কিরামকে গালি-গালাজকারীদের প্রতি কুকুরও বিদ্বেষ

পোষণ করে। যারা সাহাবায়ে কেরামের দুশমনদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে, তারা কুকুর থেকেও অধম।

কাহিনী নং ১৯১

এক বিধর্মী কুম্ভকার

হযরত ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর বাড়ীর পাশ্বে এক বিধর্মী কুম্ভ-কার থাকতো। সে তার এক গাধার নাম আবু বকর আর এক গাধার নাম ওমর রেখে স্বীয় মনের বিদ্বেষ ভাবটা প্রকাশ করেছিল। এক দিন ঐ দু'গাধার এক গাধা ওকে এমন লাথি মারলো যে সেই মলাউন ওখানেই মৃত্যুবরণ করলো। এ খবরটি যখন ইমাম আযমের কাছে পৌঁছলো, তখন তিনি বললেন, গিয়ে দেখতো কোন্ গাধাটি লাথি মেরেছে? সম্ভবতঃ যে গাধাটির নাম ওমর রেখেছিল, সেটার লাথিতে সে মারা গেছে। খোজ খবর নিয়ে জানা গেল যে, ঠিকই সেই গাধার লাথিতে মারা গিয়েছিল, যে গাধার নাম সে ওমর রেখেছিল। (রুহুল বায়ান ৮৫৭ পৃঃ ১ জিঃ)

সবকঃ ছিদ্দিকে আকবর ও ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর প্রতি বেআদবী ও দুশমনী খুবই মারাত্মক। হযরত ওমর ফারুক কাফিরদের প্রতি যে খুবই কঠোর ছিলেন, সে কঠোরতার প্রভাব তাঁর নামের মধ্যেও রয়েছে।

কাহিনী নং ১৯২

মারাত্মক হিংস্র জন্তু

হযরত জাফর খুদরী (রাদি আল্লাহু আনহু) বলেন, আমি একবার এমন এক কাফেলার সাথে সফর করছিলাম যে, কাফেলার সব লোক সাহাবায়ে কিরামের দুশমন ছিল। ওরা সবাই আমার সাথে ছিদ্দিকে আকবর ও ফারুকে আযম সম্পর্কে তর্ক বিতর্ক করে পথ অতিক্রম করছিল। আমি যতদূর সম্ভব ওদের প্রত্যেকটি আপত্তির জবাব দিচ্ছিলাম। এভাবে পথ চলতে চলতে এক জংগলে এসে উপনিত হলাম। হঠাৎ দেখি একটি মারাত্মক হিংস্র জন্তু জংগল থেকে বের হয়ে সোজা আমার দিকেই আসলো এবং আমাকে কামড়িয়ে ধরে উঠায়ে নিল। এটা দেখে কাফেলার সবাই খুবই খুশী হলো কিন্তু আমি খুবই দুঃখিত হলাম এ জন্য যে, ওরা আমার সম্পর্কে বলা বলি করবে যে, শেখাইন (ছিদ্দিকে আকবর ও ওমর ফারুক

(রাদি আল্লাহু আনহু) এর প্রতি মহব্বতের মজা বের হলো।

হিংস্র জন্তুটি আমাকে নিয়ে সেটার ক্ষুধার্ত বাচ্চাদের সামনে নিয়ে রাখলো যেন বাচ্চাগুলো আমাকে খায়। সেই সময় আমার মুখ থেকে অপ্রত্যাশিত ভাবে উচ্চারিত হলো اَغِثْنِىْ يَا رَسُوْلَ اللهِ بِحُرْمَةِ الشَّيْخَيْنِ (ইয়া রাসুলাল্লাহ! শেখাইনের ওসীলায় আমাকে সাহায্য করুন) সেই হিংস্র প্রাণীর বাচ্চাগুলো একে একে আমার কাছে এসে আমাকে শুঁকে সব পিছে হটে গেল। এটা দেখে সেই হিংস্র জন্তুটি ভয়ার্ত আওয়াজে গর্জন করে উঠলো। মনে হলো এটাই বলছিল, কেন খাচ্ছ না? পিছে কেন হটে যাচ্ছ? বাচ্চাগুলো সমস্বরে বিশুদ্ধ ভাষায় জবাব দিলঃ

لَقَدْ جَوَّعْتَنَا ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ثُمَّ جِئْتَنَا بِمَنْ يُحِبُّ اَصْحَابَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ অর্থাৎ তুমি আমাদেরকে তিনদিন উপবাস রেখেছ এবং আজ তুমি সেই ব্যক্তিকে নিয়ে এসেছ, যে নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবীগণের প্রতি মহব্বত রাখে। (তাই আমরা ওকে কি করে খেতে পারি?) আমি নিজে ওদের উত্তর শুনেছি এবং আনন্দিত হয়ে ওখান থেকে চলে এসেছি। খোদার কসম! ওগুলো আমাকে কোন কষ্ট দেয়নি। (জামেউল মুজেজাত ১২০ পৃঃ)

সবকঃ নবীর বন্ধুগণের প্রতি মহব্বত জংগলের হিংস্র প্রাণীদের মধ্যেও রয়েছে। এ মহব্বতের কারণে হযরত জাফরের জান রক্ষা পেল। এভাবে এ মহব্বত দ্বারা ঈমানও রক্ষা পাবে। মুসলমানগণ মুসীবতের সময় হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে স্মরণ করেন এবং ইয়া রাসুলাল্লাহ বলে হুযুরের সাহায্য কামনা করেন।

পঞ্চম অধ্যায়

সাহাবায়ে কিরাম (রাদি আল্লাহু আনহুম)

কাহিনী নং ১৯৩

মাহবুবের কদমে

উহুদ যুদ্ধে হযরত আম্মার বিন যিয়াদ (রাদি আল্লাহু আনহু) এর বুকে এক কাফিরের তীর এসে লাগলো এবং তিনি ঘুরে পড়ে গেলেন। তখন তিনি বুকের উপর হাত রেখে আল্লাহর কাছে আরয করলেন, হে আল্লাহ! আমাকে আমার মাহবুব (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে দেখার সুযোগ দিন। মাহবুবকে দেখার আগে যেন আমার মৃত্যু না হয়। তিনি মাটিতে পতিত অবস্থায় চারিদিকে তাঁর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হুযূরকে তালাশ করতে লাগলেন। তিনি দেখলেন যে, অনতি দূরে হুযূর তশরীফ রেখেছেন। তখন তাঁর শরীরটাকে মাটিতে হেঁচড়ায়ে আস্তে আস্তে কোন মতে হুযুরের কাছে পৌঁছে গেলেন এবং স্বীয় মুখ হুযুরের পায়ের উপর ঘষতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন فُزْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ فُزْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ। কাবার মালিকের কসম, আমি আমার উদ্দেশ্যে পৌঁছে গেছি, কাবার মালিকের কসম, আমি আমার উদ্দেশ্যে পৌঁছে গেছি।

এর পর তিনি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর কদম মুবারকের উপরই শাহাদত বরণ করেন। (তারিখুল ইসলাম ১৭২ পৃঃ)

সবকঃ সাহাবায়ে কিরামের সবচে বড় কাম্য ছিল যে, মাহবুবে কিবরীয়া আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পদতলে প্রাণ ত্যাগ করা।

কাহিনী নং ১৯৪

জান্নাতের সুগন্ধ

উহুদের যুদ্ধে মুসলমানগণ নিজেদের ভুলের কারণে সাময়িক ভাবে পরাজিত হয়েছিল এবং দু'দিক থেকে কাফিরদের মাঝখানে পড়ে গিয়েছিল যার কারণে হতবম্ভ হয়ে এদিক সেদিক ছুটা ছুটি করতে ছিলেন। হযরত আনস বিন নছর (রাদি

আল্লাহু আনহু) দেখলেন যে, তাঁর সামনে দিয়ে হযরত সাদ বিন মায়ায (রাদি আল্লাহু আনহু) আসতেছেন। তিনি ওনাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে সাদ কোথায় যাচ্ছ? হযরত সাদ বললেন, খোদার কসম! উহুদ পাহাড় থেকে জান্নাতের সুগন্ধ আসতেছে-এ বলে তলোয়ার হাতে কাফিরদের মধ্যে ঢুকে গেলেন এবাং ওদের সাথে মুকাবেলারত অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেন। শাহাদাতের পর দেখা গেল যে তাঁর শরীর ঝাঝরা হয়ে গিয়েছিল আশির অধিক তীর ও তলোয়ারের আঘাত ছিল। (হেকায়াতুস সাহাবা)।

সবকঃ যে ব্যক্তি আন্তরিক ভাবে ইখলাসের সাথে আল্লাহর কাজে নিয়োজিত হয় সে দুনিয়াতেই জান্নাতের স্বাদ ও সুগন্ধ পেয়ে থাকে।

কাহিনী নং ১৯৫

এক মহিলা

আনচারে মদীনার এক মহিলার পিতা, স্বামী ও ভাই তিনজনই উহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছিলেন, সেই মহিলা যুদ্ধের অবস্থা জানার জন্য যখন উহুদের ময়দানে পৌছলেন, তখন তাকে জানানো হল যে, তাঁর পিতা, স্বামী ও ভাই তিনজনই শহীদ হয়ে গেছেন। তিনি এ খবর শুনে বললেন, আমাদের নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কেমন আছেন, আগে সেটা বলুন। লোকেরা বললো, তিনি সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। এ খবর শুনে তিনি খুশি হয়ে হুযুরের বারগাহে হাজির হলেন এবং হুযূরকে দেখে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার বাপ, স্বামী ও ভাই আপনার নামে কুরবান হয়ে গেছে। আপনাকে সহীহ সালামত দেখে আমার মনে ওদের বিরহের কোন দুঃখ নেই। (তারিখুল ইসলাম ১২ পৃঃ)

সবকঃ সাহাবায়ে কিরামের অন্তরে হুযুরের প্রতি সীমাহীন মহব্বত ছিল। এসব পবিত্র লোকের স্ত্রীগণও হুযূরের মহব্বতের সামনে অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের প্রেম-প্রীতিকে হীন মনে করতেন। আজ যারা রসুলের মহব্বতকে অবজ্ঞা করে আত্মীয় স্বজনকে প্রধান্য দেয় এবং শরীয়তের তোয়াক্কা করেনা, তারা বড় বদনসীব ও অপরিনামদর্শী।

কাহিনী নং ১৯৬

মৌমাছি

আদল ও কারার কয়েক জন মুনাফেক হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললো, আমাদের সাথে যাবার জন্য কয়েকজন ধর্ম প্রচারক দিন, যারা আমাদেরকে দ্বীনের কথা, শরীয়তের আহকাম শিখাবেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হযরত আসেম বিন ছাবেত (রাদি আল্লাহু আনহু) এর নেতৃত্বে দশ জন সাহাবী ওদের সাথে দিলেন। তারা যখন রজিহ নামক জায়গায় পৌছলেন, মুনাফেকরা বিশ্বাসঘাতকতা করে বনু লাহয়ান গোত্রের দু'শ লোককে সাথে নিয়ে সাহাবায়ে কিরামের উপর আক্রমণ করে বসে। হযরত আসেম (রাদি আল্লাহু আনহু) তাঁর সাতজন সঙ্গী সহ শহীদ হয়ে যান। হযরত আসেম শাহাদতের আগে এ দুআটি পাঠ করেছিলেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ حَمَيْتُ دِيْنَكَ صَدْرَ النَّهَارِ فَاحْمِ لَحْمِىْ

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার দ্বীনের সহায়তায় জান দিলাম। এখন তুমি এসব কাফিরদের হাত থেকে আমার শরীরকে রক্ষা কর। অর্থাৎ আমার লাশে যেন ওদের হাত না লাগে।

মুনাফেকরা যখন হযরত আসেমের মাথা কর্তন করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসলো তখন আল্লাহ তালালা নিমিশেই একদল মৌমাছি পাঠিয়ে দিলেন, যেগুলি হযরত আসেম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর লাশ মোবারকের উপর বসে আবরণ সৃষ্টি করলো। যখন রাত হলো তখন আল্লাহ তাআলার হুকুমে এমন এক বন্যা হলো, সেটা হযরত আসমের লাশকে ভাসায়ে নিয়ে গেল এবং কাফিরেরা কোন হদিস পেল না।(তারিখে ইসলাম ১৮১ পৃঃ হুজ্জাতুল্লাহে আসাল আলেমীন ৮৬৯ পৃঃ)

সবকঃ সাহাবায়ে কিরাম (রাদি আল্লাহু আনহুম) এর জীবন মরণ দ্বীনের জন্য উৎসর্গিত ছিল। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর প্রিয়জনদের সাথে দুশমনী মুনাফেকদের কাজ।

কাহিনী নং ১৯৭

ফাঁসী

আদল ও কারার কয়েক জন মুনাফেক হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)

এর খেদমতে হাজির হয়ে দশ জন সাহাবীকে এশায়াতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে ওদের সাথে নিয়ে গিয়েছিল এবাং মাঝ পথে রাজিহ নামক স্থানে ওনাদের আট জনকে ধোকাবাজি করে শহীদ করে দেয় এবং দু'জনকে যাদের নাম হযরত হাবীব ও হযরত যায়েদ (রাদি আল্লাহু আনহুমা), বন্দী করে মক্কায় নিয়ে আসে এবং কুরাইশদের কাছে বিক্রি করে দেয়। হযরত হাবীব (রাদি আল্লাহু আনহু) উহুদের যুদ্ধে হারেস বিন আমেরকে কতল করে ছিলেন। এ জন্য ওনাকে হারেসের ছেলেরা ক্রয় করেছিল, যাতে বাপের বদলায় ওনাকে হত্যা করতে পারে। ওনাকে ঘরের মধ্যে কয়েক দিন উপবাস অবস্থায় বন্দী করে রাখে। একদিন হারেসের ছোট ছেলেটি ধারালো ছুরি হাতে খেলতে খেলতে হাবীব (রাদি আল্লাহু আনহু) এর কাছে এসে যায়। তিনি ওকে কোলে তুলে নিলেন, ছুরিটা ওর হাত থেকে নিয়ে পাশে রেখে দিলেন এবং ছেলেটাকে সোহাগ করতে লাগলেন। ছেলের মা যখন দেখলো যে তার ছেলে ছুরি সহ কয়েদীর কাছে, যাকে তারা কয়েক দিন থেকে দানা পানি ব্যতীত বন্দী করে রেখেছে, তখন সে ভয়ে কেঁপে উঠলো এবং চিৎকার দিয়ে উঠলো। হযরত হাবীব ওকে বললেন তুমি কি মনে করেছ যে আমি ওকে হত্যা করব? তুমি কি জান না মুসলমানেরা ক্ষমাশীল?

হারেসের বংশের লোকেরা কয়েক দিন পর হাবীব ও যায়েদ (রাদি আল্লাহু আনহুমা) কে হেরমের বাইরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ফাঁসীর কাঠগড়ার নীচে দাঁড় করায়ে বললো, ইসলাম ত্যাগ করলে প্রাণে বেঁচে যেতে পার। উভয়ে উত্তরে বললেন, ইসলাম না থাক্‌লে জান বাঁচায়ে রেখে কি করবো? কুরাইশরা জিজ্ঞেস করলো, কোন আরজু থাকলে বলতে পার। হযরত হাবীব (রাদি আল্লাহু আনহু) দু'রাকাত নামায পড়ার অবকাশ চাইলেন। কাফিররা নামায পড়ার সুযোগ দিল। তিনি নামায আদায় করলেন, আরো অধিক্ষণ নামায পড়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কাফিরেরা মৃত্যু ভয়ে নামাযে দেরী করতেছে মনে করবে বলে তাড়া তাড়ি নামায পড়ে নিলেন। অতঃপর হত্যাকারীরা তাঁকে শহীদ করে দিল। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি নিম্নের শেরটি পাঠ করেছিলেন ঃ

ولست ابالي حين اقتل مسلما - على اي شق كان في الله مصرعى

অর্থাৎ ইসলামে থাকা অবস্থায় আমাকে যে ভাবেই মারা হোক না কেন, কোন চিন্তা নেই।

হযরত হাবীবের পর হযরত যায়েদের পালা আসলো। ওনাকে শহীদ করার সময় কুরাইশের বড় বড় সরদারেরা সামনে এসেছিল। একজন কুরাইশ সরদার সামনে এসে বললো, আচ্ছা, এ সময় যদি তোমাদের মুহাম্মদকে তোমার পরিবর্তে হত্যা করা হয় এবং তুমি বেঁচে গেলে, তাহলে কি এর জন্য তুমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবে না? হযরত যায়েদ উত্তরে বললেন, মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর জন্য এ মাথা কাটা গেলে কোন চিন্তা নাই। কিন্তু মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পা মুবারকে একটি মামুলি কাঁটা বিদ্ধ হওয়াও আমাদের জন্য অসহ্যনীয়। এর পর ওনাকেও শহীদ করে দিল। (তারিখে ইসলাম ১৮২ পৃঃ)

সবকঃ সাহাবায়ে কিরামের কাছে ইসলাম নিজেদের জান থেকেও প্রিয় ছিল। ওনারা নিজেদের জান ইসলামের জন্য কুরবান করে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, মুসলমানগণ কঠিন থেকে কঠিন সময়েও যেন ইসলাম থেকে মুখ না ফিরায়।

কাহিনী নং ১৯৮

হযরত কা'ব (রাদি আল্লাহু আনহু) এর করুণ কহিনী

হযরত কা'ব বিন মালেক, হযরত বেলাল বিন উমাইয়া ও মরারা বিন রবীহ (রাদি আল্লাহু আনহু)-এ তিন সাহাবী কোন গুরুত্ব পূর্ণ অজুহাতে নয়, কেবল অবহেলার কারণে তাবুক যুদ্ধে শরীক হতে পারেন নি। হযরত কা'ব (রাদি আল্লাহু আনহু) তাঁর এ অবহেলার পরিণতির করুন কাহিনী নিজেই বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি তাবুকের যুদ্ধের আগে অন্য কোন যুদ্ধের সময় এতটুকু মালদার ছিলাম না, যতটুকু তাবুক যুদ্ধের সময় ছিলাম। সেই সময় আমার কাছে দু'টি নিজস্ব উষ্ট্রী ছিল। এর আগে কোন সময় আমার কাছে দু'টি উষ্ট্রী ছিল না। তাবুকের যুদ্ধের সময় যেহেতু সফর দূরের ছিল এবং গরমও অত্যাধিক ছিল, সেহেতু হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আগে ভাগে ঘোষণা দিয়া দিলেন যেন লোকেরা প্রস্তুতি নিতে পারে। অল্প সময়ের মধ্যে মুসলমানদের বিরাট বাহিনী হুযুরের সাথে যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। এত লোকের নাম রেজিষ্টার-ভুক্ত করাটা দুস্কর ছিল। অধিক লোকের কারণে কেউ যদি না গিয়ে রয়ে যেত তাহলে জানাজানি হওয়ার উপায় ছিল না। আমিও সফরের জন্য সকাল থেকেই প্রস্তুতির মনস্থ করতাম কিন্তু এভাবে সন্ধ্যা হয়ে যেত অথচ প্রস্তুতির কিছুই হতো

না। তবে আমার মনে এ ধারণা ছিল যে, আমার আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভাল। তাই যখনই দৃঢ় মনস্থ করবো, সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুতি নেয়া যাবে। এভাবে কয়েক দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। এর মধ্যে মুসলমানদের বিরাট বাহিনী নিয়ে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) রওয়ানা হয়ে গেলেন। কিন্তু তখনও আমার সফর সামগ্রী সংগৃহীত হলো না। এরপরও আমার এ ধারণা ছিল যে, দু'এক দিনের মধ্যে প্রস্তুতি নিয়ে ওখানে গিয়ে ওনাদের সাথে মিলিত হবো। কিন্তু কিছুই হলো না। আজ না কাল, এভাবে সময় চলে গেল। চেষ্টা করার পরও সফর সামগ্রী যোগার হলো না। কি আর করা, যুদ্ধে না গিয়ে ঘরে রয়ে গেলাম। তখন মদীনা মনোয়ারার এদিক সেদিক কেবল ওধরনের লোকদের সাক্ষাত পেলাম, যারা মুনাফেক হিসেবে চিহ্নিত ছিল বা বিকলাঙ্গ ছিল।

এদিকে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাবুক পৌঁছে জিজ্ঞেস করলেন, কা'বকে দেখা যাচ্ছে না, কারণ কি? একজন বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! ওকে ধন সম্পদের গরিমা বাঁধা দিয়েছে। হযরত মায়ায এর প্রতিবাদ করে বললেন, এটা ভুল ধারনা। আমি যতটুকু জানি কা'ব ভাল লোক। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) নীরব রইলেন, কিছু বললেন না। কয়েক দিনের মধ্যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফিরে আসছেন-এ খবর যখন শুনলাম, তখন মানসিক যাতনায় অস্থির হয়ে পড়লাম এবং নানা চিন্তা করতে লাগলাম্। মনের মধ্যে নানা মিথ্যা অজুহাত উঁকি মারছিল। একবার মনে করছিলাম যে মিথ্যা অজুহাত পেশ করে হুযুরের অসন্তুষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করবো এবং পরে কোন এক সময় মাফ চেয়ে নিব। এ ব্যাপারে আমি পরিবারের প্রত্যেক বিজ্ঞজনের সাথে মত বিনিময় করতে লাগলাম। কিন্তু যখন জানতে পারলাম যে হুযূর ফিরে এসেছেন, তখন আমার মন বললো যে সত্য ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা নাজাত পাওয়া যাবে না। তাই যা সত্য তা বলার জন্য আমি মনে মনে স্থির করে নিলাম।

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নিয়ম ছিল যে, যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন তখন প্রথমে মসজিদে তশরিফ নিয়ে যেতেন এবং দু'রাকাত তাহায়্যাতুল মসজিদ নামায পড়ে ওখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করতেন, যাতে লোকজনের সাথে সাক্ষাতকার দিতে পারেন। সেই নিয়ম অনুসারে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফিরে এসে মসজিদে গিয়ে অবস্থান নিলেন। মুনাফেকরা এসে কসম করে মিথ্যা অজুহাত পেশ করতে লাগলেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়া সাল্লাম) ওদের বাহ্যিক অজুহাতটা গ্রহণ করছিলেন এবং অভ্যন্তরীন ব্যাপারে কিছু বলছিলেন না। সে সময় আমিও উপস্থিত হলাম এবং সালাম পেশ করলাম। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) অসন্তুষ্টির মনোভাব প্রকাশ করলেন এবং আমাকে কিছু বলা থেকে বিরত রইলেন। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি আমাকে দেখে কেন বিরক্ত বোধ করছেন? খোদার কসম, আমি মুনাফেক নই এবং ঈমানের ব্যাপারে কোন দ্বিধাবোধ নেই। ইরশাদ ফরমালেন, কাছে এসো, আমি কাছে গিয়ে বসলাম। হুযূর ফরমালেন, কোন্ জিনিসটা তোমাকে যুদ্ধে যাওয়া থেকে বাঁধা দিয়েছে? আমি যদি এ মুহূর্তে কোন দুনিয়াদার ব্যক্তির কাঠগড়ায় হতাম, তাহলে আমি নিশ্চিত যে কোন একটা অজুহাত পেশ করে রেহায় পেয়ে যেতাম। কারণ আল্লাহ আমাকে সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলার শক্তি দান করেছেন। কিন্তু ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনার ব্যাপারে আমি জ্ঞাত যে, আপনার সামনে মিথ্যা বলা যায় না। ইয়া রাসুলাল্লাহ! নিশ্চয় আপনার রাগ হচ্ছে। তবে আশা করি শীঘ্রই আল্লাহ তাআলা আপনার এ রাগ প্রশমিত করবেন। হুযূর, আমি সত্যিই বলছি, আল্লাহর কসম আমার কোন অজুহাত ছিল না। এ সময় আমি যে রকম স্বচ্ছল ছিলাম, এর আগে কোন সময় এ রকম ছিলাম না। হুযূর ফরমালেন তুমি সত্য বলেছ, ঠিক আছে, তুমি এখন চলে যাও। তোমার ফয়সালা আল্লাহ তাআলা নিজে করবেন। আমি যখন ওখান থেকে উঠে চলে আসলাম, তখন আমার গোত্রের অনেকেই আমাকে দোষারোপ করে বললো, তুমিতো এর আগে অন্য কোন অপরাধ করোনি। তুমি যদি কোন অজুহাত পেশ করে হুযুরের কাছে ক্ষমা চাইতে তাহলে হুযূরের ক্ষমা তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল। আমি ওদেরকে জিজ্ঞেস করলাম আমার মত কি আর কেউ আছে, যার সাথে এ রকম অচরণ করা হয়েছে? ওরা বললো, হ্যাঁ আরো দু'জনের সাথে এ রকম আচরণ করা হয়েছে। ওরাও তোমার মত কথা বলেছে এবং একই রকম জবাব পেয়েছে। এরা হলো, বেলাল বিন উমাইয়া ও মরারা বিন রবীহ। ওনারা দু'জন বদরী ছিলেন অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। আজ তারাও আমার মত একই অবস্থার সম্মুখীন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আমাদের তিন জনের সাথে কথা বলার নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন যেন কেউ আমাদের সাথে কথা না বলে।

এ নিষেধাজ্ঞা সাহাবায়ে কিরাম এমন ভাবে পালন করে দেখালেন যে সবাই আমাদের সাথে কথাবার্তা বন্ধ করে দিলেন, আমাদেরকে এড়িয়ে চলতে লাগলেন।

পৃথিবীটা যেন পাল্টে গেল। পৃথিবীটা এত বিশাল হওয়া সত্বেও আমার কাছে খুবই সংকীর্ণ মনে হতে লাগলো। সব লোক অপরিচিতের মত হয়ে গেল এবং আপনজন পর হয়ে গেল।

আমার কাছে সবচেয়ে বেশী চিন্তার বিষয় ছিল যে, আমি এ অবস্থায় মারা গেলে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আমার জানাযার নামায পড়াবেন না আর খোদা না করুক হুযুর বেচাল ফরমালে আমি চিরদিনের জন্য এ রকম রয়ে যাবো এবং কেউ আমার সাথে কথা বলবে না, কেউ আমার জানাযার নামায পড়বে না। কারণ হুযুরের নিষেধাজ্ঞা কে অমান্য করতে পারে? যা হোক আমারা তিনজন পঞ্চাশ দিন এ অবস্থায় অতিবাহিত করলাম। আমার সাথীদ্বয় প্রথম থেকে ঘরের মধ্যে গৃহবন্দীর মত হয়ে রইলেন। আমি ওনাদের থেকে সবল ছিলাম বিধায় এদিক সেদিক যাতায়ত করতাম, বাজারে যেতাম, নামাযে শরীক হতাম। তবে আমার সাথে কেউ কথা বলতেন না। হুযুরের মজলিসে হাজির হয়ে সালাম করতাম এবং মনোযোগ সহকারে দেখতাম, হুযুরের ঠোঁট মুবারক সালামের জবাবে নড়তেছে কিনা। ফরজ নামাজের পর অন্যান্য নামাযগুলো হুযুরের পাশে দাঁড়িয়ে আদায় করতাম এবং চোখের কোনায় দেখতাম যে হুযুর আমার দিকে তাকাচ্ছেন কিনা। যখন আমি নামাযে নিয়োজিত হতাম, তখন হুযুর আমাকে দেখতেন কিন্তু আমি যখন হুযুরের দিকে তাকাতাম, তখন হুযূর মুখ ফিরায়ে নিতেন এবং আমার প্রতি অনীহা প্রকাশ করতেন।

এ অবস্থা চলতে রইলো এবং আমার সাথে মুসলমানগণ কথাবার্তা বন্ধ করে দেয়াটা খুবই অসহ্য হলো। তাই একদিন আমার চাচাতো ভাই আবু কাতাদার দেয়ালে উঠে মুসলমানদেরকে সালাম করলাম, কিন্তু ওনারা আমার সালামের জবাব দিল না। আমি তাদেরকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম যে রসূলের প্রতি আমার মহব্বত আছে কিনা? ওনারা কোন জবাব দিলেন না। আমি পুনরায় কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম কিন্তু ওনারা নিশ্চুপ রইলেন। আমি যখন তৃতীয়বার কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তখন শুধু এতটুকু বললেন "আল্লাহ ও তাঁর রাসুল জানেন।" একথা শুনে আমার চোখে পানি এসে গেল এবং ওখান থেকে ফিরে আসলাম। সেই সময় একদিন আমি মদীনার বাজারে যাচ্ছিলাম। মিসরের অধিবাসী এক খৃষ্টান সিরিয়া থেকে মদীনা মনোয়ারায় শস্য বিক্রি করার জন্য এসেছিল। সে লোকদের কাছে আমার ঠিকানা জিজ্ঞেস করায় লোকেরা ওকে আমার দিকে ইঙ্গিত করে

দেখায়ে দিল। সে আমার কাছে এসে গস্‌সানের কাফির বাদশাহের একটি চিঠি আমাকে দিল। চিঠিতে লিখা ছিল" আমি জানতে পারলাম, তোমাদের আকা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তোমার উপর জুলুম করছে। তোমাকে আল্লাহ তাআলা জিল্লতীর জায়গায় না রাখুক এবং ধ্বংস না করুক। তুমি আমার কাছে চলে এসো, আমি তোমাকে সাহায্য করবো।" হযরত কাব বিন মালেক (রাদি আল্লাহু বলেন) বলেন, আমি এ চিঠি পাঠ করে ইন্নালিল্লাহ পড়লাম, কারণ আমি এমন অবস্থায় পৌছে গেছি যে, কাফিরও আমাকে লোভ দেখাতে লাগলো এবং আমাকে ইসলাম থেকে সরাতে চেষ্টা করতে লাগলো। এটা আমার জন্য আর এক মুছীবত হলো। আমি চিঠিটা তুনদুলের আগুনে নিক্ষেপ করে হুযুরের কাছে গিয়ে আরয করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনার বয়কটের কারণে কাফিরও আমাকে লোভ দেখাচ্ছে। হুযূর কিছু বললেন না। এভাবে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর হুযুরের দূত আমার কাছে হুযুরের নির্দেশ নিয়ে এলো- নিজের স্ত্রীকেও ত্যাগ কর। আমি জানতে চাইলাম, উদ্দেশ্য কি? আমি কি ওকে তালাক দিয়ে দিব? বললেন, না, তবে ওর থেকে পৃথক থাকো। আমার সাথীদ্বয়ের কাছেও একই দূত মারফত নির্দেশ পৌছালেন। আমি আমার স্ত্রীকে বলে দিলাম তুমি তোমার বাপের বাড়িতে চলে যাও। যতদিন আল্লাহ তাআলা এর ফয়সালা করবেন না, ততদিন ওখানে থেকো। বেলাল বিন উমাইয়ার স্ত্রী হুযুরের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ বেলাল তো একেবারে বৃদ্ধ। ওকে দেখাশুনার জন্য কেউ না থাকলে সেতো মারা যাবে। আপনি অনুমতি দিলে ওর সামান্য কাজ কর্ম করে দিতে পারি। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন, ঠিক আছে। এ ব্যাপারে তোমাকে অনুমতি দেয়া হলো তবে ওর কাছে ঘেষ না। উনি আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এদিকে ওনার কোন খেয়ালও নেই। যেদিন থেকে নিষেধাজ্ঞা জারী হলো সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত শুধু কান্নাকাটিতে অতিবাহিত করছে। হযরত ক'ব বলেন এ অবস্থায় আরও দশদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। পঞ্চাশতম দিনের ফজরের নামায নিজের ঘরের ছাদের উপর পড়ে খুবই পেরেশানী অবস্থায় বসা ছিলাম। কারণ এ একঘরে জীবনটা খুবই কষ্টের মধ্যে অতিবাহিত হচ্ছিল। হঠাৎ শুনতে পেলাম যে, সুলেহ পাহাড়ের চূড়া থেকে এক ব্যক্তি চিৎকার করে বললো কা'ব তোমার সুসংবাদ। আমি এতটুকু শুনতেই সিজদায় পতিত হলাম এবং আনন্দে কাঁদতে লাগলাম। বুঝতে পারলাম যে, নিষেধাজ্ঞা উঠায়ে নেয়া হয়েছে। হুযূর (সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফজরের নামাযের পর আমাদের ক্ষমার কথা ঘোষণা করেন। সাথে সাথে এক ব্যক্তি পাহাড়ে উঠে চিৎকার করে বললেন যেটা শুনে আমি বুঝে গেলাম যে, আমরা ক্ষমা পেয়েছি। এর পর এক ব্যক্তি ঘোড়ায় আরোহণ করে দ্রুত গতিতে এসে খবর দিলেন । আমি ওকে আমার পরিধেয় কাপড় এ সুসংবাদের জন্য দিয়ে দিলাম। অতঃপর হুযুরের খেদমতে হাজির হলাম। অনুরূপ আমার সাথীদ্বয়ের কাছেও এ সুসংবাদ নিয়ে লোক গেলেন। অমি যখন মসজিদে নববীতে গেলাম তখন যারা হুযুরের খেদমতে উপস্থিত ছিলেন, আমাকে মুবারকবাদ জানানোর জন্য দৌঁড়ে এলেন। সবের আগে আবু তলহা এগিয়ে এসে মুবারকবাদ জানালেন এবং মুসাফাহা করলেন যেটা আমার কাছে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমি হুযুরের সমীপে গিয়ে সালাম পেশ করলাম, হুযূরের নূরানী চেহারা মুবারক তখন উৎফুল্ল ছিল চেহারা মুবারকে আনন্দের হিল্লোল প্রতিফলিত হচ্ছিল, এবং চাঁদের মত চমকাচ্ছিল। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার তাওবার পরিপূর্ণতার জন্য আমার যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি আল্লাহর রাস্তায় ছদকা করে দিলাম। কারণ এ সম্পত্তিই ছিল এ মুছিবতের মূল। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন এতে তোমার কষ্ট হবে। কিছু অংশ নিজের কাছে রেখে দাও। আমি তাই করলাম । সত্য কথাই আমাকে নাজাত দিয়েছে। এ জন্য আমি সংকল্প করলাম যে, সদা সত্য কথাই বলবো। (বুখারী শরীফ ৬৭৫ পৃঃ২ জিঃ রুহুল বায়ান ৯৬৫ পৃঃ১ জিঃ)

সবকঃ সাহাবায়ে কিরাম (রাদি আল্লাহু আনহুম) এর ধর্মপরায়নতা ছিল খোদা ভীতির উজ্জ্বল নিদর্শন। ওসব পবিত্র লোকদের পবিত্র জীবনের উদহারণ অন্য কারো মধ্যে পাওয়া যায় না। তাঁরা বাস্তবিকই সর্বোৎকৃষ্ট উম্মত হওয়ার যথার্থ দাবীদার। দেখুন, হযরত কা'ব (রাদি আল্লাহু আনহু) খাঁটি মুমিন ছিলেন। যুদ্ধে সব সময় অংশ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু একবার মাত্র অনুপস্থিত থাকার কারণে কীযে দুর্দশার সম্মুখীন হলেন এবং কী ধৈর্য্য সহকারে সেটা সহ্য করলেন। পঞ্চাশ দিন কান্নাকাটির করে অতিবাহিত করলেন। যে সম্পদের কারণে এ অবস্থার সম্মুখীন হলেন সেটাও আল্লাহর রাস্তায় ছদকা করে দিলেন। অন্যান্য মুসলমানগণ এমনকি ওনারা তিন জনের স্ত্রীগণও রসূলের নির্দেশে ওনাদের সাথে সবরকমের সংশ্রব ত্যাগ করলেন। হযরত কাব-এর কাছে এক কাফির বাদশাহের চিঠিও এসেছিল, যেটাতে ওনাকে লোভ দেখানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি সেটার দিকে আকৃষ্ট হওয়ার পরিবর্তে আগের

থেকে অধিক পেরেশান হয়ে বারগাহে নববীতে হাজিরা দিতে লাগলেন এবং মনের মধ্যে এ ভয়ও ছিল যে, কোন কারণে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অসন্তুষ্টিতে উভয় জাহানে যেন ক্ষতির সম্মুখীন হতে না হয়।

আমরা রাসূলের উম্মত; আল্লাহ এবং রাসূলের আহকামও আমাদের সামনে আছে। বড় হুকুম নামাযের কথাই চিন্তা করে দেখুন। আমরা সেটা কতটুকু পালন করতেছি? এবং যা করতেছি, তাও কি রকম করতেছি? যাকাত, হজ্জের কথা কি আর বলবো, কারণ এতে টাকা-পয়সা খরচ হয়।

এ করুণ কাহিনী থেকে বুঝা গেল যে, সাহাবায়ে কিরাম (রাদি আল্লাহু আনহুম) দীন ও মযহাবের সত্যিকার ও খাঁটি অনুসারী ছিলেন। ওনারা কোন অবস্থাতেই দীনকে ত্যাগ করতে রাজি ছিলেন না। যারা আজ সাহাবায়ে কিরামের দীনদারির ব্যাপারে আপত্তি করে, তারা বড় অপরিনামদর্শী।

কাহিনী নং ১৯৯

সাগর পাড়ের গাজী

ষষ্ট হিজরীতে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফের পথে রওয়ানা হলেন। মক্কার কাফিরেরা এ খবর পেয়ে হুযূরকে বাঁধা দেয়ার জন্য বের হয়ে পড়লো। মক্কা শরীফে হুযুরের আগমনটা তাদের জন্য অপমানকর মনে করলো। তারা হোদায়বিয়া নামক স্থানে গিয়ে হুযূরকে সামনে অগ্রসর হতে বাঁধা দিলেন। যদিওবা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাথে জান কুরবানকারী সাহাবায়ে কিরাম মওজুদ ছিলেন, কিন্তু হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) যুদ্ধ করতে চাইলেন না। তিনি সন্ধি করার মনস্থ করলেন। মক্কার কাফিরেরাও সন্ধি করাটা ভাল মনে করলো। তাই ওখানেই সন্ধি সম্পাদিত হয়ে গেল। যুদ্ধের জন্য সাহাবায়ে কিরাম (রাদি আল্লাহু আনহুম) এর দৃঢ় অবস্থান ও মনোবল সত্বেও হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কাফিরদের প্রতি এতটুকু অনুগ্রহ করেছেন যে, ওদের প্রত্যেক শর্ত মেনে নিলেন। সন্ধির মধ্যে যে সব শর্ত ছিল এর মধ্যে একটি শর্ত এটাও ছিলঃ

যে বিধর্মী মুসলমান হয়ে মক্কা থেকে হিজরত করে মুসলমানদের কাছে যাবে ওকে ফিরায়ে দিবে এবং মুসলমাদের থেকে খোদা না করুক কেউ যদি মুরতেদ

হয়ে মক্কা ফিরে আসে, ওকে ফেরত পাঠানো হবে না।

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এ জঘন্য শর্তটিও মেনে নিয়ে ছিলেন। সাহাবায়ে কিরাম এ শর্ত দেখে বিস্মিত হলেন বটে কিন্তু তাঁরা জানতেন যে, নবুয়াতের দৃষ্টি যে পর্যন্ত পৌঁছে, অতটুকু পৌঁছার ক্ষমতা তাঁদের নেই।

এ সন্ধিনামা সম্পাদন কালীন সময়ে হযরত আবু জুলদুল (রাদি আল্লাহু আনহু) যিনি একজন সাহাবী ছিলেন এবং মুসলমান হওয়ার কারণে কাফিরদের হাতে শিকল পরা অবস্থায় বন্দী ছিলেন এবং নানা রকম নির্যাতন ভোগ করছিলেন, কোন প্রকারে মুক্ত হয়ে শিকল পরা অবস্থায় খুবই কষ্ট করে মুসলিম বাহিনীর কাছে এসে পৌঁছলেন এবং আশা করেছিলেন ওনাদের সাথে মদীনায় চলে যাবে। ওনার পিতা সাহিল, যিনি সে সময় কাফিরদের প্রতিনিধি ছিলেন এবং তখনও মুসলমান হয়নি (মক্কা বিজয়ের পুর মুসলমান হয়েছিল।) যখন নিজের ছেলেকে পালিয়ে আসতে দেখলো তখন ওনাকে চড় মারলো এবং ফিরায়ে নিতে চাইলো। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন, সন্ধিনামাতো এখনও চুড়ান্ত হয়নি; তাই এত বাড়াবাড়ি কিসের? এর পরও যখন ওরা মানতে রাজি হলোনা তখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এটাও মেনে নিলেন। আবু জুনদুল (রাদি আল্লাহু আনহু) মুসলমানদের কাছে ফরিয়াদ করে বললেন, আমি মুসলমান হয়ে এসেছি এবং কত যে কষ্ট স্বীকার করেছি। কিন্তু এখন আমাকে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। এ সময় মুসলমানদের মনে ওনার আবেদনে দারুণ রেখাপাত করেছিল, কিন্তু হুযুরের অসম্মতি ছিল বিধায় কেউ কিছু বলতে পারলেন না এবং ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হলো। ফেরত পাঠানোর সময় হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ওনাকে বললেন, সবর কর, শীঘ্রই আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য কোন একটা পথ করে দিবেন।

চুক্তিনামা কার্যকরী হওয়ার পর আবু বছির (রাদি আল্লাহু আনহু) নামক অন্য একজন সাহাবী মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা মনোয়ারায় আসলেন। কাফিরেরা ওনাকেও ফিরায়ে নেয়ার জন্য দু'জন লোক পাঠালো। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) চুক্তি মোতাবেক ওনাকেও ফেরত পাঠালেন। আবু বছিরও আবু জুনদুলের মত আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আমি মুসলমান হয়ে এসেছি। আপনি আমাকে পুনরায় কাফিরদের কাছে ফিরায়ে দিচ্ছেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ওনাকেও সবর করতে বললেন

এবং ইরশাদ ফরমালেন, ইনশা আল্লাহ অতি শীঘ্রই তোমাদের পথ সুগম হয়ে যাবে। অগত্যা আবু বছির কাফিরদ্বয়ের সাথে ফেরত হলেন। পথে তিনি কাফিরদ্বয়ের একজনকে বললেন, বন্ধু! আপনার এ তলোয়ারটা খুবই মূল্যবান বলে মনে হচ্ছে। তাঁর এ কথায় সে অতি উৎসাহিত হয়ে খাপ থেকে স্বীয় তলোয়ার বের করে বললো, হ্যাঁ, এ তলোয়ার দ্বারা আমি অনেক লোককে হত্যা করেছি। তুমি হাতে নিয়ে দেখ। এ সুযোগে আবু বছির সেই তলোয়ার দিয়ে ওকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন। ওর সাথী অবস্থা বেগতিক দেখে মদীনা মনোয়ারায় পালিয়ে আসলো এবং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর খেদমতে হাজির হয়ে বলতে লাগলো আমার সাথীকে মেরে ফেলা হয়েছে। এখন আমার পালা। ওর পিছু পিছু হযরত আবু বছিরও উপস্থিত হলো এবং আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আপনি তো আপনার চুক্তির শর্ত পালন করে আমাকে ফিরায়ে দিয়েছেন কিন্তু আমার সাথেতো ওদের কোন চুক্তি নেই, যার জন্য আমি দায়ী হতে পারি। ওরা আমাকে দীন থেকে ফিরাতে চেয়েছিল। তাই আমি এ কাজ করেছি। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন, তুমি যুদ্ধের ইন্ধন সৃষ্টিকারী। তিনি এ কথায় বুঝে গেলেন যে হুযূর তাঁকে অবশ্য ফেরত পাঠাবেন। তাই তিনি ওখান থেকে আরব সাগরের এক কিনারে চলে গেলেন এবং সাগর পাড়ের জংগলে আস্তানা স্থাপন করলেন। মক্কায় অবস্থানরত হযরত আবু জুনদুল যখন এ ঘটনা জানতে পারলেন, তখন তিনিও কোন উপায়ে মক্কা থেকে বের হয়ে হযরত আবু বছিরের আস্তানায় পৌঁছে গেলেন। এর পর যারা মুসলমান হতেন তারা ঐ সাগর পাড়ের জংগলে আবু বছির ও আবু জুনদুলের কাছে পৌঁছে যেতেন। এভাবে ওখানে ছোট একটি দল সৃষ্টি হয়ে গেল। জংগলের মধ্যে ওনাদের না খাবারের ব্যবস্থা ছিল, না ছিল অন্য কোন সুযোগ সুবিধা। ওনাদের সমস্যার অন্ত ছিল না। কিন্তু যে জালিমদের জুলুমে অসহ্য হয়ে পালিয়ে এখানে এসে ক্ষুদ্র দল গঠন করলেন, তাঁরা ওদের বাকশক্তি রুদ্ধ করে দিলেন। কাফিরদের যে কাফেলা এ জংগল দিয়ে যেত, তাদের সাথে মুকাবেলা করতেন এবং যুদ্ধ করতেন। শেষ পর্যন্ত মক্কার কাফিরেরা অতিষ্ট হয়ে নিজেরাই হুযুরের কাছে লোক পাঠালেন এবং অনুনয় বিনয় করে ও সম্পর্কের দোহাই দিয়ে তাঁর অনুসারীদেরকে সাগর পাড় থেকে মদীনায় নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করলো এবং চুক্তির ব্যাপারে নিজেরা অসহ্য হয়ে গেল। অতঃপর হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ওনাদেরকে নিজের কাছে

ফিরায়ে নিলেন। (হেকায়াতে সাহাবা ১১পৃঃ)

সবকঃ নবীর দৃষ্টি শেষ পরিণতি পর্যন্ত পৌছে যায়। মুসলমানগণ ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির বেলায় বড় অনড় এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাদি আল্লাহু আনহুম) তাঁদের দীন ও ঈমানের ব্যাপারে বড় অটল। ওনাদেরকে দুনিয়ার কোন শক্তি বা মুছিবত ঈমান থেকে হটাতে পারে না।

কাহিনী নং ২০০

হযরত বিলালের ধৈর্য

হযরত বিলাল (রাদি আল্লাহু আনহু) যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন ওনাকে নানাভাবে কষ্ট দেয়া হচ্ছিল। উমাইয়া বিন খলফ, যে মুসলমানদের জঘন্যতম দুশমন ছিল এবং হযরত বিলালের মুনিব ছিল, তাঁকে দ্বি প্রহরের সময় ভীষণ গরমে তপ্ত বালির উপর শোয়ায়ে পাথরের বড় টুকরা তাঁর গায়ের উপর রাখতো যেন এদিক সেদিক নড়া চড়া করতে না পারে। অতঃপর তাঁকে বলতো এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ কর অথবা ইসলাম ত্যাগ কর। কিন্তু হযরত বিলাল (রাদি আল্লাহু আনহু) বলতেন, তুমি শত অত্যাচার করলেও আমি ইসলাম ত্যাগ করবো না। ইসলামের নেশায় তিনি এত বিভোর ছিলেন যে, ওদের অত্যাচার ও জুলুমের প্রতি আদৌ পরওয়া করেননি। এ জালিম তাকে রাত্রে শিকল দিয়ে বেঁধে দোর্রা মেরে ক্ষত-বিক্ষত করতো এবং দিনের বেলায় তপ্ত মাটিতে শোয়ায়ে সেই ক্ষতস্থানকে আরও কষ্টদায়ক করতো যেন অস্থির হয়ে ইসলাম থেকে ফিরে আসে বা এভাবে জ্বালাতন ভোগ করে মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু কি আশ্চর্য! এত নির্যাতনের পরও আল্লাহর প্রেমে এত বিভোর ছিলেন যে মুখে 'আল্লাহ এক' 'আল্লাহ এক' ভিন্ন অন্য কোন কথা ছিল না।

একদিন হযরত ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) তাঁকে এ অবস্থায় দেখে ক্রয় করে আযাদ করে দিলেন এবং তাঁর প্রেম ও ধৈর্যের সুবাদে তিনি বারগাহে মুস্তাফার মুয়াজ্জিন হওয়ার সুভাগ্য লাভ করেন এবং সফরে নফরে সব সময় আজানের দায়িত্ব তাঁকে দেয়া হতো। (হেকায়াতে সাহাবা ১২ পৃঃ)

সবকঃ ইসলামের দুশমনেরা আল্লাহ ওয়ালাদের উপর সবসময় জুলুম নির্যাতন করেছে এবং আল্লাহ ওয়ালাগণও শত নির্যাতন ও অত্যাচারের পরও কখনো ধৈর্যচ্যুত

হন নি। হযরত ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) বড় দানবীর ছিলেন। যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কিরাম বিশেষ করে ছিদ্দিকে আকবরের দুশমন, সে বড় পাপিষ্ট ও কাপুরুষ।

কাহিনী নং ২০১

বিরহ বেদনা

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি হযরত বিলাল (রাদি আল্লাহু আনহু) এর একান্ত মহব্বত ছিল। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর যখন বেসাল হয় অর্থাৎ পর্দার অন্তরালে চলে যান, তখন হযরত বিলাল (রাদি আল্লাহু আনহু) মদীনার অলি গলিতে এ বলে ঘুরাফেরা করছিলেন -ভাইসব, আপনারা কি কোথাও রসুলুল্লাহকে দেখেছেন? দেখলে আমাকে দেখায়ে দিন ও তাঁর ঠিকানা আমাকে বলে দিন। তিনি তাঁর বিরহ বেদনায় অস্থির হয়ে মদীনা ত্যাগ করে সিরিয়ার হালব শহরে চলে যান। এক বছর পর তিনি হুযূরকে স্বপ্ন দেখেন। হুযূর তাঁকে বললেন, হে বিলাল! তুমি আমার সাথে দেখা করাটা কেন ত্যাগ করেছ? তোমার মন কি আমার সাথে দেখা করতে চায় না? হযরত বিলাল এ স্বপ্ন দেখে- হে আকা! বান্দা হাজির, এ বলে বিছানা থেকে উঠে গেলেন এবং তখনই উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা দিলেন। দিন-রাত বিরতিহীন চলার পর মদীনায় পৌছে প্রথমে সোজা মসজিদে নববীতে গেলেন এবং হুযূরকে তালাশ করলেন কিন্তু হুযূরকে দেখলেন না। অতঃপর হুজুরা সমূহে তল্লাশী চালালেন। ওখানেও দেখা পেলেন না। অবশেষে রওজা পাকে হাজির হয়ে কেঁদে কেঁদে আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! গোলামকে হলব থেকে সাক্ষাতের জন্য ডেকে আনলেন কিন্তু গোলাম যখন হাজির হলো, আপনি পর্দার অন্তরালে লুকায়ে গেলেন। এতটুকু বলার পর তিনি বেহুশ হয়ে রওজা মুবারকের পাশে পড়ে গেলেন। অনেক্ষণ পর তাঁর হুশ আসলে লোকেরা ওখান থেকে উঠায়ে তাঁকে বাইরে নিয়ে আসলো। ইতোমধ্যে এ খবর সমগ্র মদীনায় ছড়িয়ে গেল যে, আজ রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর মুয়াজ্জিন বিলাল (রাদি আল্লাহু আনহু) মদীনায় এসেছেন। সবাই এসে হযরত বিলালকে অনুরোধ করলেন, আল্লাহর ওয়াস্তে আবার সেই আজান শুনায়ে দিন যেটা রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে শুনাতেন। হযরত বিলাল অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং বললেন, বন্ধুগণ! এটা

আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা আমি যখন হুযূরের পার্থিব জিন্দেগীতে আজান দিতাম এবং যে মাত্র أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ (আশহাদু আন্না মুহাম্মাদর রসুলুল্লাহ) বলতাম তখন সম্মুখে স্বচক্ষে হুযুরেকে দেখতাম। কিন্তু এখন কি দেখবো? আমাকে এটা থেকে মাফ করুন। অনেকেই অনুরোধ করলেন কিন্তু তিনি অসম্মতিই জ্ঞাপন করেন। কয়েক জন সাহাবা চিন্তা করে বললেন, বিলাল কারো কথা শুনবে না, কাউকে পাঠিয়ে হযরত হাসান-হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহুমা) কে ডেকে নিয়ে এসো। যদি তাঁরা এসে বিলালকে আযান দেয়ার জন্য আবদার করেন, তাহলে বিলাল নিশ্চয় আবদার রক্ষা করবে। এটা শুনে একজন গিয়ে হযরত হাসান-হোসাইন কে ডেকে নিয়ে আসলেন। হযরত হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) এসে হযরত হযরত বিলালের হাত ধরে বললেন, আজ আমাদের সেই আজন শুনায়ে দিন যেই আজান নানাজানকে শুনাতেন। হযরত বিলাল ইমাম হোসাইনকে কোলে উঠায়ে নিয়ে বললেন তুমি হচ্ছ আমার মাহবুবের কলিজার টুকরা, নবীর বাগানের ফুল। তুমি যা বলবে তা করবো। তোমাকে মর্মাহত করবো না। কারণ এতে হুযূর (সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) দুঃখ পাবেন। এর পর বললেন, হোসাইন, তুমি আমাকে নিয়ে চল। যেখানে বল সেখানে আযান দিব। হযরত হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) হযরত বিলালের হাত ধরে মসজিদের ছাদের উপর নিয়ে গিয়ে দাঁড় করায়ে দিলেন। বিলাল আযান দিতে শুরু করলেন। আল্লাহু আকবর। আল্লাহু আকবর। মদীনা মনোয়ারায় এ আওয়াজ ধ্বনিত হওয়ার সাথে সাথে চারিদিকে শোকের ছায়া নেমে আসে। হুযূরের ইন্তেকালের একটি উল্লেখযোগ্য সময় অতিবাহিত হয়েছিল। অনেক মাস পর হযরত বিলালের আওয়াজ শুনে হুযুরের দুনিয়াবী জিন্দেগীর কথা সকলের স্মৃতিপটে ভেসে উঠল। বিলালের আওয়াজ শুনে মদীনার অলিগলি, হাট-বাজার থেকে লোকেরা মসজিদে নববীর চত্বরে এসে জমায়েত হলো, সব লোক ঘর থেকে বের হয়ে আসলো। পর্দানশীন মহিলারা নিজেদের ছোট ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে পর্দার বাইরে চলে আসলো। বিলালের মুখ থেকে যখন أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ (আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) ধ্বনিত হলো, তখন একই সাথে হাজার হাজার লোক কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল। কান্নার কোন সীমা ছিল না। মহিলারাও ভীষন কান্না কাটি করছিল। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা নিজ নিজ মায়ের কাছে জিজ্ঞাসা করছিল যে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর মুয়াজ্জিন বিলালতো এসে গেলেন, কিন্তু

আমাদের রাসূল কখন মদীনায় তশরীফ আনবেন? হযরত বিলাল (রাদি আল্লাহু আনহু) যখন أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ বললেন এবং স্বচক্ষে প্রত্যক্ষভাবে হুযূরকে দেখলেন না, তখন হুযুরের বিরহ বেদনায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন এবং অনেকক্ষণ পর হুঁশ হলে ওখান থেকে উঠে ক্রন্দনরত অবস্থায় সিরিয়ায় ফিরে গেলেন।

(মুদারেজুন নাবুয়াত ২৩৬ পৃঃ ২ জিঃ)

সবকঃ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বেসাল শরীফের পরও জীবিত। তাঁর সাক্ষাত প্রার্থীদেরকে সাক্ষাতদানে ধন্য করেন। সাহাবায়ে কিরাম (রাদি আল্লাহু আনহুম) ছোট-বড়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকের হুযুরের প্রতি সীমাহীন মহব্বত ছিল এবং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর স্মৃতি কথা শুনলে অস্থির হয়ে যেতেন। আহলে বায়তের প্রতিও সাহাবায়ে কিরামের ভীষণ মহব্বত ছিল।

কাহিনী নং ২০২

ইসলামের ঝাণ্ডা

উহুদ যুদ্ধে হযরত মুসয়াব বিন আমীর (রাদি আল্লাহু আনহু) এর হাতে ইসলামের ঝান্ডা ছিল। কাফিরেরা ইসলামী ঝান্ডাকে অবনমিত করার জন্য হযরত মুস্য়াব এর উপর আক্রমণ করে। হযরত মুস্য়াব ঝাণ্ডা খাঁড়া করে রেখে ওদের সাথে যুদ্ধ করতে লাগলেন। ইবনে কায়মা নামে এক মুশরিক অতর্কিত ভাবে তাঁর হাতের উপর তলোয়ারের এমন আঘাত করলো যে এতে তাঁর হাত শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু বীর বাহাদুর ও সত্যের প্রেমিক ওদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে অন্য হাতে ঝান্ডা নিয়ে নিলেন এবং ঝাণ্ডাকে অবনমিত হতে দিলেন না। মুশরিকরা সেই ঝাণ্ডাকে অবনমিত করার জন্য আরো জোরে আক্রমণ করলো এবং কাছে এসে ঝাণ্ডা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করলো কিন্তু তিনি ওদেরকে কাছেও ঘেঁষতে দিলেন না। তিনি ঝাণ্ডা ধারণ ও তলোয়ার চালনা সব এক হাতেই করছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর সেই হাতটাও কেটে পড়ে গেল। সত্যের পাগল অন্য হাতটি কেটে যাবার সাথে সাথে কাটা হাতদ্বয়ের গোড়ালী দ্বারা ঝাণ্ডাকে বুকের সাথে লাগিয়ে নিলেন এবং ঝাণ্ডা পতিত হতে দিলেন না। মুশরিকরা যখন দেখলেন যে উভয় হাত কেটে

যাবার পরও ঝাণ্ডা পতিত হলো না, তখন ইবনে কায়মা ক্রোধান্বিত হয়ে তলোয়ার ফেলে দিয়ে একটু দূরত্ব থেকে এমন এক তীর নিক্ষেপ করলো সেটা তাঁর বুকে বিঁধিত হলো। ফলে হযরত মুসয়াব বিন আমীর (রাদি আল্লাহু আনহু) ইসলামের ইজ্জতকে বুকে জড়িয়ে ধরে জান্নাতে পাড়ি দিলেন।

যুদ্ধ শেষে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হযরত মুস্য়াবের লাশের কাছে আসলেন এবং তাঁর নূরানী চেহারা দেখে এ আয়াত তেলাওয়াত করলেনঃ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوْا اللّٰهَ عَلَيْهِ অর্থাৎ মুমিনগণের মধ্যে এমনও আছে যে, যারা সেই ওয়াদাকে পূর্ণ করেছে, যেটা তারা তাঁদের খোদার সাথে করেছিল।

অতঃপর সেই লাশকে সম্বোধন করে বললেন, আমি তোমাকে মক্কায় দেখেছি যেখানে তোমার থেকে অধিক সুন্দর ও মনোরম ভূষনে অন্য কেউ ছিল না। কিন্তু আজ এ অবস্থায় কেন? তোমার চেহারায় ধুলিবালি পড়েছে, চুল এলোমেলো হয়ে গেছে। আল্লাহর রসূল সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তোমরা শহীদগণ কিয়ামতের দিন আল্লাহর সান্নিধ্যে থাকবে। (তারিখে ইসলাম ৬৮ পৃঃ)

সবকঃ সাহাবায়ে কিরাম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগ পর্যন্ত ইসলামের সাহায্য করেছেন। ওসব পবিত্র লোকদের বাহাদুরী ও সাহসিকতার দ্বারা চারিদিকে ইসলামের ডংকা বেজেছে। আল্লাহর দরবারে তাঁদের এক বিশেষ স্থান রয়েছে।

কাহিনী নং ২০৩

আল্লাহর তলোয়ার

মুতা যুদ্ধে রোম বাদশাহ হারকলের এক লাখ সৈন্য ছিল এবং মুসলিম মুজাহিদদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিন হাজার। হযরত আবদুল্লাহ বিন রওয়াহা (রাদি আল্লাহু আনহু) এ অবস্থা দেখে মুসলিম মুজাহিদগণকে সম্বোধন করে নিম্নের বক্তব্যটি পেশ করেনঃ

মুজাহিদ ভাইগণ! শাহাদাতের উৎসাহে আমরা ঘর থেকে বের হয়েছি। যদিওবা আমাদের মুকাবিলায় শত্রুপক্ষের সৈন্য সংখ্যা অনেক বেশী কিন্তু এটা আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে আমরা সংখ্যা বিবেচনা করে দুশমনের সাথে যুদ্ধ করিনা বরং আমাদের বাহিনী ও শক্তি হচ্ছে ইসলাম। এই ইসলামের বদৌলতেই

আল্লাহ তাআলা আজ পর্যন্ত আমাদেরকে বিজয়ী করেছেন।

বীর মুজাহিদগণ! আর বিলম্ব নয়, আল্লাহর নাম নিয়ে কাফিরদের মুকাবিলার জন্য তৈরী হয়ে যাও।

হযরত আবদুল্লাহ বিন রওয়াহা (রাদি আল্লাহু আনহু) এর এ তেজউদ্দীপক বক্তৃতা শুনে সব মুজাহিদ এক বাক্যে বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন, আমরা সবাই মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত। অতঃপর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। হযরত যায়েদ বিন হারেছের হাতে ছিল ইসলামের তথা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ঝাণ্ডা। তিনি বড় উৎসাহ উদ্দীপনা এবং বাহাদুরীর সাথে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান। তাঁর শাহাদাতের পর পরই ইসলামের ঝাণ্ডা হযরত জাফর বিন আবি তালেব (রাদি আল্লাহু আনহু) নিয়ে নেন এবং জোরালো ভাবে দুশমনদের সাথে মুকাবিলা শুরু করেন। তিনি শত্রুদেরকে কচু কাটা করতে লাগলেন। যখন তাঁর ঘোড়া আহত হয়ে গেল, তিনি মাটিতে নেমে যুদ্ধ করতে করতে অনেক দূর এগিয়ে গেলেন। এ সুযোগে দুশমনেরা তাঁকে চারিদিক থেকে আক্রমণ করলে প্রথমে তাঁর একটি বাহু কেটে যায়, কিন্তু তিনি অন্য বাহুতে ঝাণ্ডা নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। যখন শত্রুরা সেই বাহুটিও আলাদা করে ফেললো, তখণ তিনি কর্তিত বাহু দ্বয়ের গোড়ালী একত্রিত করে ঝাণ্ডা বুকের সাথে আঁকড়ে ধরে পতিত হতে দিলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি এ অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রাদি আল্লাহু আনহু) এর শাহাদাতের পর মুসলমানদের মধ্যে হতাশা দেখা দিল। তবে হযরত ছাবেত বিন আরকম আনচারী (রাদি আল্লাহু আনহু) ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে বললেন, মুসলমান ভাইগণ, এখন আপনারা হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদকে আপনাদের সেনাপতি মনোনিত করে জিহাদ অব্যাহত রাখুন। সবাই এ কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। অতঃপর হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাদি আল্লাহু আনহু) সামনে এগিয়ে গেলেন এবং মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে ভীষণ সাহসিকতার সাথে শত্রু বাহিনীর উপর জোরালো আক্রমণ চালালেন। হযরত খালিদের নেতৃত্বে মুসলমানদের এ জোরালো হামলায় কাফিরেরা দিসেহারা হয়ে গেল। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ সব সময় সবের আগে আগে থাকতেন এবং যেই কাফিরের উপর তাঁর তলোয়ার চলাতো, ওর আর রক্ষা ছিল না। একে একে তাঁর নয়টি তলোয়ার যুদ্ধ করতে করতে ভেঙ্গে যায়। প্রতিটি তলোয়ার ভাঙ্গার সাথে সাথে তিনি অন্য তলোয়ার নিয়ে দুশমনের উপর বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়েন।

হযরত খালিদের এ বাহাদুরী দেখে কাফিরেরা এমন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গিয়েছিল যে ওদের হাত-পা থর থর করে কাঁপছিল। রাত ঘনিয়ে আসায় সেই দিনের মত যুদ্ধ আপাততঃ বন্ধ হয়ে যায়। পরদিন সকালে পুনরায় যুদ্ধ করার জন্য উভয় পক্ষ সামনা-সামনি কাতার বন্দী হয়ে গেল। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ কাতারকে এমন ভাবে সজ্জিত করলেন যে গত কাল যারা পিছনে ছিল ওদেরকে সামনে দিলেন এবং সামনে যারা ছিল, ওদেরকে পিছনে দিলেন। এভাবে পরিবর্তন করার কারণে কাফিরেরা মনে করলো যে মুসলমানদের সাহায্যকারী বাহিনী এসে পৌছেছে। যাহোক এর পর পরই হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ কাফিরদের উপর আক্রমণ শুরু করে দিলেন। তাঁর সাথে সাথে সামনের কাতারের মুসলমাগণও এমন জোশ ও সাহসিকতা দেখালেন যে কাফিরেরা পিছপা হতে বাধ্য হলো। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ ময়দান ত্যাগ করে পালিয়ে গেল। তবে হযরত খালীদ (রাদি আল্লাহু আনহু) তখনকার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ওদের পিছু নিলেন না, মালে গনীমত যা পেলেন, ওগুলো নিয়ে অবশিষ্ট মুসলমানগণসহ মদীনা শরীফে ফিরে আসলেন। (তারীখে ইসলাম-২৩০ পৃঃ)

সবকঃ হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাদি আল্লাহু আনহু) বড় সাহসী ও বাহাদুর সাহাবী ছিলেন এবং বারগাহে নাবুয়াত থেকে 'আল্লাহর তলোয়ার' লকব প্রাপ্তিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। সত্যিকার মুসলমানগণ ইসলামের বলে বলিয়ান হয়ে নিজেদের জানের পরওয়া না করে লাখ লাখ শত্রুর মোকাবিলা করতে ভয় করেন না এবং আল্লাহ তাআলা তাদের সাহায্য করেন।

কাহিনী নং ২০৪

মকুকসের দরবারে

মিসরের বাদশাহ মকুকসের ইচ্ছে অনুসারে হযরত আমর ইবনুল আস (রাদি আল্লাহু আনহু) মকুকসের কাছে হযরত আবাদা বিন ছাবেত (রাদি আল্লাহু আনহু) এর নেতৃত্বে দশজনের একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। হযরত আবাদার গায়ের রং কালো ছিল। মকুকস তাঁকে দেখে চমকে উঠলো এবং বললো মুসলমান কি এ রকম হয়ে থাকে? এ কি যুদ্ধ করবে? মকুকসের এ কথাগুলো শুনে হযরত আবাদা এ ভাবে বক্তব্য রাখতে শুরু করলেনঃ

আমি আপনার কথা শুনেছি। এবার আমার কথা শুনুন। যাদের কাছ থেকে আমি এসেছি ওদের আরও এক হাজারের মত কালো মানুষ মওজুদ আছে, যাদের রং আমার থেকেও কালো এবং চেহারাও আমার চেয়ে অধিক ভয়ানক এবং তেজধীপ্ত। যদি আপনি ওদেরকে দেখেন আপনার অবস্থা কী যে হবে বলতে পারছিনা। শুনেন, আমি বৃদ্ধ এবং আমার যৌবন লুপ্ত হয়ে গেছে কিন্তু আল্লাহর শোকর, আমি একাই একশ লোককেও ভয় করি না। আমার অন্যান্য সাথীদের অবস্থাও আমার মত। এর কারণ হলো, আমাদের আসল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর পথে জিহাদ করা এবং আল্লাহর রেজামন্দী অর্জন। আমরা রাজ্য দখল বা দুনিয়াবী লালসায় যুদ্ধ করি না। আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য মালে-গনিমত হালাল করেছেন। আমরা দুনিয়াবী সম্পদের কোন পরওয়া করিনা। আমাদের কাছে লাখ টাকা থাকুক বা মাত্র এক টাকাই থাকুক, উভয় অবস্থায় আমরা একই বরাবর। আমাদের কাছে দুনিয়াবী নেয়ামতের বিশেষ গুরুত্ব নেই। আমাদের আসল নেয়ামত হচ্ছে পরকালীন শান্তি। আমাদের প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে, আমরা দুনিয়াবী সম্পদ কেবল অতটুকু গ্রহণ করবো যাদ্বারা ক্ষুধা নিবারণ করা যায় এবং সতর ঢাকা যায়। মকুকস এ বক্তব্য শুনে বললো, আপনি যা কিছু আপনার ও আপনার সঙ্গীদের সম্পর্কে বলেছেন আমি সব শুনলাম। নিশ্চয় আপনারা আপনাদের মাহাত্মের কারণে বিজয়ী হবেন এবং দুনিয়াবী কোন শক্তি আপনাদের সাথে মুকাবেলা করতে পারবে না। কিন্তু এ সময় আপনাদের মুকাবেলা হচ্ছে আমার সাথে। আপনারা কখনো আমার মুকাবেলা করতে পারবেননা। আমি এত সৈনিক মওজুদ করেছি যে, আপনাদের বিজয় লাভ করা মুশকিল হবে। তাই আপনাদের জন্য এটাই উত্তম হবে যে আমি আপনাদের প্রত্যেককে দু'টি করে স্বর্ণ মুদ্রা এবং আপনাদের খলীফার জন্য এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা দিচ্ছি। আপনারা এ মুদ্রা নিয়ে ফিরে চলে যান।

হযরত আবাদা ওর এ কথাগুলো শুনে বললেন, আপনি ও আপনার সাথীরা ভুলের মধ্যে আছেন। আপনারা আমাদেরকে রোমের ক্ষীণ প্রাণ সৈন্য বাহিনীর ভয় দেখাচ্ছেন। খোদার কসম, আমরা ওদেরকে আদৌ পরওয়া করিনা। বরং আপনার এ কথাবার্তা আমাদের জিহাদী জজবাকে আরও উত্তেজিত করেছে। এখন আমরা এ দু'বরকতের যে কোন একটি অর্জন করবো- আমরা জয়ী হলে অধিক মালে গনীমত লাভ করবো আর যদি আপনারা বিজয়ী হন তাহলে আমরা শহীদ হবো এবং আমরা

পরকালের দৌলত লাভ করবো। আমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নেই যিনি সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর কাছে শাহাদত প্রার্থনা করে না।

শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ শুরু হলো এবং ফলাফল ওটাই হলো যা হযরত আবাদা বলেছিলেন অর্থাৎ আল্লাহর মনোনীত বাহিনী মিসর বিজয় করলো এবং মুজাহিদগণ যা বলেছেন, তা করে দেখিয়ে দিয়েছেন, (তারীখুল ইসলাম ৫৩ পৃঃ)

সবকঃ মুসলমানগণের যুদ্ধ সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই হয়ে থাকে, কোন দুনিয়াবী লালসার জন্য যুদ্ধ করেন না। যে যুদ্ধে খোদার রেজামন্দী উদ্দেশ্য হয়ে থাকে সেটা জেহাদ বলে বিবেচ্য এবং সেই জজবার বদৌলতেই মুসলমানগণ বিজয় ও সাহায্য লাভ করে থাকেন।

কাহিনী নং ২০৫

বিষের পুরিয়া

ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) এর খেলাফতকালে হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদের পরিচালনায় মুসলিম বাহিনী বিভিন্ন দেশে বিজয় ডংকা বাজাচ্ছিলেন এবং বিজয় নিশান উড়াচ্ছিলেন। সে সময় হিরা শহরের বিদ্রোহী ও উচ্ছৃংখল কাফিরদের উদ্ধত্য ও ওয়াদা ভঙ্গের খবর পেয়ে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাদি আল্লাহু আনহু) হিরার দিকে যাত্রা দিলেন। ইসলামী বীর মুজাহিদদের আগমনের খবর শুনে হিরা বাসীরা তাদের দূর্গ সমূহে প্রবেশ করে দুর্গের দরজা বন্ধ করে দিল। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের নির্দেশে চারিদিক থেকে দূর্গসমূহ অবরোধ করা হলো। এভাবে কয়েক দিন দূর্গ সমূহ অবরোধ করে রাখলেন এবং এ আশায় যুদ্ধ শুরু করলেন না যে, হয়তো এরা সুপথে এসে যেতে পারে। কিন্তু যখন ওদের পক্ষ থেকে কোন নড়া-চড়া দেখলেন না, তখন হযরত খালিদ আক্রমণ করে শহরের আবাদী এলাকা এবং এর অন্তর্ভুক্ত মন্দির ও গির্জা সমূহ দখল করে নিলেন। মন্দির গির্জা দখল করার পর আমর বিন আবদুল মসীহ নামে এক অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি দুর্গ থেকে বের হয়ে আসলো। মুসলিম বাহিনী ওকে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের কাছে নিয়ে গেলেন। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বয়স কত? সে বললো অনেক বছর। ওর সাথে আগত সহচরের কাছে একটি বিষের পুরিয়া পাওয়া গেল। হযরত খালিদ ওকে জিজ্ঞেস করলো, এটা কেন এনেছ? সে

বললো, এ উদ্দেশ্যে এনেছি যে, যদি আপনি আমাদের কাউমের সাথে ভাল ব্যবহার না করেন, তাহলে আমি এটা খেয়ে মৃত্যুবরণ করবো যেন নিজের কাউমের জিল্লতী ও ধ্বংস দেখতে না হয়।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাদি আল্লাহু আনহু) সেই পুরিয়া থেকে বিষ বের করে নিজের হাতের তালুতে নিলেন এবং ওকে বললেন অসময়ে কেউ মৃত্যুবরণ করে না। মৃত্যুর সময় না হলে বিষ পান করলেও কোন কাজ হয় না। অতঃপর তিনি بِسْمِ اللّٰهِ خَيْرِ الْاَسْمَاءِ رَبِّ الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ دَاءٌ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এ বাক্য টি পাঠ করে সেই বিষ মুখে দিয়ে দিলেন। সেই বৃদ্ধ লোকটি এ বিশ্বাস ও আল্লাহর উপর ভরসার এ দৃশ্য দেখে হতবম্ভ হয়ে গেলেন এবং দূর্গ থেকে যারা বের হয়ে এসেছিল সবাই আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বৃদ্ধের মুখ থেকে অপ্রত্যাশিত ভাবে এ শব্দগুলো বের হয়ে আসলো যত দিন পর্যন্ত তোমার মত সৎ একজন লোকও তোমাদের মধ্যে থাকবে, তোমরা স্বীয় উদ্দেশ্যে বিফল হতে পার না।(তারিখুল ইসলাম ৩৭৬ পৃঃ ২ জিঃ)

সবকঃ হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাদি আল্লাহু আনহু) ইসলামের খুবই উচ্চ পর্যায়ের সেনাপতি ছিলেন। মুসলমানগণ সব সময় তাঁকে নিয়ে গর্ববোধ করেন। সাহাবায়ে কিরাম স্বীয় সংকল্প ও বিশ্বাসের বদৌলতে মৃত্যুর ব্যাপারে আদৌ ভীত ছিলেন না এবং সেই জজবার বদৌলতে চিরস্থায়ীত্ব লাভ করেছেন।

কাহিনী নং ২০৬

মাটির পাত্র

কাদসিয়ার যুদ্ধের সময় ইরানের বাদশাহ ইয়্দাগরদের পক্ষ থেকে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি হযরত সাদ বিন আবি ওকাস (রাদি আল্লাহু আনহু) এর কাছে এ প্রস্তাব পাঠানো হলো যে ওনার পক্ষ থেকে মুসলমানদের একটি প্রতিনিধি যেন ওর কাছে পাঠায়, যাতে ওনাদের সাথে ধীরস্থির ভাবে আলোচনা করতে পারে। এ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত রবি বিন আমের, নোমান বিন মকরন, মগিরা বিন যেরারা, আসেম বিন ওমর প্রমুখের একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করলেন। এদিকে ইরানীরা নিজেদের দাপট ও শানমান দেখানোর জন্য ইযদাগরদের দরবারকে খুব সুন্দর করে সাজালো, দরবারের প্রবেশ পথে মূল্যবান গালিছা বিছানা হলো এবং

দরবার হলে বসার জন্য সোনালী বিছানা পেতে দিল এবং সোনালী কারুকার্য খচিত বালিশ স্থাপন করলো। সোনালী সিংহাসনে ইয়াদাগরদ নিজে বসলো। ইসলামী প্রতিনিধি দল অদ্ভুত সাজগোজে রাজ দরবারে পৌছলেন। হযরত রবি এমন অবস্থায় ঘোড়ায় আরোহণ করে দরবারে প্রবেশ করলেন যে, তাঁর সাথে ছিল একটি মামুলি তলোয়ার এবং রশিতে বাঁধা লটকানো একটি তীর । মূল্যবান গালিছার কাছে যখন ঘোড়া পৌঁছলো তখন দরবারের লোকেরা ওনাকে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ার জন্য বললো। কিন্তু তিনি তাদের কথাকে কোন পাত্তা না দিয়ে দরবারের মূল্যবান গালিচার উপর দিয়ে ঘোড়াকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। অতঃপর ঘোড়া থেকে নেমে দরবারের দু'টি সোনালী কারুকার্য খচিত ভারী বালিশকে তীর দিয়ে ছিদ্র করে রশি ঢুকায়ে ঘোড়াকে বাঁধলেন। ইরানীরা এসব কিছু নীরবে লক্ষ্য করলো কিন্তু আমন্ত্রিত বলে কিছু বলার থেকে বিরত রইলো। এর পর তিনি গালিছার উপর তীরের আঘাত করে করে হল ঘরের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন। তাঁর এ ধীর গতি ও তীরের আঘাতে গালিছা ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসগুলো বিনষ্ট হয়ে গেল এবং তীরের আঘাতে গালিচার মাঝে মাঝে ছিদ্র হয়ে গেল। ইযাদগরদের কাছে গিয়ে তীর মাটিতে গেঁড়ে রাখলেন এবং নিজে মাটিতে বসে পড়লেন। দরবারের লোকেরা বললো মাটিতে কেন বসে পড়লেন? তিনি বললেন আমরা সাজসজ্জা পছন্দ করি না এবং সে সবের প্রতি আমাদের আদৌ আগ্রহ নেই। হযরত রবির পিছু পিছু তাঁর সাথী হযরত নোমান. মগিরা ও আসেম (রাদি আল্লাহু আনহুম)ও অনুরূপ ভাবে প্রবেশ করলেন। ইয়দাগরদ জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি চাও? হযরত নোমান বিন মকরণ বললেনঃ "আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি রহম করেছেন এবং আমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য রসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি আমাদেরকে ভাল কাজের নির্দেশ দিয়েছেন এবং মন্দকাজ থেকে বাঁধা দিয়েছেন, আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে আমরা যদি তাঁর নির্দেশাবলী পালন করি, তাহলে দীন দুনিয়ার কল্যাণ আমাদের নছীব হবে। আমাদের রসূল আমাদেরকে এটাও নির্দেশ দিয়েছেন যে আমরা যেন প্রত্যেক কউমকে সুবিচার ও ন্যায়পরায়নের কথা বলি এবং ইসলামের প্রতি আহবান করি। তাই আমরা আপনাকেও সুবিচার, ন্যায় পরায়ন ও ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। আমাদের ধর্ম সবচে উৎকষ্ট ধর্ম। আপনি যদি আমাদের ধর্ম গ্রহণ করে নেন, তাহলে তো ভাল, অন্যথায় দু'টি বিষয় থেকে যে কোন একটি গ্রহণ করুন-হয়তো জিজিয়া (কর) দিন অথবা যুদ্ধ করুন। যদি আপনি আমাদের

ধর্ম গ্রহণ করেন তাহলে আমরা আপনার কাছে খোদার কিতাব রেখে যাব। আপনি খোদার সেই কিতাবের উপর অটল থাকবেন এবং এর নির্দেশাবলী অনুসারে রাজত্ব করবেন। আমরা চলে যাব এবং আপনার দেশের ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করবো না। জিজিয়া (কর) দিতে চাইলে তাতেও আমরা রাজি আছি। তখন আমরা আপনাদেরকে দুশমনদের থেকে রক্ষা করবো এবং কোন ক্ষতি করতে দেব না। এ দু'টার কোনটাই যদি আপনাদের গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে আমরা আপনাদের সাথে যুদ্ধ করবো।

ইয়াযদগরদ এর উত্তরে বললো "আমি জানি তোমাদের কউম শেষ পর্যায়ের অসভ্য ও নিকৃষ্ট। তোমরা সীমা অতিক্রম করো না এবং পারস্য সাম্রাজ্য দখল করার লোভ-লালসা মন মেজাজ থেকে ফেলে দাও। আমাদের সাথে মুকাবেলা করতে গেলে, তোমাদেরকে মারাত্মক ক্ষতির সম্মূখীন হতে হবে। যদি তোমরা নিজেদের অভাবের কারণে বাধ্য হয়ে আমাদের রাজ্যের উপর হামলা করতে চাও, তাহলে আমি তোমাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত আছি। তোমাদের আমি জায়গা জমি দেব এবং তোমাদের সরদারদের ইজ্জত করবো। তোমাদেরকে কাপড় চোপড় তৈরী করে দিব এবং যা চাও, তা দেব।

ইয়াযগরদ এ কথা শুনে হযরত মগীরা (রাদি আল্লাহু আনহু) বললেন "বাদশাহ মহাশয়! ওনারা আরবের সরদার ও শরীফ খানদানের অন্তর্ভুক্ত এবং নিজেদের মান সম্মানের প্রতি সজাগ। ওনাদেরকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সেটা এখনো আপনার কাছে পুরাপুরি প্রকাশ করেনি। আপনি যে কথা গুলো বলেছেন সেটা ওনার বক্তব্যের উত্তর হলো না। আপনি যা বলার আছে আমাকে বলুন। আমি আপনার বক্তব্য আমাদের সেনাপতিকে পৌছাবো। আপনি আমাদের দুর্বল অবস্থা সম্পর্কে যা বলেছেন তা ঠিকই বলেছেন। বাস্তবিক পক্ষে আমাদের অবস্থা এর থেকে আরো অধিক খারাপ ছিল কিন্তু নোমান বিন মকরন যা বলেছেন অর্থাৎ আল্লাহ আমাদের প্রতি রহম করেছেন এবং আমাদের সংশোধনের জন্য স্বীয় নবী প্রেরণ করেছেন, যিনি আমাদেরকে মানুষে পরিণত করেছেন এবং ইজ্জত সম্মানের উচ্চস্থানে পৌছায়ে দিয়েছেন। অতএব হে বাদশাহ! নোমান বিন মকরনের বক্তব্যকে অবজ্ঞার চোখে দেখ না। আপনার জন্য উত্তম হবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করুন এবং নিজেকে রক্ষা করুন।

ইয়াযগরদ জবাবে বললো, যদি প্রতিনিধিদেরকে হত্যা করাটা রীতি নীতির বরখেলাপ

না হতো, তাহরে আমি তোমরা সবাইকে হত্যা করার নির্দেশ দিতাম। তোমরা এ মুহূর্তে ফিরে যাও, তোমাদের কথার কোন উত্তর দিতে রাজি নই। এরপর ইযদগরদ একটি মাটির পাত্র আনালো এবং নির্দেশ দিল যে এ লোকদের মধ্যে যে সবচে শরীফ বা সম্ভ্রান্ত, এ পাত্রের মধ্যে মাটি ভরে সেটা ওর মাথার উপর দাও এবং শহর থেকে বের করে দাও। হযরত আসেম বিন ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) আগে বেড়ে মাটির পাত্রটা নিজের মাথার উপর উঠায়ে নিলেন এবং খুবই সন্তুষ্টি প্রকাশ কররেন। এ সন্তুষ্টি দেখে ইযদাগরদ বিস্মিত হলো। হযরত আসেম ওকে লক্ষ্য করে বললেনঃ

তোমার দৃষ্টিতে এটা অপদস্ত করার একটি চালবাজি কিন্তু এটা মুসলমানদের জন্য সৌভাগ্যের প্রতীক। আমি বিশ্বাস করি, এটা আল্লাহর বিরাট দান, তুমি নিজে নিজের দেশকে ইসলামকে দিয়ে দিলে।

এ কথাগুলো বলে মুজাহিদগণ দরবার থেকে বের হয়ে আসলেন।

ইসলামী প্রতিনিধি দল ফিরে আসার পর ইয়দগারদ ও ওর সহকর্মীরা মুসলমানদের সাহস ও বেপরওয়া সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করলো। ইযদগরদ বললো আমার মন সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ওরা নিশ্চয় কামিয়াবী হাছিল করবে। তবে আসেম বড় বেঅকুফ। সে মাটির পাত্র পেয়ে বড় খুশী হয়ে গেল।

ইরানী সরদার রুস্তম বললো, বাদশাহ মহারাজ যাকে আপনি বেঅকুফ বলছেন তিনি সবচে অধিক জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। সে মাটির পাত্রটিকে সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছে, যে ব্যাপারে আপনার খবরও নেই। বাদশাহ এ কথা শুনে খুবই রাগান্বিত হলো এবং অস্থির অবস্থায় দরবার হল থেকে বের হয়ে এসে ইসলামী প্রতিনিধি দলের খোঁজে একদল ঘোড় সওয়ারী পাঠিয়ে দিল এবং ওদেরকে বললো যদি তোমরা মুসলিম প্রতিনিধি দলকে পথে ধরতে পার, তাহলে আমরা আমাদের দেশকে রক্ষা করতে পারবো আর যদি তোমরা ওদেরকে ধরতে না পার, তাহলে তোমরা মনে করিও তোমাদের দেশ হাত ছাড়া হয়ে গেছে। কেননা সেই প্রতিনিধি দল আমাদের দেশের চাবি মাথায় উঠায়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ কথা শুনে ঘোড় সওয়ারীরা ঘোড়া হাঁকিয়ে মুজাহিদগণের খুঁজে পিছু পিছু বের হলো কিন্তু বিফল হয়ে ফিরে আসলো। রুস্তম বললো মুসলমানগণ আমাদের জন্মভূমিকে বিস্ময়কর পদ্ধতিতে নিয়ে গেল এবং আমরা জানতেও পারলাম না। রুস্তম যেহেতু জ্যোতিষী যাদুকর ছিল, সেহেতু সে নক্ষত্ররাজির হিসেব নিকেশ করে বুঝতে পেরেছিল যে, মাটির পাত্র নিয়ে যাওয়া মানে আরববাসী পারস্য সাম্রাজ্য দখল করে নিল।

সবকঃ মুসলমানগণ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সত্যিকার অনুসারী হয়ে থাকেন। ওনাদের দৃষ্টিতে দুনিয়াবী চাকচিক্যের কোন কদর নেই। ওনারা নিজেদের সততা ও সাহসিকতার বলে কোন শক্তিকে পরওয়া করেন না। তাঁরা সত্যবাণী প্রচারের জন্য সদা প্রস্তুত থাকেন। আল্লাহ তাআলা সত্যিকার মুসলমানগণকে নানাভাবে সাহায্য করেন এবং শত্রুরা দুনিয়াবী প্রভাব ও সংখ্যায় অধিক হওয়ার পরও মুসলমানদের মুকাবেলা করতে পারে না। সাহাবায়ে কিরাম (রাদি আল্লাহু আনহুম) তা বাস্তবায়ন করে দেখায়েছেন।

কাহিনী নং ২০৭

তাবুক অভিযান

সিরিয়া থেকে আগত এক কাফেলা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে বললো- রোমের বাদশাহ মুতা যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে পরাজিত হওয়ার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সেনাবাহিনীকে সজ্জিত করছে যেন মদীনা মনোয়ারায় আক্রমণ করতে পারে। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন, কোন চিন্তা নেই।

কাফেলাঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! রোমের বাদশাহ এটা গর্ববোধ করে বলে যে, সে প্রায় অর্ধজগতের শাসক এবং সে মনে করে যে মুষ্ঠি পরিমাণ মুসলমান ওর সামনে কিছুই নয়। সে দু'লাখ সৈন্য নিয়ে মদীনা আক্রমণ করার মনস্থ করেছে।

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)ঃ (সাহাবায়ে কিরামের দিকে লক্ষ্য করে) তোমাদের অভিমত কি?

সাহাবায়ে কিরামঃ আল্লাহ যার হেফাজতকারী তার ক্ষতি করার সাধ্য কারো নেই। আমরা আমাদের আকা মাওলার সাথে আছি। আপনি যেটাই বলবেন, আমরা সেটার জন্য প্রস্তুত আছি।

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)ঃ তাহলে শুনো, আমার অভিমত হচ্ছে আক্রমণকারী সৈন্যদেরকে আরব ভূমিতে প্রবেশের আগে বাঁধা দেয়া উচিত

যেন দেশের অভ্যন্তরে কোন ক্ষতি না হয়।

সাহবায়ে কিরামঃ আপনার অভিমত আমরা মাথাপেতে নিতে প্রস্তুত।

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)ঃ ভাল করে চিন্তা করে দেখ। এটা অনেক দূরের সফর। তাছাড়া আরবের প্রসিদ্ধ গরম এখন ভরযৌবনে। মদীনায় ফল পেকেছে। এখন বৃক্ষের ছায়ায় বসে ফল খাওয়া ও আরাম করার সময়।

সাহাবায়ে কিরামঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনার ইচ্ছার সামনে দুনিয়ার প্রত্যেক নিয়ামত ও আরাম আমাদের কাছে তুচ্ছ। এটাই আমাদের ঈমান। সবর ও ভরসা হচ্ছে অনুগত অনুসারীদের রীতি। আমরা রেজামন্দির আঁচল হাত ছাড়া করতে কখনো রাজি নই।

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)ঃ তাহলে ঠিক আছে, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেয়া যাক। এ প্রস্তুতি কল্পে আল্লাহর রাস্তায় কিছু খরচ করার জন্য আহবান জানাচ্ছি। আল্লাহর রেজামন্দিকামীরা বল কে কি দিবে?

হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু)ঃ ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনার এ গোলাম নয়শত উট, একশত ঘোড়া ও এক হাজার দিনার আপনার আহবানে আল্লাহর রাস্তায় দিলাম।

হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রাদি আল্লাহু আনহু)ঃ ইয়া রাসুলল্লাহ! আপনার এ গোলাম চল্লিশ হাজার দিরহাম পেশ করলাম।

হযরত আবু আকীল (রাদি আল্লাহু আনহু)ঃ আমি একজন গরীব সাহাবী, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার এ দু'সের শুকনো খেজুর গ্রহণ করুণ। হুযূর! আমি সারারাত পানি সেচন করে মুজুরী হিসেবে চার সের শুকনো খেজুর পেয়েছিলাম। দু'সের পরিবারের জন্য রেখে বাকী দু'সের নিয়ে আসলাম।

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)ঃ জাযাকাল্লাহ! আমি তোমার এ উৎসাহ ও অবদানকে সম্মান করছি। যাও, তুমি এ খেজুরগুলোকে সংগৃহিত মুল্যবান জিনিস পত্রের স্তুপের উপর ছিটিয়ে দাও।

ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) মনে মনে ভাবলেন যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আজ তাবুকের যুদ্ধের জন্য দান করার আহবান জানায়ে তাঁর গোলামদেরকে প্রতিযোগিতা মূলক নেককাজ করার সুযোগ দিয়েছেন এবং

গোলামগণ প্রতিযোগিতামূলক ভাবে অংশ গ্রহণ করছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সবসময় হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাদি আল্লাহু আনহু) অগ্রগামী রয়েছেন। এ রকম সুযোগ যখনই এসেছে ছিদ্দিকে আকবরকে অগ্রগামী পাওয়া গেছে, কিন্তু আজ সুবর্ণ সুযোগ, ছিদ্দিকে আকবর এখনো আসেনি। হয়তো এতে অংশ নাও নিতে পারে। তাই আজ এ ক্ষেত্রে ছিদ্দিকে আকবরকে অতিক্রম করা যেতে পারে। এ সব চিন্তা করে হযরত ওমর ফারুক (রাদি আল্লাহু আনহু) ঘরে গেলেন এবং নগদ ও জিনিস পত্রকে দু'ভাগ করে এক ভাগ হুযূরের সমীপে নিয়ে আসলেন। এতে হুযূরকে উৎফুল্ল দেখে হযরত ওমর মনে মনে দারুণ তৃপ্তি বোধ করছিলেন। এ সময় দেখা গেল হুযূরের জন্য উৎসর্গিত ও হেরা গুহার সাথী হযরত আবু বকর ছিদ্দিকও এসে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর ঘরে নগদ ও জিনিস পত্র যা কিছু ছিল সব হুযূরের খেদমতে পেশ করলেন।

এ দৃশ্য দেখে ফারুকে আযম হতবম্ব হয়ে গেলেন এবং মনে মনে বললেন আজও ছিদ্দিকে আকবরের বদান্যতা সবের উর্ধে রইলো। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাঁর গুহার সাথীকে জিজ্ঞেস করলেন, ঘরের জন্য কিছু রেখে আসা হয়েছে কি না? উত্তরে বললেন

پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس
صدیق کے لئے ہے خداکا رسول بس

অর্থাৎ পতঙ্গের জন্য বাতি এবং বুলবুল পাখীর জন্য ফুল যথেষ্ট আর ছিদ্দিকে আকবরের জন্য রসুলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) যথেষ্ট।

এ ভাবে প্রত্যেক সাহাবী হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর আহবানে সানন্দে ও উদারতার সাথে এগিয়ে আসলেন এবং আল্লাহর নবী এ সব আল্লাহওয়ালাদের নিয়ে ত্রিশ হাজার সদস্য বিশিষ্ট একটি বাহিনী গঠন করে তাবুকের উদ্দেশ্যে যাত্রা দেন।

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)ঃ আমাদের কাছে বাহন ও রসদের কমতি রয়েছে। এ ব্যাপারে কোন চিন্তা কর না।

সাহাবায়ে কিরামঃ হুযূর, এ ব্যাপারে আমাদের কোন ভ্রূপেক্ষ নেই। আমরা তো আল্লাহর রেজামন্দি প্রত্যাশী।

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)ঃ আমি প্রতি আঠার জনের জন্য একটি উট নির্ধারিত করছি এবং পানাহারের জন্য......

সাহাবায়ে কিরামঃ হুযূর! আপনি এ ব্যাপারে চিন্তা করবেন না। আমরা যে আল্লাহর পথে বের হয়েছি, প্রয়োজনে গাছের পাতা খেয়ে সামনে এগিয়ে যাব, মুখ ফিরাবো না। তৃষ্ণা লাগলে উটগুলো (যদিওবা বাহনের জন্য আগ থেকে কম ছিল) জবেহ করে পেটের অভ্যন্তরে সংরক্ষিত পানি পান করবো বা রোযা রাখবো। ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি সহীহ সালামত থাকলে, অন্য সব কিছু আমাদের কাছে তুচ্ছ।

এ সফরে সাহাবায়ে কিরামকে ঠিকই গাছের পাতা খেতে হয়েছিল, যার ফলে ওনাদের ঠোঁট ফুলে গিয়েছিল। চলতে চলতে পায়ে ফোসকা পড়েয়েছিল। অনেকের পা ক্ষত বিক্ষত হয়েছিল কিন্তু জোর কদমে এগিয়ে যাওয়া থেকে বিরত হননি। শেষ পর্যন্ত এ অবস্থায় হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ত্রিশ হাজার জান উৎসর্গ্কারীদের নিয়ে সিরিয়ার সীমানায় পৌঁছলেন এবং এক মাস ওখানে অবস্থান করলেন।

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর এ দুঃসাহসিক পদক্ষেপ অর্থাৎ ত্রিশ হাজার মুজাহিদসহ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর তাবুক পৌঁছে যাবার কথা শুনে রোমের বাদশাহ হতবম্ভ হয়ে গেল এবং পরামর্শকদের নিয়ে বৈঠক বসলো।

রোমের বাদশাহঃ এ মুসলমানেরা দেখছি দারুণ দুঃসাহসিক। আমাদের পরিকল্পনার খবর পাওয়া মাত্রই আমাদের দমন করার জন্য তাবুক পৌঁছে গেল।

পরামর্শকঃ আসল কথা হলো ওদের নবী ওদের মধ্যে এমন কিছু অদ্ভুত উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলেছে এবং ওদের মধ্যে এমন দৃঢ় মনোভাব সৃষ্টি করে দিয়েছে যে ওরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করাকে জিহাদ মনে করে এবং এ জিহাদী মনোবল নিয়ে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে, অনেক সময় নিজেরাও আক্রান্ত হয়। ওদের ধারণা মতে কাফিরকে হত্যাকারী গাজী এবং কাফিরদের হাতে মৃত্যুবরণকারী শহীদ হিসেবে বিবেচ্য। ওরা খাদ্য-পানীয় না পেলে রোযা রেখে দেয় এবং যখন পাওয়া যায়, ঈদের আনন্দে পানাহার করে। তাছাড়া ওদের নবী যদি ওদের সাথে থাকে, তাহলে ওরা আরো অধিক উৎসাহ উদ্দীপনা ও সাহসিকাতার সাথে মুকাবিলা করে এবং তাদের নবীর কদমতলে মৃত্যুবরণকে পরম সৌভাগ্য মনে করে।

রোমের বাদশাহঃ তাহলো তো এখন মদীনা আক্রমণ করার পরিকল্পনা মুলতবী করা উত্তম। মুসলমানদের নবীর মৃত্যুর পর আক্রমণ করাটা সমীচীন হবে। ঘোষণা করে দাও, আমরা মদীনা আক্রমনের পরিকল্পনা মুলতবী করলাম।

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) রোমের বাদশাহর পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হওয়ার খবর শুনে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিলেন এবং আল্লাহ ওয়ালাগণের এ পবিত্র বাহিনী তাঁদের প্রিয় আকা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সহ মদীনায় ফিরে আসলেন। (তারিখুল খোলাফা) ৩১ পৃঃ)

সবকঃ সাহাবায়ে কিরাম (রাদি আল্লাহু আনহুম) তাঁদের যাবতীয় দুনিয়াবী আরামকে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ডাকে কুরবানী করে দিতেন এবং পরকালীন শান্তির সন্ধানে নিয়োজিত থাকতেন। তাঁরা আল্লাহর পথে প্রতিটি মুছিবত সহ্য করে এটি প্রমাণ করে গেছেন যে, সত্যিকার মুসলমান আল্লাহর পথে কুরবান হয়ে যাওয়াকে সৌভাগ্য মনে করেন এবং ওনাদের ঈমানী মনোভাবের সামনে দুনিয়াবী কোন সম্পর্ক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। সাহাবায়ে কিরাম এ নেক নিয়ত ও আন্তরিক উদ্দীপনার বদৌলতে দুশমনের উপর সব সময় বিজয়ী হয়েছেন এবং তাঁরা কম সংখ্যক হওয়া সত্বেও অধিক সংখ্যককে পরাভূত করেছেন। এখনো আমাদের উন্নতি ও কামিয়াবী এ নেক নিয়তের উপর নির্ভর করে।

কাহিনী নং ২০৮

ইসলামী ফৌজ

হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) এর খেলাফত কালে মুসলিম ফৌজ বায়তুল মুকাদদস জয় করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন। ওখানকার ইহুদী আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের আগ্রহ অনুসারে হযরত ওমর ফারুক (রাদি আল্লাহু আনহু) স্বয়ং মদীনা মনোয়ারা থেকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে তশরীফ নিয়ে গেলেন। বায়তুল মুকাদ্দসের ইহুদী আলেম ও অন্যান্য জ্ঞানী লোকেরা হযরত ওমর ফারুকের চেহারায় আল্লাহর নূর ও হাকীকতের সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখে তারা নিজেরাই ওনার সমর্থক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের স্বজাতিকে মুসলমানদের উন্নত চরিত্রের কথা স্বীকার করানোর জন্য এ প্রস্তাব দিল যে, আমরা বায়তুল মুকাদ্দসের বড় বাজারকে ইসলামী ফৌজের সম্মানার্থে খুব সুন্দর করে সাজানোর ব্যবস্থা করছি এবং ইসলামী

ফৌজ একদিক দিয়ে প্রবেশ করে অন্যদিক দিয়ে বের হয়ে যাবে। ইসলামী ফৌজ এ প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। ওরা শহরের বড় বাজারকে খুব সুন্দর করে সাজালো, ওখানে সব রকমের জিনিস মওজুদ করলো এবং প্রত্যেক দোকানে এক একজন সুন্দরী রূপসী মহিলাকে বসায়ে দিল। মহিলাদেরকে নির্দেশ দিল যে ইসলামী বাহিনী বাজারে প্রবেশ করে যে জিনিসটার আগ্রহ করবে সে জিনিসটা যেন বিনা মূল্যে দিয়া দেয় এবং ওদের সাথে পর্দাহীন অবস্থায় খোশ আলাপে মেতে উঠে এবং ওদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য চেষ্টা করে। এ সব আয়োজন সমাপ্ত হওয়ার পর মুসলমানদেরকে বলা হলো যে এবার ইসলামী ফৌজকে বাজার অতিক্রম করার নির্দেশ দেয়া হোক।

ইসলামী ফৌজ যখন বাজার অতিক্রম করার জন্য তৈরী হলো, তখন সেনাপতি ওদেরকে লক্ষ্য করে কুরআন পাকের এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন। قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ الخ অর্থাৎ মুমিনগণকে বলে দিন তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি নিচের দিকে রাখে।

এ একটি মাত্র আয়াতের প্রতিফলন এমন হল যে ইসলামী ফৌজ নিচের দিকে নজর রেখে বাজারে প্রবেশ করলো এবং কোন একজন সৈন্যও চোখ তুলে দেখেনি যে এখানে কি ও কে আছে। আল্লাহর ভয়ে ভীত এ বান্দাগণ ইসলামী শানমানের সাথে বাজারের একদিক দিয়ে ঢুকে অন্যদিক দিয়ে বের হয়ে গেলেন। ইসলামী বাহিনীর এ উন্নত চরিত্রের প্রতিফল এটাই হলো যে, শত্রুরা একমত হয়ে কোন যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়া বায়তুল মুকাদ্দস মুসলমানগণকে দিয়ে দিল।(আল ফতুহাত ১২৪ পৃঃ)

সবকঃ সত্যিকার মুসলমানগণ উন্নত চরিত্রবান হয়ে থাকে এবং তারা আল্লাহর নির্দেশাবলী কঠোর ভাবে মেনে চলে এবং তাদের থেকে কখনো অশোভনীয় আচরণ প্রকাশ পায় না। মুসলমানদের বিজয় সমূহ বেশীর ভাগ চারিত্রিক তলোয়ারেরই অবদান।

কাহিনী নং ২০৯

খৃষ্টান পলোয়ান

হযরত ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) যখন খিলাফতের মসনদে আসীন হন, তখন তাঁর খিলাফতের সুনাম ও তাঁর শানমানের কথা পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত পৌঁছে যায়। রোমের বাদশাহ হারকল তাঁর কথা শুনে অস্থির হয়ে গেল এবং এক খৃষ্টান পলোয়ান কে পুরস্কারের লোভ দেখায়ে হযরত ওমরকে হত্যা করার জন্য প্ররোচিত করলো এবং ওকে বললো, তুমি মদীনায় গিয়ে ওমরকে হত্যা করে আসলে, তোমাকে অনেক ধন-দৌলত দেয়া হবে। এ ঘোষণা শুনে সেই খৃষ্টান পলোয়ান মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা দিল। মদীনার কাছে পৌঁছে জানতে পারলো যে মুসলমানদের খলীফা হযরত ওমর ফারুক বিধবা ও ইয়াতীম শিশুদের জায়গা জমীন, বাগান ইত্যাদি দেখাশুনার জন্য তশরীফ নিয়ে গেছেন। এ খৃষ্টান পলোয়ান সেই বাগানে গেল এবং হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) কে দেখে একটু আড়াল হয়ে গাছে উঠে গেল। কিছুক্ষণ পর হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু)ও ঘটনাক্রমে সেই গাছের নীচে তশরীফ আনলেন এবং মাটিতে বসে পরলেন। অতঃপর হাতের উপর মাথা রেখে বিছানা বালিশ ছাড়া শুয়ে পড়লেন। খৃষ্টান পলোয়ান তাঁকে শোয়াবস্থায় দেখে গাছ থেকে নেমে পড়লো এবং তাড়া-তাড়ি তাঁকে হত্যা করার মনস্থ করলো। যে মাত্র তলোয়ার উঠালো তখনই একটি বাঘ তাঁর পায়ের দিকে থেকে আবির্ভূত হলো। বাঘের ভয়ানক আকৃতি দেখে সেই ইহুদী পলোয়ান বেঁহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল এবং বাঘটি তাঁর চার দিকে পাহারা দিতে লাগলো আর তাঁর তলোয়ারটি লেহন করতে লাগলো।

খৃষ্টান পলোয়ানের পড়ে যাবার শব্দে হযরত ওমরের ঘুম ভেঙ্গে গেল এবং চোখ খুলতেই বাঘটা অদৃশ্য হয়ে গেল। হযরত ওমর খৃষ্টান পলেয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? সে বললো, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী বানিয়েছেন। আমি অধম আপনাকে শহীদ করার জন্য এখানে এসেছিলাম। কিন্তু আপনি যখন শুয়ে পড়লেন, আপনার নিরাপত্তার জন্য জংগল থেকে বাঘ এসে গেল। এ কথা শুনে হযরত ওমর চারিদিকে তাকিয়ে বললেন কই এখানে তো বাঘ দেখা যাচ্ছে না। বাঘটি কোন দিকে গেল? এ সময় অদৃশ্য থেকে একটি আওয়াজ আসলো, তুমি আমাদের দীনের হেফাজত করতেছ, আমরা তোমাকে তোমার দুশমনদের থেকে হেফাজত করবো।

এ অদৃশ্য আওয়াজ শুনে ইহুদী পলোয়ান আরও আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল এবং তাঁর হাতদ্বয়ে চুমু দিয়ে আরয করলো,'জনাব, বনের বাঘ আপনার পাহারা দেয় এবং আসমানের ফিরিস্তাগণ আপনার প্রশংসা করেন। তাই আমি আপনার হাতে লা ইলাহা ইলাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ পড়ে কেন মুসলমান হবো না'। এ বলে সেই খৃষ্টান মুসলমান হয়ে গেল। (আলামে ওয়াকেদী ওয়া দুর্রে মনজুর ৪৪ পৃঃ)

সবকঃ হযরত ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর শান অনেক উচ্চ। জংগলের বাঘও তাঁর অনুরক্ত। তিনি দীনের সত্যিকার কাণ্ডারী ছিলেন। এ জন্য তাঁর প্রতি আল্লাহর খাস রহমত ছিল।

কাহিনী নং ২১০

বনের বাঘ

হযরত সফিনা নামে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর এক সাহাবী একদা নৌকা যোগে কোথাও যাচ্ছিলেন। ঘটনাক্রমে নৌকাটি ধাক্কা খেয়ে ভেঙ্গে গিয়েছিল। হযরত সফিনা একটি তক্তা ধরে ভেসে একদিকে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তক্তাটি নদীর কিনারায় এসে লাগলো। হযরত সাফিনা কুলে উঠে একটু সামনে গিয়ে দেখলেন যে গভীর জংগল যেখানে বাঘ ও হিংস্র প্রাণীর বসবাস। একটি বাঘ তাঁকে দেখে দৌড়ে আসলো আক্রমণ করার জন্য। হযরত সফিনা চিৎকার দিয়ে বল্লেন, হে বাঘ, খবরদার! আমি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর গোলাম। এটা শুনা মাত্র বাঘ স্বীয় মাথা নিচু করে নিল এবং হযরত সফিনার কাছে এসে লেজ নাড়তে লাগলো এবং হযরত সফিনাকে ওর পিছে পিছে আসার ইশারা করে এমন এক রাস্তায় এনে পৌছায়ে দিল যেখান থেকে হযরত সফিনা সহীহ সালামতে ঘরে পৌছে গেলেন। (হুজ্জাতুল্লাহে আলাল আলেমীন ৮৭৩ পৃঃ)

সবকঃ সাহাবায়ে কিরামের এমন শান ছিল যে বনের বাঘও তাঁদের সমীহ করতো।

কাহিনী নং ২১১

স্বামী, না ছেলে

একদিন হযরত আলী (কারমাল্লাহু ওয়াজহাহু) ফজরের নামাযের পর স্বীয় খাদেমকে বললেন, অমুক মহল্লায় যাও। ঐ মহল্লায় একটি মসজিদ আছে, মসজিদের পাশে একটি ঘর আছে। ঐ ঘরে একজন মহিলা ও একজন পুরুষ দীর্ঘক্ষণ ধরে ঝগড়া করতেছে। তুমি ওদেরকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো। তাঁর খাদেম ওখানে গেল এবং দেখলো যে ঠিকই এক পুরুষ ও এক মহিলা পরস্পর ঝগড়া করতেছে। খাদেম ওদেরকে বলল, আমার সাথে সাথে চল, তোমাদেরকে হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) ডাকছেন। ওরা দুজনই হযরতের

খেদমতে হাজির হলে তিনি বললেন, আজ সারারাত তোমরা ঝগড়া করলে কেন? পুরুষ লোকটি বললো, হুযূর আমি একে বিবাহ করেছিলাম। কিন্তু যখন এ মহিলা আমার সামনে আসলো, আমার মনে ওর প্রতি ভীষণ ঘৃণা সৃষ্টি হয়েছে। আমার ক্ষমতা থাকলে এ মুহূর্তেই ওকে বের করে দিতাম। ওর প্রতি আমাকে উদাসীন দেখে সে আমার সাথে ঝগড়া শুরু করে দিয়েছে।

হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) দরবারে উপস্থিত সবাইকে বিদায় করে দিয়ে মহিলাটিকে বললেন, যা জিজ্ঞেস করবো সত্য সত্য জবাব দিবে। হে মহিলা, তোমার নাম এই এবং তোমার বাপের নাম এই নয় কি? মহিলা বললো, ঠিকই বলেছেন। তিনি (রাদি আল্লাহু আনহু) আরও বললেন, এক রাত্রে তুমি ঘর থেকে বের হয়েছিলে। তোমার চাচাতো ভাই তোমাকে ধর্ষন করেছিল। এতে তুমি গর্ভিত হয়েছিলে। তুমি ও তোমার মা এ গর্ভধারণকে গোপন রেখে ছিলে। যখন তোমার প্রসব ব্যদনা শুরু হয়, তখন তোমার মা তোমাকে অন্যত্র নিয়ে যায়। ওখানে তোমার একটি ছেলে জন্ম হয়। তুমি সেই শিশুকে কাপড়ে জড়ায়ে ঘরের বাইরে নিয়ে গিয়ে রেখে এসেছিলে। একটি কুকুর সেই শিশুর কাছে আসলো, তোমার মা কুকুরকে তাড়ানোর জন্য একটি পাথর নিক্ষেপ করেছিল কিন্তু সেই পাথর কুকুরের গায়ে না পড়ে শিশুর মাথায় গিয়ে পড়েছিল। এতে শিশুর মাথা ফেটে গিয়ে ছিল। তোমার মা নিজের উড়না ছিঁড়ে শিশুর মাথায় বেঁধে দিয়েছিল। অতঃপর তোমরা শিশুকে ওখানে ফেলে চলে এসেছিলে। এর পর তোমাদের কাছে সেই শিশুর কোন খবর ছিল না। এ ঘটনাটা ঠিক নয় কি? মহিলা আশ্চর্য হয়ে বললো, জনাব একেবারে সঠিক।

এর পর হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) পুরুষ লোকটাকে বললেন, তুমি তোমার মাথার কাপড় সরায়ে ওকে দেখাও। সে মাথার কাপড় সরায়ে দেখালো। মাথায় সেই আঘাতের লক্ষণ বিদ্যমান ছিল। তিনি (রাদি আল্লাহু আনহু) মহিলাকে বললেন। হে মহিলা, এ তোমার স্বামী নয় বরং তোমার ছেলে। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দ্বিতীয় বারের হারাম থেকে রক্ষা করেছেন। এখন তুমি তোমার ছেলেকে নিয়ে চলে যাও। (শাওয়াহেদুল নবুয়াত ১৬১ পৃঃ)

সবকঃ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বদৌলতে তাঁর গোলামদের মধ্যে এমন অদৃশ্য জ্ঞান ছিল যে অনেক দিন আগের লুকায়িত রহস্যের বিষয়েও ওনারা জেনে নিতেন। তাই স্বয়ং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর কাছে কোন বিষয় কি করে অদৃশ্য থাকতে পারে?

কাহিনী নং ২১২

হযরত মুসাইব ও আম্মার (রাদি আল্লাহু আনহুমা)

হযরত মুসাইব ও আম্মার (রাদি আল্লাহু আনহুমা) উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর খেদমতে হাজির হলেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তখন হযরত আরকম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর ঘরে তশরীফ রেখে ছিলেন। ওনারা আলাদা আলাদা ভাবে হুযূরের খেদমতে হাজির হওয়ার উদ্দেশ্য রওয়ানা হয়েছিলেন কিন্তু ঘটনাক্রমে উভয়ে একই সময় দরজার সামনে উপস্থিত হন। একে অপর থেকে জানতে পরলেন যে উভয়ের উদ্দেশ্য এট অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ এবং হুযূরের ফয়েজ দ্বারা উপকৃত হওয়া। উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং ইসলাম গ্রহণে কাফিরেরা তৎকালীন দুর্বল মুসলমানদের সাথে যা করা করতো, তা হলো । ওদেরকে সব ধরনের লাঞ্চনা ও কষ্ট দিতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত তাঁরা হিজরত করার মনস্থ করলেন কিন্তু কাফিরদের কাছে এটাও অসহনীয় ছিল যে ওনারা অন্যত্র গিয়ে আরামে বসবাস করুক। এ জন্য কারো হিজরত করার খবর জানতে পারলে ওনাকে ধরার জন্য চেষ্টা করতো যেন দুর্ভোগ থেকে নাজাত না পায়। তাই ওনাদেরও পিছু নিল এবং একটি গ্রুপ ওনাদেরকে ধরতে গেল। ওনারা তীরের ঝুলিটা সামলে নিল। হযরত মুসাইব ওদেরকে বললো তোমরা জান, আমি দূর থেকে তীর নিক্ষেপনে অধিক পারদর্শী। যতক্ষণ পর্যন্ত আমার কাছে একটি তীরও থাকবে ততক্ষণ তোমরা আমার কাছে ঘেঁষতে পারবে না। তীর শেষ হয়ে গেলে তলোয়ার দ্বারা মুকাবিলা করবো। শেষ পর্যন্ত তালোয়ারও হাত ছাড়া হয়ে গেলে তখন তোমরা যা খুশী তা করতে পারবে। তবে তোমরা চাইলে আমার জানের বদলে আমার সম্পদের ঠিকানা বলে দিতে পারি যেটা মক্কায় রয়েছে। ওরা এতে রাজি হয়ে গেল এবং হযরত মুসাইব স্বীয় সম্পদের ঠিকানা বলে দিয়ে নিজের জান রক্ষা করলেন এবং পুনরায় হুযূরের খেদমতে হাজির হলেন। হুযূর তখন কুবায় অবস্থান করছিলেন। ওনাকে দেখে হুযূর ফরমালেন, মুনাফার ব্যবসা করেছ। (আসাদুল গাবা ও হেকায়াতে সাহাবা ১৬ পৃঃ)

সবকঃ সাহাবায়ে কিরাম (রাদি আল্লাহু আনহুম) এর কাছে নিজেদের জানমাল ও দুনিয়ার প্রত্যেক কিছু থেকে ইসলাম অধিক প্রিয় ছিল। ওনারা সব কিছু কুরবান করে ইসলামকে আপন করে নিয়েছেন এবং এতে তাঁরা সব সময় লাভবান হয়েছেন।

কাহিনী নং ২১৩

দূর্গ মাটিতে ধসে গেল

মুসলিম বাহিনী ইস্কন্দরীয়া শহর আক্রমণ করেছিল। ইস্কান্দরীয়ার বাদশাহ নিজেই এ যুদ্ধে উপস্থিত ছিল। সে খুব জোরালোভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করছিল। কাফিরেরা এক বড় মজবুত দুর্গের মধ্যে ছিল এবং মুসলমানেরা দুর্গের সামনে খোলা ময়দানে ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। দীর্ঘ দিন ধরে যুদ্ধ চলতে রইলো কিন্তু কাফিরেরা মজবুত দুর্গের মধ্যে অবস্থানের কারণে পরাজিত হলো না এবং ওদের কোন ক্ষতিও হলো না। একদিন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত শরহবীল বিন হাসনা (রাদি আল্লাহু আনহু) কাফিরদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে কাফিরেরা! আমাদের মধ্যে এ সময় আল্লাহর এমন প্রিয় বান্দাও আছেন যিনি এ দুর্গের দেয়ালকে যদি বলেন, মাটিতে ধসে যাও, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এ দূর্গ মাটিতে ধসে যাবে- এ বলে তিনি স্বীয় হাত দুর্গের দিকে উঠালেন এবং মুখে নারায়ে তাকবীর বললেন এবং হাতে দুর্গের প্রাচীর মাটিতে ধসে যাবার ইশারা করলে সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ দুর্গ যেটা খুবই মজবুত ও শক্ত ছিল মাটিতে ধসে গেল এবং সমস্ত কাফির যারা দুর্গের মধ্যে ছিল, মুহূর্তের মধ্যে নিজেদেরকে খোলা মাঠে দেখতে পেল। ইস্কান্দরীয়ার বাদশাহ এ ঘটনা দেখে হতবাক হয়ে গেল এবং তার দলবল সহ শহর ছেড়ে পালিয়ে গেল এবং শহরটি মুসলমানদের দখলে এসে গেল। (সেরাতুস সালেহীন ২২পৃঃ)

সবকঃ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি মহব্বত ও তাঁর আনুগত্যের বদৌলতে সাহাবায়ে কিরাম (রাদি আল্লাহু আনহুম) সৃষ্টি কুলের উপর হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। তাঁরা আল্লাহর হয়ে গিয়ে ছিলেন এবং আল্লাহ তাঁদের সহায়ক ও সাহায্যকারী ছিলেন। এখনও আমরা খোদার হয়ে গেলে খোদার সমস্ত খোদায়ী আমাদের হয়ে যাবে।

কাহিনী নং ২১৪

ফেস্‌তাতের দূর্গ

ইসলামী বাহিনী হযরত আমর বিন আসের নেতৃত্বে যখন মিসরের দিকে যাত্রা দিলেন এবং ছোট ছোট এলাকা জয় করে ফেস্‌তাত পৌছে ফেসতাতের দূর্গ অবরোধ করলেন, তখন মিসরীরা নিজেদের হেফাজতের উদ্দেশ্যে দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিল। দূর্গটি খুবই মজবুত ছিল। এদিকে মুসলমানদের

কাছে আসবাব পত্র ও সৈন্য সামন্ত কম ছিল। তাই খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) এর কাছে পুনরায় সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। হযরত ওমর দশ হাজার সৈন্য এবং চার জন কমান্ডার সাহায্যের জন্য পাঠালেন এবং এ ভাবে একটি চিঠি লিখে দিলেন যে, এ চার জন কমান্ডার প্রত্যেকে এক হাজার ঘোড়সওয়ারীর সমতুল্য। যখন এ সাহায্যকারী বাহিনী ফেসতাতে পৌছলো, তখন হযরত আমর বিন আস (রাদি আল্লাহু আনহু) হযরত জুবাইরের উপযুক্ততার কথা বিবেচনা করে ওনাকে অবরোধকারীদের কমান্ডার বানিয়ে দিলেন। হযরত জুবাইর (রাদি আল্লাহু আনহু) ঘোড়ায় আরোহণ করে দূর্গের চারিদিকে চক্কর দিলেন এবং যে সব জায়গায় সৈন্য নিয়োগ প্রয়োজন মনে করলেন ওখানে সৈন্য নিয়োগ করলেন। এভাবে সাত মাস দূর্গ অবরোধ করে রাখা হলো কিন্তু জয় পরাজয়ের কোন ফয়সালা হলো না। শেষ পর্যন্ত একদিন হযরত জুবাইর উত্তেজিত হয়ে বললেন আজ আমি ইসলামের জন্য উৎসর্গিত হচ্ছি। এটা বলার পর দূর্গের দেয়ালে একটি সিঁড়ি লাগায়ে উপরে উঠে উচ্চ স্বরে নারায়ে তাকবীর দিলেন। এ দিকে দূর্গের প্রধান দরজায় অবস্থানরত সৈন্যরাও এমন জোরে নারায়ে তাকবীর বললেন যে সমগ্র দূর্গ কেঁপে উঠলো। দূর্গবাসীরা মনে করলো মুসলমানেরা দূর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে এবং ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এদিক সেদিক পালাতে লাগলো। সুযোগ বুঝে হযরত জুবাইর নীচে নেমে দূর্গের দরজা খুলে দিলেন এবং সম্পূর্ণ মুসলিম বাহিনী ভিতরে ঢুকে পড়লেন। স্বর্গের লোকেরা ইতোমধ্যে এদিক সেদিক পালিয়ে গেল। শহরের প্রশাসক মকুকস নিরাপত্তার আবেদন করলে নিরাপত্তা দেয়া হলো। এভাবে বুদ্ধিমত্তা ও বীরত্বের সাথে শাক্তিশালী দূর্গ মুসলমানগণ দখল করে নিলেন। (তারিখে ইসলাম)

সবকঃ সাহাবায়ে কিরাম (রাদি আল্লাহু আনহুম) আল্লাহর রাস্তায় জান বিসর্জন দিতে দ্বিধাবোধ করতেন না। এ জজবা নিয়ে তাঁরা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন। আজ যারা আল্লাহর রাস্তায় একটি ছাগল কুরবানী করতে প্রস্তুত নয়, নানা বাহানার আশ্রয় নেয় এবং কুরবানীর বিপক্ষে লেখালেখি করে, তারা নামসর্বস্ব মুসলমান ছাড়া আর কি হতে পারে।

কাহিনী নং ২১৫

এক জানবাজ মুজাহিদ

হযরত খালেদ ও হযরত আবু ওবাইদা ইবনুল জরাহ (রাদি আল্লাহু আনহুমা) এর নেতৃত্বে ইসলামী মুজাহিদ চারিদিকে বিজয় কেতন উড়াচ্ছিলেন, সাম্রাজ্যবাদী

শাক্তিগুলোর কোমর ভেঙ্গে গিয়ে ছিল। তারা চল-চাতুরীর মাধ্যমে মুসলমানদের মুকাবেলা করছিল। এ জয় জয়কার সময়ে রোমের একটি দল মুসলমানদের কিছু মহিলাকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল। বন্দীকৃত মহিলাদের মধ্যে হযরত যেরার বিন আযদরের বোন খাওলা বিনতে আযদরও ছিল। যখন হযরত যেরার জানতে পারলেন যে রোমানরা মুসলমান মহিলাদের বন্দী করে নিয়ে গেছে, তখন তিনি হযরত খালেদের খেদমতে হাজির হলেন। হযরত খালেদ বললেন ভয়ের কোন কারণ নেই। শিকারকে হাতছাড়া করনা। তিনি সঙ্গে সঙ্গে হযরত আবু উবাইদা ইবনুর জরাহকে দু'হাজার সৈন্য নিয়ে দুশমনের মুকাবেলায় পাঠালেন এবং নিজে হযরত যরার ও কয়েকজন মুজাহিদকে সাথে নিয়ে বন্দীকৃত মহিলাদের উদ্ধার করার জন্য রওয়ানা হলেন। কিছু দূর যাবার পর ইসতিরইয়াকের কাছাকাছি ধূলেবালি উড়তে দেখলেন। হযরত খালেদ বললেন, আল্লাহ যা করেন ভাল করেন। তাঁর অগ্রগামী দলের প্রধান হবিরা বললেন, রোমানদের অবশিষ্ট বাহিনী মনে হচ্ছে। হযরত খলিদ নির্দেশ দিলেন সমস্ত মুজাহিদগণ যেন মুকাবিলার জন্য তৈরী থাকে।

এদিকে ওসব মহিলাদের কথা শুনুন, যাদেরকে বতরস বন্দী করে ছিল। বতরস হচ্ছে বুলসের ভাই, যাকে মুসলমাগণ বন্দী করেছিল। বতরস মুসলিম মহিলাগণ ও লুণ্ঠিত জিনিস পত্র নিয়ে যখন এসতিরাকের কাছে পৌছলো তখন স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেললো এবং বন্দীকৃত মহিলাদেরকে ওর সাম্নে হাজির করার নির্দেশ দিল। যখন মহিলাদেরকে হাজির করা হলো, তখন সে সব মহিলাকে ভাল করে দেখলো। তার কাছে হাওলাই পছন্দ হলো এবং ঘোষণা করলো, হাওলার একক অধিকারী আমি, অন্য কেউ যেন ওর প্রতি দৃষ্টি না দেয়। এভাবে প্রত্যেকে নিজের জন্য এক এক মহিলা মনোনিত করে নিল।

লজ্জাবতী মুসলিম মহিলাদের কাছে এ আচরণ খুবই অসহ্যনীয় ছিল এবং রাগে কাঁপছিল। কিন্তু অবস্থার পরিপেক্ষিতে নিশ্চুপ রইলো। পুনরায় ওনাদেরকে যখন তাবুতে পৌছায়ে দেয়া হলো তখন হযরত হাওলা সব মহিলাকে একত্রিত করে জ্বালাময়ী ভাষায় বললেন, হে সম্মানিতা মহিলাগণ! আপনারা কি চান, রোমের হায়েনারা আপনাদেরকে ভোগ বিলাসের উপকরণে পরিণত করুক? আপনারা কি এটা পছন্দ করবেন যে, বাকী জীবন কাফিরদের সেবায় নিয়োজিত হয়ে বীর আরবের কপালে কলংকের চিহ্ন স্থাপন করতে? আপনাদের সেই বীরত্ব ও বাহাদুরী আজ কোথায় যেটার বদৌলতে আরববাসী সদা সমুন্নতশীর ছিল? আমার মতে রোমানদের হাতে জিল্লাতি পৌহানো থেকে আল্লাহর রাস্তায় আমাদের ক্ষুদ্র জানকে উৎসর্গ করাটা অনেক উত্তম হবে এবং আমাদের জাতিকে চির দিনের বদনামী

থেকে রক্ষা করা যাবে।

তাঁর এ বক্তব্যের উপর গছিরা নামী এক মহিলা সমস্ত মহিলাদের পক্ষে বললেন, আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা যে আমাদের রক্তের শেষ বিন্দু পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় প্রবাহিত হোক। কিন্তু বিনা কৌশলে কিছু করাটা হচ্ছে নিজেদেরকে অনর্থক ধ্বংস করা। কারণ আমরা হলাম নিরস্ত্র।

হযরত হাওলা (রাদি আল্লাহু আনহা) বললেন, হ্যাঁ আমরা নিরস্ত্র। তবে আমরা আল্লাহর সাহায্যের প্রত্যাশী। তাবুর খুঁটিগুলো খুলে নিয়ে এসব কাপুরুষকে আক্রমণ কর। আল্লাহ হয়তো সাহায্য করে আমাদের বিজয়ী করবেন অথবা আমরা সসম্মানে আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে যাব।

এটা শুনামাত্র সমস্ত মহিলাগণ তাবুর খুঁটি নিয়ে এক সঙ্গে আক্রমণ করলো এবং সবাইকে বলা হচ্ছিল যেন সবাই এক জোট হয়ে থাকে কেননা জোট থেকে বিচ্ছিন্ন হলে ওদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া মুশকিল হবে। হযরত হাওলা (রাদি আল্লাহু আনহা) এক রোমানের মাথার উপর এমন জোরে আক্রমণ করলেন যে এতে সে বেহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। বতরস নির্দেশ দিল, সব মহিলাকে ঘিরে ফেল, তবে হাওলার সাথে যেন ভাল ব্যবহার করা হয়।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন যে, যখনই রোমানদের কোন ঘোড়সওয়ারী ওদের প্রতি এগিয়ে আসতো, ওরা ক্ষুধার্ত বাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে পরতো এবং ওকে নাস্তনাবুদ করে ছাড়তো। হযরত হাওলা বলছিলেন, হে রোমানগণ! আজ তোমাদের চরম পরিণতি হবে। তোমাদের স্ত্রীগণ বিধবা এবং সন্তাগণ ইয়াতিম হবে। আজ তোমাদের আয়ুস্কাল শেষ হয়ে গেছে। এ কথা শুনে বতরস রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল এবং স্বীয় বাহিনীকে সম্বোধন করে বললো, তোমাদের লজ্জা লাগেনা? মাত্র কয়েকজন মহিলাকে তোমরা কাবু করতে পারতেছনা। এটা শুনে অনেক সৈন্য খুবই জোরালো ভাবে এক সাথে আক্রমণ করলো। মুসলিম মহিলাগণও সাহসিকতার সাথে এর মুকাবিলা করলো। হযরত হাওলা মুসলিম মহিলাদের উৎসাহিত করে বলছিলেন, হে বীর মুজাহিদগণের মা-বোনেরা! আল্লাহ তাআলা তোমাদের পরীক্ষা নিচ্ছেন, তোমরা ভয় করোনা।

এভাবে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে হযরত খালিদ স্বীয় সহযোগিদের নিয়ে বন্দী মহিলাদের সন্ধানে ইসতিরইয়াকের কাছাকাছি এসে পৌঁছলেন এবং ধূলিবালি উড়তে ও তলোয়ারের চমকানি দেখে বললেন আমাদের খুব তাড়াতাড়ি ওখানে পৌঁছা দরকার। তাই তাঁরা খুব দ্রুতবেগে ঘোড়া হাঁকায়ে ওখানে পৌছলেন এবং এ

দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে গেলেন।

বতসর যখন দেখলেন যে, ইসলামী বীর মুজাহিদরা এসে পৌছেছে, তখন সে পালিয়ে জান বাচাঁতে চাইলো এবং কপটতা মুলক মুসলমানদের প্রতি সহানুভুতির ভান করে বললো তোমাদের মা বোনদেরকে নিয়ে যাও। হযরত যেরার তার এ কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে এগিয়ে গিয়ে জোড়ালো ভাবে আক্রমণ করে ওকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন এবং ওদের পুরা বাহিনী গ্রেপ্তার করলেন। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন যে, এ যুদ্ধে মহিলাগণ বেশ আহত হয়েছিল তবে প্রায় ত্রিশজন কাফিরকে হত্যা করেছিলেন।(তারিখে ইসলাম)

সবকঃ তৎকালীন মুসলমান পুরুষগণের সাথে সাথে মুসলিম মহিলাগণও জিহাদের জজ্‌বা রাখতেন। কাফিরদের আক্রমণ যখন মাথার উপর এসে পৌছতো, তখন ইজ্জত-সম্মান ও দীন রক্ষার্তে মুসলিম মহিলাগণও বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাফিরদেরকে পরাভূত করতেন। যে জাতির মহিলারা দুশমনের মুকাবিলায় তাবুর খুঁটি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, আজ সেই জাতির পুরুষেরা কাফিরদের খেলার পুতুলে পরিণত হয়েছে।

কাহিনী নং ২১৬

জিহাদী মাতা

হযরত খুনসা (রাদি আল্লাহু আনহা) আরবের প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তিনি তাঁর গোত্রীয় কয়েকজন লোকের সাথে মদীনা মনোয়ারা এসে মুসলমান হয়েছিলেন। হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) এর খেলাফত কালে কাদেসীয়া যুদ্ধে তিনি তাঁর চার সন্তানসহ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধের আগেরদিন তিনি তাঁর ছেলেদেরকে অনেক উপদেশ দিলেন এবং যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য অনুপ্রাণিত করলেন। তিনি বললেন, আমার প্রিয় পুত্ররা! তোমরা নিজেদের খুশিতে মুসলমান হয়েছ এবং নিজেদের ইচ্ছায় জন্মভূমি ত্যাগ করে মদীনায় এসেছ। সেই জাতে পাকের কসম, যিনি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই। তোমরা এক মা, এক পিতার সন্তান। আমি তোমাদের পিতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। তোমাদের শরাফতের কোন বরখেলাপ কোন কিছু করিনি এবং তোমাদের বংশ মর্যাদার কোন ক্ষতি করিনি। তোমরা নিশ্চয় জান যে আল্লাহ তাআলা মুজাহিদদের জন্য কত বড় ছওয়াব রেখেছেন। তোমরা এটাও স্মরণ রাখিও যে চিরস্থায়ী পরকালীন জীবন, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াবী জিন্দেগী থেকে অনেক উত্তম। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমানঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوْا اللّٰه لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْن– অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! ধৈর্যধারণ কর এবং ধৈর্যের সাথে দুশমনদের অগ্রগামী থেকো এবং সীমান্তে ইসলামী রাষ্ট্রের পাহারা দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর যাতে কৃতকার্য হও।

অতএব কাল সকালে তোমরা যখন সহীহ সালামতে ঘুম থেকে উঠবে তখন খুবই সতর্কতার সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিও এবং দুশমনের মুকাবিলায় আল্লাহর সাহায্য কামনা করে এগিয়ে যেতে থাকো এবং যখন দেখবে যে খুব জোরে শোরে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে এবং এর উত্তাপে অগ্নিশিখা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে, তখন সেই উত্তপ্ত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়িও এবং কাফিরদের সরদারদের সাথে মুকাবিলা করিও। ইনশাল্লাহ জান্নাতে ইজ্জত সম্মানে থাকবে।

পরদিন সকালে যখন যুদ্ধ শুরু হলো তখন হযরত খুনসা (রাদি আল্লাহু আনহা) এর চার সন্তানের মধ্যে থেকে ক্রমান্বয়ে এক এক করে এগিয়ে যাচ্ছিল এবং স্বীয় মায়ের উপদেশমূলক কথাগুলো আবৃতি করে উল্লাসিত হচ্ছিল। যখন একজন শহীদ হয়ে যেত, তখন অন্যজন এগিয়ে যেত এবং শহীদ হওয়ার আগ পর্যন্ত লড়তে থাকতো। শেষ পর্যন্ত চার জনই শহীদ হয়ে গেল । যখন মায়ের কাছে ওদের শহীদ হয়ে যাওয়ার খবর পৌঁছলো, তখন তিনি বললেন আল্লাহর শোকর তিনি ওদের শাহাদতের দ্বারা আমাকে মর্যাদা দান করলেন। আমি আল্লাহ পাকের কাছে আশাবাদী যে তাঁর রহমতের ছায়া তলে আমার চার সন্তানের সাথে আমিও স্থান পাব। (আসদুল গাবা ও হেকায়াতে সাহাবা ১০৯পৃঃ)

সবকঃ সাহাবায়ে কিরামের আম্মাগণও জিহাদী জজবা ধারিণী ছিলেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নজরে করমে পবিত্র মহিলাগণও আল্লাহর রাস্তায় তাঁদের সব কিছু উৎসর্গকারিণী হয়ে গিয়েছিলেন। সন্তানের প্রতি মায়েদের খুবই মহব্বত থাকে। কিন্তু হযরত খুনসা (রাদি আল্লাহু আনহা) বাস্তবে দেখিয়ে দিলেন যে, সত্যিকার মুসলিম মহিলার অন্তরে সন্তানদের থেকেও অধিক মহব্বত আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি হয়ে থাকে এবং এটাও প্রমাণ করে দিলেন যে সত্যিকার মুসলিম মায়েদের স্বীয় সন্তানদের সম্পর্কে এ আকাংখা হয়ে থাকে যে আমার সন্তানেরা যেন ইবাদত ও শাহাদতের ঝাণ্ডাবাহী হয়। যৌবনকালটা ইবাদত এবং শাহাদতের মাধ্যমে যেন সমাপ্ত হয়।

কাহিনী নং ২১৭

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ফুফু

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ফুফু ও হযরত হামযা (রাদি আল্লাহু আনহু) এর আপন বোন হযরত ছুফিয়া (রাদি আল্লাহু আনহা) এর বয়স হয়েছিল প্রায় ষাট বছর । খন্দকের যুদ্ধের সময় হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সমস্ত মহিলাদেরকে একটি কিল্লার মধ্যে এনে রেখে ছিলেন এবং হযরত হাস্সান বিন ছাবেত (রাদি আল্লাহু আনহু) কে ওনাদের দেখা শুনার জন্য নিয়োজিত করে সাহাবায়ে কিরাম সহ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) মদীনার বাইরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। ইহুদীরা এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করলো। ওদের একটি গ্রুপ মহিলাদের আক্রমন করার মনস্থ করলো। এক ইহুদী অবস্থা অবলোকন করার জন্য কিল্লার কাছে আসলো। হযরত ছুফিয়া (রাদি আল্লাহু আনহা) ওকে দেখে ফেলেন এবং হযরত হাস্সানকে বললেন, এক ইহুদী আমাদের অবস্থা অবলোকন করার জন্য এসেছে আপনি কিল্লা থেকে বের হয়ে ওকে মেরে ফেলুন।

হযরত হাস্সান (রাদি আল্লাহু আনহু) খুবই দুর্বল ছিলেন এবং দুর্বলতার কারণে বের হতে পারলেন না। তখন হযরত ছুফিয়া তাবুর একটি খুঁটি হাতে নিয়ে নিজে বের হয়ে সেই ইহুদীর মাথা ফেটে দিলেন। অতঃপর কিল্লার অভ্যন্তরে এসে হযরত হাস্সান (রাদি আল্লাহু আনহু) কে বললেন সেই ইহুদী পুরুষ অমুহরেম হওয়ার কারণে আমি ওর জিনিস পত্র ও কাপড় খুলে নিতে পারিনি। আপনি গিয়ে ওর কাপড় খুলে নিন এবং মাথা কেটে নিন। হযরত হাস্সান (রাদি আল্লাহু আনহু) স্বীয় দুর্বলতার কারণে সাহস করতে পারেননি। অগত্যা হযরত ছুফিয়া পুনরায় কিল্লার বাইরে গিয়ে ওর মাথা কেটে নিয়ে এসে কিল্লার দেয়ালে উঠে ইহুদীদের আস্তানায় নিক্ষেপ করলেন। ইহুদীরা তাদের গুপ্তচরের খন্ডিত মস্তক দেখে চমকে উঠলো এবং তারা বলাবলি করতে লাগলো যে আমরা ভুল বুঝেছি, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) মহিলাদেরকে একাকী রেখে যান নি। নিশ্চয় ওদের দেখা শুনার জন্য কিল্লার অভ্যন্তরে পুরুষও মওজুদ আছে। (কনজুল উম্মাল ২৭৮পৃঃ ৫জিঃ)

সবকঃ মুসলিম মহিলাদের ইজ্জত সম্মান রক্ষার্থে প্রয়োজনে মহিলারা আক্রমাণকারীর মুকাবিলায় এগিয়ে আসতে পারে।

কাহিনী নং ২১৮

ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) এর কন্যাগণ

যে রাত্রে ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাথে হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন, তিনি (রাদি আল্লাহু আনহু) এ ধারণা করে তাঁর সমুদয় টাকা পয়সা সাথে নিয়ে নিয়েছিলেন যে, হয়তো পথে প্রয়োজন হতে পারে। তা ছাড়া হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)ও সাথে রয়েছেন। তাঁর কাছে পাঁচ হাজার দিরহামের মত ছিল। তিনি সব সাথে নিয়েনিলেন। হযরত ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) এর আব্বাজান তখন অন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং তখনও মুসলমান হননি। তিনি যখন জানতে পারলেন যে আবু বকর, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাথে মক্কা ত্যাগ করে চলে গেছেন এবং টাকা পয়সা যা ছিল তাও সাথে নিয়ে গেছেন, তখন নাতনীদের কাছে এসে চিন্তিত মনে বলতে লাগলেন, আবু বকরতো বড় অন্যায় করলো, নিজেও চলে গেল এবং টাকা পয়সাগুলোও সব নিয়ে গেল। ছিদ্দিকে আকবরের কন্যা হযরত আসমা (রাদি আল্লাহু আনহু) তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হয়ে ছোট ছোট কংকর সংগ্রহ করে একটি থলিতে ভরে দাদাজানের কাছে এসে বললেন, দাদাজান আপনি চিন্তা করছেন কেন আব্বাজান তো টাকা পয়সা রেখে গেছেন- এ বলে কংকরের থলিটা দাদার সামনে দিলেন। দাদা ওটার উপর হাত দিয়ে মনে করলেন যে, থলি ভর্তি দেরহাম রয়েছে। তাই আশ্বস্থ হলেন এবং বললেন যাক, সে চলে গেলেও টাকা পয়সা রেখে গেছে। (মসনদে ইমাম আহমসদ ৩৫০ পৃঃ ২জিঃ)

সবকঃ সাহাবায়ে কিরামের ছেলে মেয়েদের মনেও আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি অসীম মহব্বত ছিল। আল্লাহ ও রসুলের মুকাবিলায় দুনিয়ার কোন ধন সম্পদের পরওয়া করতেন না।

কাহিনী নং ২১৯

হযরত মায়ুজের কন্যা

হযরত মায়ুজ (রাদি আল্লাহু আনহু) আবু জেহেলের হত্যাকারীদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর কন্যা হযরত রুবী (রাদি আল্লাহু আনহা) এর ঘরে একদিন এক আতর বিক্রেতা মহিলা আসলো এবং কথা প্রসঙ্গে জানতে পারলো যে এটা আবু জেহেলের হত্যাকারী হযরত মায়ুজের কন্যার ঘর। এটা জানার পর আতর বিক্রেতা অমুসলিম

মহিলাটি হযরত রুবিকে লক্ষ্য করে বললো, তুমি তাহলে তারই কন্যা যে নিজেদের সরদারকে হত্যা করেছে? এ কথা শুনে হযরত রুবির রাগ আসলো এবং বললো আমি তাঁরই কন্যা যে স্বীয় গোলামকে হত্যা করেছে। আতর বিক্রেতা মহিলা এ কথা শুনে সেও রাগান্বিত হলো এবং বললো তুমি একজন সরদারকে গোলাম বললে। তাই তোমার কাছে আতর বিক্রি করাটা আমার জন্য হারাম। হযরত রুবিও বললেন, তুমি একজন গোলামকে সরদার বলেছ, তাই তোমার কাছ থেকে আতর খরিদ করাটা আমার জন্যও হারাম। আমি তোমার আতর ভিন্ন অন্য কোন জিনিসে এ রকম দূর্গন্ধ দেখি নি।

সবকঃ পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে প্রত্যেক সাহাবীদের মনে এ রকম দীনি জজবা ছিল যে তাঁদের কাছে দীনের শত্রুদের নামের সাথে সরদার শব্দটা শুনাটাও অসহ্যনীয় ছিল। কিন্তু আজকাল ইসলামের জঘন্য দুশমনদেরকে এর থেকেও আরও উচ্চস্তরের শব্দ দ্বারা সম্বোধন করা হয়। ইসলামের সেই জজবা আজ আমাদের মধ্যে নেই।

কাহিনী নং ১২০

গাজী ও নামাযী

মুসলিম বাহিনী যখন মিসর জয় করছিলেন তখন কবতীদের বাদশাহ স্বীয় বাহিনীর কমান্ডারকে বললো, আমি শুনেছি যে মুসলমানেরা জুমার দিনকে খুবই সম্মান করে এবং খুবই গুরুত্ব সহকারে জুমার নামায আদায় করে। জুমার দিন ঘনিয়ে এসেছে, তোমারা তোমাদের সৈন্যদেরকে নির্দেশ দাও যেন চার হাজার নওজোয়ান সৈন্য সুসজ্জিত হয়ে পাহাড়ের আড়ালে লুকায়ে থাকে । যে সময় মুসলিম বাহিনী জুমার নামায পড়ার জন্য দাঁড়াবে তখন তারা যেন অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে। এ নির্দেশ পেয়ে কমান্ডারগণ চার হাজার সৈন্য পাহাড়ের পিঁছনে লুকায়ে কয়েকজন গুপ্তচরকে এ দায়িত্ব দিল যে মুসলিম বাহিনী যখন নামাযের সিজদায় যাবে তখন সঙ্গে সঙ্গে এসে যেন খবর দেয়া হয়।

যখন সাহাবায়ে কিরাম জুমার নামায পড়ার জন্য দাঁড়ালেন তখন গুপ্তচরেরা গিয়ে খবর দিল যে, মুসলিম বাহিনী রুকু থেকে উঠে সিজদায় গেছে। কাফির বাহিনী তলোয়ার নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং অগনিত মুসলিমকে সিজদারত অবস্থায় শহীদ করে ফেললো এবং অনেককে আহত করলো। কিন্তু তাঁরা খোদা প্রেমে এত বিভোর ছিলেন যে, তলোয়ার দ্বারা হত্যা করা হচ্ছিল কিন্তু ওনারা

ধীরস্থির ভাবে নামাজ পড়তে রইলেন। তাঁদের হুযূরী কলবে (একাগ্রচিত্তে) কোন পার্থক্য আসলো না। এ ভাবে একাগ্রচিত্তে দ্বিতীয় রাকাত পড়ার পর সালাম ফিরায়ে আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিয়ে চারিদিক থেকে কতবীয় সৈন্যদেরকে ঘিরে ফেললেন এবং মুহূর্তের মধ্যে সবাইকে হত্যা করে ফেললেন। চার হাজার সৈন্যের মধ্যে একজনও জীবিত ছিল না। (মগাজী ইবনে ইসহাক ২১৬ পৃঃ)

সবকঃ মুসলমান নামাযীও এবং গাজীও। তারা ইবাদতকারী ও জিহাদকারীও। আজকাল কতেক লোককে নামায পড়তে বলা হলে ওরা বলে যে, আমরা গাজী আমাদের জন্য নামাজের কোন প্রয়োজন নেই। অথচ এটা ওদের ভ্রান্ত ধারণা। উল্লেখিত ঘটনায় আমরা দেখতে পেলাম যে সাহাবায়ে কিরাম জিহাদের ময়দানেও জুমার নামাজ ত্যাগ করেন নি এবং এটা প্রমাণ করেদিয়েছেন যে মুসলমানগণ নামাযীও এবং গাজীও। এ জন্যই আল্লামা ইকবাল বলেছেন-

اگیا عیں لڑائی میں اگر وقت نماز

قبلہ دو ہوکے زمیں بوس ہوئی قوم مجاز

অর্থাৎ যুদ্ধরত অবস্থায় যখন নামাযের সময় হয়েছে তখন আরববাসী কিবলা মুখী হয়ে সিজদায় পতিত হয়েছে।

বেনামাযী তথাকথিত গাজী ইকবালের উক্ত কবিতা থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

কাহিনী নং ২২১

নওজোয়ান বর

জংগে উহুদের সময় হান্‌যালা বিন আবি আমের (রাদি আল্লাহু আনহু) এর বিবাহ হয়েছিল। যে রাত্রে তিনি কনেকে বিবাহ করে আনলেন, সে রাত্রে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হলো যে মক্কার কাফিরেরা মদীনা মনোয়ারা আক্রমণ করার জন্য তৈরী হয়েছে। ওদের মুকাবিলার জন্য জিহাদের ময়দানে চলো। হযরত হান্‌যালা (রাদি আল্লাহু আনহু) নওজোয়ান ও বিবাহের প্রথম রাত্রিযাপনকারী হওয়া সত্ত্বেও হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে সব কিছু ভুলে গিয়ে এমন কি নববধুকেও ত্যাগ করে যুদ্ধে যাবার জন্য বিছানা থেকে উঠে গেলেন এবং সেই আহবানের মোহে নিজের ফরয গোসলের কথাও ভুলে গিয়ে যুদ্ধের ময়দানে চলে গেলেন এবং

সে দিনই হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সামনে শহীদ হয়ে গেলেন।

যখন যুদ্ধ শেষ হলো, শহীদদের লাশ মুবারক একত্রিত করার জন্য হুযূরের পক্ষ থেকে নির্দেশ দেয়া হলো, তখন সব লাশ পাওয়া গেল কিন্তু হযরত হানযালার লাশ পাওয়া গেল না। হঠাৎ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আসমানের দিকে দৃষ্টি উঠায়ে দেখলেন যে, হযরত হানযালার লাশ ফিরিশতাগণ উপরে নিয়ে গিয়ে একটি নূরানী তক্তায় শোয়ায়ে গোসল দিচ্ছেন। সে দিন থেকে তাঁর লকব গাসিলুল মালায়েকা হলো। (মওয়াহেবে লাদুনিয়া ৯৪পৃঃ ১ম জিঃ আহসানুল ওয়ায়েজ ২২ পৃঃ)

সবকঃ সাহাবায়ে কিরাম (রাদি আল্লাহু আনহুম) হুযূরের আহবানে দুনিয়ার সব কিছু কুরবান করে দিয়েছিলেন এবং ওনাদের কাছে হুযূরের চেয়ে বেশী প্রিয় কোন জিনিস ছিল না। তাঁরা আল্লাহর পথে কুরবানী হওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন এবং আল্লাহ তাআলার কাছেও সাহাবায়ে কিরাম বড় প্রিয় ছিলেন। ফিরিশতাগণ সাহাবায়ে কিরামের খাদেমের মত ছিলেন। অতঃপর যারা এ ধরনের পবিত্র ও ইসলামের জন্য উৎসর্গিত ব্যক্তির প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করে, তারা জঘন্য গোমরাহ। উপরোক্ত কাহিনী থেকে এটাও বুঝা গেল যে, আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র চক্ষু মুবারক দ্বারা এমন জিনিস সমূহ দেখে পেলেন, যা অন্যদের চোখে দেখতে পায় না।

কাহিনী নং ২২২

শাহাদতের প্রেরণা

হযরত আবদুল্লাহ বিন হাজশ (রাদি আল্লাহু আনহু) উহুদ যুদ্ধের সময় হযরত সাদ বিন আবি ওকাস (রাদি আল্লাহু আনহু) কে বললেন, ভাই সাদ চলো, আমরা দু'জনে মিলে আল্লাহর কাছে নিজ নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করে প্রার্থনা করি। আমি প্রার্থনা করার সময় তুমি আমীন বলবে এবং তুমি প্রার্থনা করার সময় আমি আমীন বলবো। সে মতে উভয়ে এক কিনারায় গিয়ে প্রথমে হযরত সাদ প্রার্থনা করলেন, 'হে আল্লাহ! আগামী কাল যখন যুদ্ধ শুরু হবে, তখন আমার মুকাবিলায় এমন এক বড় কাফিরকে নিয়োজিত কর যেন আমি ওকে তোমার রাস্তায় কতল করতে পারি'। হযরত আবদুল্লাহ আমীন বললেন। এবার হযরত আবদুল্লাহ প্রার্থনা করলেন, 'হে আল্লাহ! কাল জিহাদের ময়দানে আমি এমন এক বাহাদুরের সাথে মুকাবিলা করতে আগ্রহী, যিনি খুবই পরাক্রমশালী। আমি ওকে জোড়ালো ভাবে আক্রমন করবো,

সেও আমাকে জোরালো আক্রমন করবে। শেষ পর্যন্ত এ রকম অনেককে হত্যা করে নিজেও যেন শহীদ হয়ে যেতে পারি। শহীদ হওয়ার পর কাফিরেরা যেন আমার নাক-কান কেটে নেয়। অতঃপর কিয়ামতের দিন যখন তোমার সম্মুখে হাজির হবো এবং তুমি জিজ্ঞেস করবে, হে আবদুল্লাহ! তোমার নাক-কান কেন কাটা গেল? তখন আমি আরয করবো, হে আল্লাহ! তোমার ও তোমার রসূলের রাস্তায় কাটা গেছে। তুমি তখন বলবে, সত্যি আমার রাস্তায় কাটা গেছে'। হযরত সাদ আমীন বললেন। পর দিন যুদ্ধ হলো এবং উভয়ের প্রার্থনা সে রকম কবুল হয়েছিল, যে রকম প্রার্থনা করে ছিলেন। (খমীস ওয়া হেকায়াত ৬৭ পৃঃ)

সবকঃ- সাহাবায়ে কিয়াম আল্লার পথে কুরবান হয়ে যাওয়ার সত্যিকার জজ্‌বা রাখতেন এবং আল্লাহ ও রসূলের খাতিরে ওনারা নিজেদের জান কুরবানী করে দেখায়ে দিলেন যে সত্যিকার মুসলমান আল্লাহ ও তার রসূলের রাস্তায় জান কুরবানী দেয়ার জন্য আগ্রহী থাকেন। সাহারায়ে কিরামের প্রার্থনা দুনিয়াবী ধন-সম্পদ ও রাজত্বের জন্য ছিল না বরং শাহাদতের জন্যই ছিল। সাহাবায়ে কিরাম تقـتـلون ويـقـتـلون এর বাস্তব উপমা ছিলেন অর্থাৎ ওনারা আল্লাহর রাস্তায় মারতেন ও মরতেন। শুধু মরা বা মারার মধ্যে কোন পরিপূর্নতা নেই। আল্লাহর রাস্তায় মেরে গাজী হয়ে যাওয়া বা মরে শহীদ হয়ে যাওয়ার মধ্যেই রয়েছে পরিপূর্ণতা। সাহাবায়ে কিরাম এক দিকে নিজেরা পরিপূর্ণ বীর বাহাদুর ছিলেন এবং বীর বাহাদুর দুশমনের মুকাবিলা করার প্রার্থনা করতেন, অন্যদিকে মাহবুবের রাস্তায় শরীরের টুকরা টুকরা হয়ে যাওয়ার আরজু করতেন। যেন মাহবুব জিজ্ঞেস করলে বলতে পারেন 'আপনার জন্য এরকম হয়েছি।

কাহিনী নং- ২২৩

হাবীব বিন যায়েদ (রাদি আল্লাহু আনহু)

নবুয়াত দাবীকারী মুসাইলামা কাজ্জাব স্বীয় জন্ম স্থান এমামা থেকে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর কাছে একটি চিঠি প্রেরণ করে , যেটায় লেখা ছিলঃ

من مسلمة رسول الله الى محمد رسول الله اما بعد
فان لنا نصف الارض ولقريش نصفا ولكن القريش
لاينصفون والسلام عليك

অর্থাৎ আল্লাহর রসূল মুসাইলামার পক্ষ থেকে আল্লাহর রসূল মুহাম্মদের প্রতিঃ অতপর উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর অর্ধেক আমার এবং অর্ধেক কুরাইশের। কিন্তু কুরাইশ

বংশ সুবিচার করছেনা। আপনার প্রতি সালাম।

হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সঙ্গে সঙ্গে এ চিঠির উত্তর লেখালেন, যেটাতে লেখা ছিলঃ

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبى الى مسلمة
الكذاب اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء
والعاقبة للمتقين والسلام على من اتبع الهدى

অর্থাৎ আল্লাহর নামে যিনি পরিপূর্ণ দয়ালু ও দয়াবান। আল্লাহর নবী মুহাম্মদের পক্ষ থেকে জঘন্য মিথ্যুক মুসাইলামার প্রতিঃ অতঃপর উল্লেখ্য যে, পৃথিবী আল্লাহর। তিনি তাঁর বান্দাদের যাকে ইচ্ছে উত্তরাধিকারী করেন এবং নেক বান্দাদের জন্য সৌভাগ্য। যে সৎ পথে চলে, তার প্রতি সালাম।

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এ চিঠিটা হযরত হাবীব বিন যায়েদ (রাদি আল্লাহু আনহু) কে দিয়ে এমামা পাঠালেন। হযরত হাবীব এ চিঠি নিয়ে মুসাইলামার দরবারে পৌঁছলেন এবং হুযুরের চিঠি পেশ করলেন। মুসাইলামা এ চিঠি পাঠ করে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল এবং রাগের স্বরে বললো اَتَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً رَّسُوْلُ اللّٰه؟ তুমি কি বিশ্বাস কর যে, মুহাম্মদ আল্লাহর সত্যিকার রাসূল? হযরত হাবীব বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় তিনি আল্লাহর সত্যিকার রাসুল। মুসাইলামা পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, اَتَشْهَدُ اِنِّي رَسُوْلَ اللّٰه؟ তুমি কি বিশ্বাস কর যে আমি আল্লাহর রাসূল? হযরত হাবীব বললেন اِنّى اَصَمُّ لَا اَسْمَعُ আমি এ কথা শুনার ব্যাপারে বধির এবং এ ধরনের সাক্ষ্য দেয়ার ব্যাপারে বোবা। মুসাইলামা আরও দু'একবার জিজ্ঞেস করলো কিন্তু তিনি প্রত্যেকবার এ উত্তরই দিলেন। তখন এ মরদুদ হযরত হাবীবের মস্তককে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললো। তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। (আসাবা ফি তামিযুস সাহাবা ৩২৮ পৃঃ)

সবকঃ সাহাবায়ে কিরাম (রাদি আল্লাহু আনহুম) কুরআনের আয়াত اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا ثُمَّ اسْتَقَامُوْا এর মূর্ত প্রতীক। ওনাদের অটল মনোভাবে দুনিয়ার কোন শক্তি পরিবর্তন আনতে পারেনি এবং রসূলের মহব্বতে তাঁরা যে অটল ছিলেন, তা বাস্তবে প্রমাণ করে গেছেন। তাঁরা মুসলমানদেরকে এ শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর মহব্বতকে যেন সবার অগ্রভাগে রাখা হয়। জান যেতে পারে তবুও যেন রসূলের মহব্বতে অটল থাকে।

উপরোক্ত কাহিনী থেকে এটাও বুঝা গেল যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পর যে নবুয়াত দাবী করে, সে বড় মিথ্যুক। এ রকম লোকের হাতে মুসলমানের মারাত্মক ক্ষতি হয়। মুসাইলামা কাজ্জাব যদিও আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে আল্লাহর রসূল মানতো, তবুও সে মিথ্যুকই ছিল। অনুরূপ নবুয়াতের দাবীদার অন্য কেউও যদি আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে স্বীকার করে তবুও সে মিথ্যাবাদী বলে গন্য হবে। মুসাইলামা কাজ্জাব আসসালামু আলাইকা বলার পরও মিথ্যুক ছিল। আজও অনুরূপ কেউ আমাদেরকে সালাম করলে, সত্যবাদী বলে সাব্যস্ত হবে না।

কাহিনী নং ২২৪

নিরাহংকারের মূর্ত প্রতীক

হযরত ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর খিলাফত কালে যখন হযরত আমর ইবনুল আস (রাদি আল্লাহু আনহু) মিসর রাজ্যের উপর চড়াও হলেন, তখন খৃষ্টান বাহিনীর সেনাপতি জরজিস সমস্ত খৃষ্টান দেশ থেকে সৈন্য আনয়ন করে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে নিয়োজিত করলো এবং আপ্রাণ চেষ্টা করে সৈন্যদেরকে নানাভাবে উৎসাহিত করে বার বার হামলা করতে রইলো কিন্তু এ সব ক্ষীণ প্রাণ সৈন্যবাহিনী ইসলামী মুজাহিদদের সীসাঢালা প্রাচীর ভেদ করতে পারলো না।

জরজিস যখন সফলকাম হওয়ার কোন লক্ষণ দেখলো না, তখন স্বীয় সৈন্যবাহিনীর উৎসাহ বৃদ্ধি করার জন্য ঘোষণায় করলো, যে ব্যক্তি মুসলিম সেনাপতির মাথা কেটে আনতে পারবে, তাকে নগদ পুরস্কার ছাড়াও আমার অনন্যা সুন্দরী ও সাহসী কন্যাকেও ওকে দিয়ে দিব। এ ঘোষণা খৃষ্টান সৈন্যদের জোশ খুবই বৃদ্ধি পেল এবং জরজিসের সুন্দরী মেয়েকে পাবার জন্য প্রত্যেকে হযরত আমর ইবনুল আসের মস্তক কর্তন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো। ফলে হযরত আমর ইবনুল আসের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হলো। এ খবর যখন খলিফার দরবারে পৌছানো হলো তখন খলিফার নির্দেশে হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রাদি আল্লাহু আনহু) সাহায্যকারী বাহিনীর সেনাপতি হয়ে খুবই তাড়াতাড়ি মিসরে এসে পৌছলেন। পৌছা মাত্র হযরত আমর ইবনুল আসের কাছে গিয়ে বললেন, আশ্চর্য্যের বিষয়, আপনার মত একজন যুদ্ধ বিশারদ ও বিচক্ষণ রাজ নীতিবিদ ব্যক্তি নিজেকে রক্ষার জন্য কোন তদবীর করলেন না। এর প্রতিকারতো খুবই সহজ। কালই ইসলাম বাহিনীর মধ্যে ঘোষণা দেয়া হোক যে, যে ব্যাক্তি জরজিসের মাথা কেটে আনতে পারবে ওকে নগদ পুরস্কার ছাড়াও জরজিসের

পরীরমত সুন্দরী কন্যাকে দিয়ে দেয়া হবে। হযরত আমর ইবনুল আসের কাছে এ পরামর্শ খুবই পছন্দ হলো এবং এটা ঘোষণা করে দেয়া হলো।

পরদিন যুদ্ধ ক্ষেত্রে উভয় বাহিনী সামনা সামনি হলো এবং যুদ্ধ শুরুর ইশারা পাওয়া মাত্র মুসলিম বাহিনী এমন জোশ ও সাহসিকতার সাথে হামলা করলেন যে খৃষ্টান বাহিনীর পিলহা চমকে গেল। মুসলিম বাহিনী শত্রুদেরকে কচু কাটা করে রাস্তা পরিস্কার করে জরজিসের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। জরজিসের কন্যাও স্বীয় পিতার পাশে দাঁড়িয়ে মুকাবিলা করতে ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তকদীরের হাত থেকে পিতাকে রক্ষা করা গেল না। এক গাজীর তলোয়ারের আঘাতে জরজিস দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। এ খবর ঘোষিত হওয়া মাত্রই খৃষ্টানদের পায়ের মাটি সরে গেল এবং সমস্ত উৎসাহ উদ্দীপনা দমে গেল। তারা পালিয়ে যেতে চাইলো কিন্তু অধিকাংশই ধরা পড়ে গেল। জরজিসের কন্যাও বন্দী হয়ে গেল।

যুদ্ধোত্তর বিজয় অনুষ্ঠানে হযরত আমর ইবনুল আস (রাদি আল্লাহু আনহু) মুজাহিদ বাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করে বললেন আমি জরজিসের মস্তক দ্বিখণ্ডিতকারী সেই মুজাহিদ ভাইকে আহবান জানাচ্ছি, সে যেন নিজের পরিচয় দেন যাতে প্রতিশ্রুতি মুতাবেক পুরস্কার প্রদান করতে পারি। এ ঘোষণার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা হলো কিন্তু কেউ এগিয়ে এসে নিজের নাম প্রকাশ করলো না। হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রাদি আল্লাহু আনহু) ভাব গম্ভীর মনোভাব নিয়ে বললেন, যেহেতু কোন মুজাহিদ ভাই নিজেকে প্রকাশ করছে না, সেহেতু জরজিসের রূপসী কন্যাকে সেনাপতি স্বয়ং গ্রহণ করাটা আমি উত্তম মনে করি।

সেনাপতি হযরত আমর ইবনুল আসঃ দুঃখিত, আমি ভাই আবদুল্লাহ বিন জুবাইরের প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারছি না। আমি সেই জানবাজ মুজাহিদের হক আত্মসাৎ করতে পারি না, যিনি এ বীরত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। আমার অনুমান যদি ভুল না হয় এবং আমার মন সাক্ষ্য দিচ্ছে যে এ বীরত্বপূর্ণ কাজের মুকুট আবদুল্লাহ বিন জুবাইরের মাথায় শোভা পাওয়া উচিৎ।

আবদুল্লাহ বিন জুবাইরঃ আপনি যা কিছু বলেছেন এর জন্য আমি শুকরীয়া জ্ঞাপন করছি। কিন্তু জরজিসের মস্তক দ্বিখণ্ডিতকারী এখনওতো আত্ম প্রকাশ করেন নি।

মুজাহিদগণঃ ভাই আবদুল্লাহ, সত্য কথা প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করছেন কেন? আমরা সবাই আপনাকে নির্ভয়ে জরজিসের দিকে এগিয়ে যেতে দেখেছি। বরং আপনি দুশমনদের হাতে শহীদ হয়ে যান কিনা এ জন্য আমরা উদ্বিগ্ন ছিলাম।

আমরা নিশ্চিত যে জরজিসের হত্যাকারী আপনি ছাড়া অন্য কেউ নয়।

হযরত আবদুল্লাহঃ আল্লাহ তাআলা জানেন যে আমি খ্যাতি ও পুরস্কারের লালসায় নয় বরং স্বীয় দায়িত্ব মনে করে এ কাজ করেছি। আপনারা সবাই যদি বলেন, তাহলে আমি গ্রহণ করতে রাজি। অতঃপর জরজিসের কন্যাকে ইসলামী রীতি অনুসারে হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবাইরের সাথে বিবাহ দিয়ে দেয়া হলো এবং সমস্ত মুজাহিদগণ মুবারকবাদ জানালেন এবং যথাসময় এ খবর খলীফাতুল মুসলেমীনের কাছে পৌছায়ে দেয়া হলো। (তারিখে ইসলাম ২২ পৃঃ)

সবকঃ সাহাবায়ে কিরাম (রাদি আল্লাহু আনহুম) কুটনীতি ও রাজনীতিতে খুবই বিজ্ঞ ছিলেন এবং দুশমনের রাজনৈতিক চাল সহজে বুঝে ফেলতেন। তাঁরা একমাত্র সত্যকে তুলে ধরার জন্য যুদ্ধ করতেন। তাঁরা খ্যাতি বা পুরস্কারের লালসায় যুদ্ধ করতেন না। আল্লাহর রেজামন্দী লাভ তাঁদের আসল উদ্দেশ্য। যে রকম গমচাষীর আসল উদ্দেশ্য গমই হয়ে থাকে, কিন্তু সে গমের সাথে খড় ও ভূষিও লাভ করে থাকে, সে রকম সাহাবায়ে কিরামের আসল উদ্দেশ্য আল্লাহর রেজামন্দীই কিন্তু এর সাথে সাথে তাঁরা মালে গণীমত ও পেয়ে যেতেন। মালে গণীমত হচ্ছে ভূষি সদৃশ যেটা অনায়াসে পাওয়া যায়।

কাহিনী নং ২২৫

চড় মারার রহস্য

ইস্কান্দরীয়া যুদ্ধে রোমানরা একটি দূর্গের মধ্যে অবস্থান নিয়েছিল। মুসলমানেরা সেই দূর্গটি ঘিরে রেখে ছিলেন। একদিন অতর্কিতভাবে রোমানরা দূর্গ থেকে বের হয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করলো। মুসলিম সেনাপতি হযরত আমর ইবনুল আস (রাদি আল্লাহু আনহু) কয়েকজন ঘোড় সওয়ার নিয়ে এগিয়ে গেলেন। খুব জোরালোভাবে যুদ্ধ হলো। শেষ পর্যন্ত রোমানরা পিছপা হতে বাধ্য হলো। মুসলমানেরা ওদেরকে ধাওয়া করে দূর্গের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং রোমীয়দের সাথে কয়েকজন দূর্গের মধ্যে ঢুকে গেলেন। হযরত আমর ইবনুল আস সব যুদ্ধে আগে আগে থাকতেন। এবারও তিনি সবার আগে ছিলেন। রোমানরা মুসলমানদেরকে দূর্গের দরজার সামনে দেখে খুবই ঘাবড়িয়ে গেল এবং আত্মরক্ষার জন্য চারিদিক থেকে দলে দলে দরজার মুখে এসে প্রতিরোধ সৃষ্টি করলো এবং দুর্গের দরজা একেবারে বন্ধ করে দিতে সক্ষম হলো। এ সময় হযরত আমর ইবনুল আস স্বীয় গোলাম দরদান এবং হযরত মুসাল্লামা বিন মখলা দূর্গের অভ্যন্তরে

আটকে গিয়েছিলেন। রোমানরা তাঁদেরকে বন্দী করে ওদের সেনাপতির কাছে নিয়ে গেল। রোমান সেনাপতি তাঁদেরকে নগন্য সৈন্য মনে করলো। কেননা হযরত আমর ইবনুল আসের পরনে সেনাপতির বিশেষ পোষাক ছিল না। তাঁর সাথী ও গোলামের অনুরূপ পোষাক ছিল তাঁর পরনে। এ জন্য রোমান সেনাপতি তাঁদের প্রতি খুবই অবজ্ঞা করে বললো- তোমরা ভূখা বর্বর আরবীরা এ সব দেশে ফিতনা সৃষ্টি করে রেখেছ। হযরত আমর ইবনুল আস সাহসিকতার সাথে উত্তর দিলেন যে আমরা ফিত্না সৃষ্টি করতে আসিনি। বরং আমরা এ সব জাতিকে অধঃপতন থেকে উন্নতি ও সুখী করার জন্য এসেছি। আমরা ইসলামের অমূল্য রত্ন সাথে নিয়ে এসেছি, যেটা আমরা প্রত্যেক জাতির সামনে পেশ করতেছি। যদি আপনারা এ চিরস্থায়ী সম্পদ থেকে বঞ্চিত থাকতে চান, তাহলে আমরা আপনাদেরকে আমাদের জিম্মায় নিয়ে এ দেশকে শান্তির স্থানে পরিণত করবো।

হযরত ইবনুল আসের মুখে এ দুঃসাহসিক জবাব শুনে রোমান সেনাপতি তার সহযোদ্ধাদেরকে রোমান ভাষায় বললো যে এ ব্যক্তি আরব্য বাহিনীর কমান্ডার মনে হচ্ছে। একে শিরচ্ছেদ করা উচিত যাতে সৈন্যদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়। আমর ইবনুল আসের গোলাম দরদান রোমান ভাষা বুঝতো। সে স্বীয় মুনিবকে বিপদগ্রস্ত দেখে মুনিবের মুখে জোরে একটি চড় মারলো এবং বললো বেআদব কোথাকার আরববাসীর পক্ষ থেকে উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের সামনে এ ধরনের কথা বলতে তোকে কে অধিকার দিয়েছে? এ ধরনের কথা বলা তোর পক্ষে শোভা পায় না। আমর ইবনুল আস নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। হযরত মুসাল্লামা বলেন ঠিকই এ ধরনের কথা বলার অধিকার আমাদের নেই। তবে আপনি যদি আপনাদের কয়েক জন অফিসার আমাদের অফিসারদের কাছে পাঠান তাহলে হয়তো উভয় পক্ষ মিলে এমন কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে যেটার ভিত্তিতে আপনারা ও আমাদের মধ্যে সন্ধি হয়ে যেতে পারে। কারণ আমি যতটুকু জানি আমাদের সেনাপতি যুদ্ধের তুলনায় সন্ধিকে অধিক পছন্দ করেন। রোমান সেনাপতি আরব্যদের অবরোধের ফলে অতিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই সে হযরত মুসাল্লামার কথা শুনে খুবই খুশী হলো এবং বললো ঠিক আছে, আমরা তোমাদের ছেড়ে দিচ্ছি, তোমরা গিয়ে তোমাদের উপরস্থ অফিসারদের বল, তারা যদি সন্ধি করতে চায়, আমরা পুরাপুরি সম্মত আছি। হযরত মুসাল্লামা রোমান সেনাপতিকে ধন্যবাদ জানালেন। রোমান সৈন্যরা তাঁদেরকে দূর্গের বাইরে এনে ছেড়ে দিল।

এদিকে মুসলিম বাহিনী হযরত আমর ইবনুল আস ও মুসাল্লামার গ্রেপ্তারীর ফলে খুবই মর্মাহতাবস্থায় ছিলেন কিন্তু যেমাত্র তাঁরা তাঁদের সরদারকে সহীহ

সালামতে ফিরে আসতে দেখলেন, তখন তাঁরা আনন্দে আল্লাহর আকবর ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুললেন। রোমানরা এ আনন্দ ধ্বনি শুনে খুবই বিস্মিত হলো এবং সেই চড়ের রহস্য বুঝতে পারলো। (তারীখে ইসলাম ২২৫ পৃঃ)

সবকঃ বিপদের সময় সত্যিকার মুসলমানেরা জ্ঞান হারা হন না। তদবীর ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করে বিপদ মুক্ত হন। যত বড় জুলুমবাজ হোক না কেন ওদের সামনে মুসলমানেরা হক কথা বলতে দ্বিধাবোধ করেন না। যারা হক কথা বলেন আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে নিশ্চয়ই সাহায্য করেন। সুতরাং বর্তমানেও মুসলমানদের হক কথার উপর অটল থাকা উচিত। কোন অবস্থাতেই হক ও সততার আচঁল হাত ছাড়া করতে নেই। সদা আল্লাহকে ভয় করা এবং তারই রেজামন্দিতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

ڈرنا ہے تو ایک اللہ سے ڈر- مرنا ہے تو اس کی راہ میں مر
رکھ اس کی رضایہ اپنی نظر- پھر ساری یہ دنیا تیری ہے

অর্থাৎ ভয় করলে এক আল্লাহকে ভয় কর, মরতে হলে আল্লাহর পথে মর। আল্লাহর রেজামন্দির প্রতি দৃষ্টি রেখো, তখন দেখবে সারা দুনিয়া তোমার হয়ে গেছে।

কাহিনী নং ২২৬

স্বর্ণের গোলক

মিসর বিজয়ী হযরত আমর ইবনুল আস (রাদি আল্লাহু আনহু) একবার কয়েকজন কুরাইশ ব্যবসায়ীর সাথে ব্যবসার উদ্দেশ্যে বায়তুল মুকাদ্দেসে গিয়েছিলেন। সেই সময় ইস্কান্দরীয়ার এক রোমান পাদ্রীও যেয়ারতের উদ্দেশ্যে ওখানে এসেছিল এবং বায়তুল মুকাদ্দেসের আশাপাশের পাহাড়ে ঘুরাফেরা করতে গিয়েছিল। হযরত আমর ইবনুল আস তাঁর সাথীরা সহ সেখানে উট চড়াচ্ছিলেন। সেই সময় পাদ্রী ভদ্রলোকটি তৃষ্ণায় খুবই কাতর হয়ে পড়েছিল। হযরত আমর ইবনুল আস (রাদি আল্লাহু আনহু) তাঁর মশক থেকে ওকে পানি পান করালেন। তৃষ্ণা নিবারনের পর সে একটি বৃক্ষের ছায়ার নীচে শুয়ে পড়লো। ইত্যবসরে ঐ বৃক্ষের নিটকস্থ একটি গর্ত থেকে একটি বিষধর সাপ বের হয়ে সেই পাদ্রীর দিকে আসতেছিল। সৌভাগ্যক্রমে সেটার উপর হযরত আমর ইবনুল আস (রাদি আল্লাহু আনহু) এর দৃষ্টি পড়েছিল এবং তিনি সাথে সাথে তীর নিক্ষেপ করে সেটাকে মেরে ফেললেন। কিছুক্ষণ পর পাদ্রী জাগ্রত হয়ে তার পাশে মৃত সাপ দেখে চমকে উঠলো। পরে আমর ইবনুল আসের মুখে পুরা ঘটনা শুনে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ওনার

কপালে চুমু দিল এবং বললো আপনি দু'বার আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন। কিন্তু আপনার পরিচয়টা পেলাম না। আপনি এখানে কি জন্য এসেছেন?

আমর ইবনুল আসঃ ব্যবসার উদ্দেশ্যে।

পাদ্রীঃ আপনি এবার কি পরিমাণ লাভের আশা করেন?

আমর ইবনুল আসঃ উট ক্রয় করতে পারি মত লাভের প্রত্যাশী।

পাদ্রীঃ আপনাদের দেশে মানুষের জানের বদলে কি দিতে হয়?

আমর ইবনুল আসঃ একশ উট।

পাদ্রীঃ আমাদের সেখানেতো উট নেই, তবে টাকা-পয়সা অনেক আছে।

আমর ইবনুল আসঃ উট না থাকলে উটের পরিবর্তে টাকা দেয়া যায়। একশ উটের মূল্য একহাজার দিনারের মত হবে।

পাদ্রীঃ আপনি জানেন আমি মুসাফির যেয়ারতের উদ্দেশ্যে এসেছি। আপনি যদি আমার সাথে আমার দেশে যান, তাহলে আমি আপনাকে দুটি জানের বিনিময় দিব।

আমর ইবনুল আসঃ আপনি কোথাকার অধিবাসী?

পাদরীঃ আমি মিসরের ইস্কান্দরীয়া শহরের অধিবাসী। আপনি আমার সাথে চলুন। আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি আমার প্রতিশ্রুতি নিশ্চয় রক্ষা করবো এবং আপনাকে পুনরায় আপনার সাথীদের কাছে পৌছায়ে দিব।

আমর ইবনুল আসঃ ইস্কান্দরীয় যেতে এবং আসতে কত দিন লাগবে?

পাদ্রীঃ দশ দিন যেতে, দশ দিন আসতে এবং দশ দিন ওখানে অবস্থান করবেন। মোট এক মাস সময় লাগবে।

আমর ইবনুল আস একজন সঙ্গী নিয়ে মিসরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন মিসরের সীমানায় প্রবেশ করে ওখানকার শস্য শ্যামল দৃশ্য, অধিক আবাদী এবং লোকজনের স্বচ্ছল অবস্থা দেখে বলে উঠলেন। বাস্তবিকই মিসর বড় সুন্দর। এ রকম দেশ আমি কখনো দেখিনি।

হযরত আমর ইবনুল আস যে দিন ইস্কান্দরীয়ায় পৌছলেন সেদিন ঘটনাক্রমে সেখানে একটি খুব বড় বাৎসরিক মেলা ছিল। যেখানে বড় বড় নেতা, সরদার এবং সম্ভ্রান্ত লোকেরা সমবেত হতো। ঐ দিন ওখানকার প্রথা অনুসারে স্বর্ণের একটি গোলক নিক্ষেপ করা হতো এবং সবাই সেটা নিজেদের আস্তিনে ধারণ করতে চাইতো। অনেক আগ থেকে ওদের মধ্যে এ রকম একটি বিশ্বাস ছিল যে, যার

আস্তিনে সেই গোলকটি পতিত হবে সে নিশ্চয় জীবনে একবার হলেও মিসরের বাদশাহ হবার সৌভাগ্য লাভ করবে।

ইস্কান্দরীয়া পৌছার পর পাদ্রী ভদ্রলোকটি হযরত আমর ইবনুল আসের খুবই সমাদর করলো এবং খুবই উন্নতমানের কাপড় চোপড় পরিধান করায়ে ওর সাথে সেই মেলায় নিয়ে গেল, যেখানে গোলক নিক্ষেপ করা হচ্ছিল এবং লোকেরা সেটা নিজেদের আস্তিনে ধারণ করার জন্য চেষ্টা করছিল। তাঁরা যে মাত্র সেখানে পৌছলেন সে মুহূর্তে স্বর্ণগোলক নিক্ষেপ করা হলো এবং সেটা সোজা হযরত আমর ইবনুল আসের আস্তিনে ঢুকে গেল। এতে সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল।

হযরত আমর ইবনুল আস (রাদি আল্লাহু আনহু) ওখানে কয়েকদিন অবস্থান করলেন। পাদ্রী স্বীয় প্রতিশ্রুতি মুতাবিক তাঁকে দীনার প্রদান করলো এবং তিনি ফিরে আসলেন। ঐ সময় থেকে হযরত আমর ইবনুল আসের মনে মিশর জয়ের বাসনা সৃষ্টি হয়েছিল এবং হযরত ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর খেলাফত কালে তিনি মিসর জয় করেন এবং তথাকার গভর্নর নিয়োজিত হন। (আখবাবুল মিসর ওয়াল কাহেরা ৩৭০ পৃঃ)

সবকঃ সাহাবা কিরামের অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মুহাব্বত দৃঢ়ভাবে স্থান পেয়েছিল বিধায় ওনাদের আস্তিনে স্বর্ণ গোলক ঢুকে যাচ্ছিল এবং সারা বিশ্বের রাজত্ব ওনাদের পদতলে গড়াগড়ি খাচ্ছিল। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রিয় নবীর অনুসারীদের জন্য এটা ঘোষণা দিয়েছেনঃ

کی محمدے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

یہ جہا چیز ہے کیا لوح وقلم تیرے ہیں۔

অর্থাৎ তুমি যদি আমার হাবীবের সাথে ওফাদারী কর, তাহলে আমি তোমার সাথে আছি। তখন শুধু বিশ্ব নয়, লৌহ কলমও তোমার আয়াত্তাধীন হয়ে যাবে।

কাহিনী নং ২২৭

রসূলের তলোয়ার

উহুদ যুদ্ধের সময় হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তলোয়ার হাতে নিয়ে ফরমালেন, আমার এ তলোয়ার কে নেবে? এবং কে এর হক আদায় করবে? হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর এ ঘোষাণা শুনে সাহাবায়ে কিরাম এগিয়ে আসলেন। প্রত্যেকে সেটার জন্য আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু হুযূর (সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কাউকে দিলেন না। শেষ পর্যন্ত হযরত আবু দাজানা যিনি খুবই বড় পলোয়ান ছিলেন, এগিয়ে আসলে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তালোয়ারটা ওনাকেই প্রদান করলেন এবং ফরমালেন হে আবু দাজানা! এ তলোয়ারের হক যাতে আদায় হয়, দুশমনের উপর খুব জোরালোভাবে আক্রমণ চালিও। হযরত আবু দাজানা (রাদি আল্লাহু আনহু) হুযূরের তলোয়ার পেয়ে দারুণ খুশী হলেন এবং লাল রং এর একটি রুমাল মাথায় বেঁধে এবং হাতে তলোয়ার নিয়ে বুক ফুলায়ে (পলোয়ানরা যে রকম করে থাকে) যুদ্ধের ময়দানের দিকে যাত্রা দিলেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ওনার এ আচরণ দেখে ফরমালেন আল্লাহর কাছে এ ধরনের আচরণ খুবই অপছন্দ। কিন্তু এ সময় আবু দাজানা যেহেতু কাফিরদের মুকাবিলায় বুক ফুলায়ে যাচ্ছে, সেহেতু আল্লাহর কাছে তার এ আচরণ খুবই পছন্দ।

হযরত আবু দাজানা রাসুলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর তলোয়ারের এমন বাহাদুরী দেখালেন যে সামনে যেই এসেছে ওকে তলোয়ারের আঘাতে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়েছেন। (মাওয়াহেবে লাদুনিয়া ৯১৩ পৃঃ ১জিঃ)

সবকঃ বড়াই ও অহংকার আল্লাহর কাছে খুবই অপছন্দ কিন্তু দুশমনের মুকাবিলায় বুক ফুলায়ে এগিয়ে যাওয়াটা আল্লাহর কাছে খুবই পছন্দ। কুরআনের আয়াত أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ (কাফিরদের প্রতি কঠোর) এর সত্যায়ন হিসেবে কাফিরদের সামনে বুক ফুলায়ে এগিয়ে যাওয়া চায়। কিন্তু কুরআনের আয়াত رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (নিজেদের মধ্যে সহানুভূতিশীল) এর অনুসারে মুসলিম ভাইদের প্রতি সবসময় সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত।

কাহিনী নং ২২৮

এক হাজার তীরে এক হাজার চোখ

পারস্য যুদ্ধের সময় ইসলামী বাহিনীর অগ্রগামী দলের সরদার ছিলেন হযরত আমর বিন আস। তিনি এমন বাহাদুর ও অস্থির মেজাজের ছিলেন যে, কাফিরদের সাথে যুদ্ধ ছাড়া তিনি স্বস্থি বোধ করতেন না। সেই পারস্য যুদ্ধ চলাকালীন সময় তিনি এক হাজার তীরন্দাজকে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেলেন এবং দুশমনদের চোখ লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ পাওয়া মাত্রই এক হাজার মুসলিম তীরন্দাজ এমন নিখুঁতভাবে তীর নিক্ষেপ করলেন যে একটি তীরও বিফল গেল না। এক হাজার তীর এক হাজার কাফিরের চোখ বিদ্ধ করেছিল।

শেরজাদ নামে এক ব্যক্তি ইরানীদের সেনাপতি ছিল। সে মুহূর্তের মধ্যে এক হাজার সৈন্যের চোখ বিনষ্ট হয়ে যেতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ করে সন্ধির বার্তা পাঠালো কিন্তু তার উল্লেখিত শর্তাবলী হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ গ্রহণ করলেন না বরং জোরে শোরে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। ইরানীরা তাদের খুঁদিত পরিখার কারণে নিরাপদে ছিল। ওদের পরিখা অতিক্রম করে যাওয়াটা মুসলিম বাহিনীর জন্য দুস্কর ছিল। শেষ পর্যন্ত মুসলিম বাহিনী পরিখা অতিক্রম করার জন্য এক কৌশল অবলম্বন করলেন। তাঁদের সাথে রক্ষিত দুর্বল ও রোগা উটগুলো জবেহ করে পরিখার মধ্যে ফেললেন এবং ওগুলোকে বিকল্প পুলের মত করে পারাপারের ব্যবস্থা করলেন এবং সেটার উপর দিয়ে পার হয়ে শত্রুবাহিনীর দিকে এগিয়ে গেলেন। প্রথমে ওরা বাঁধা দিতে চাইলো কিন্তু মুসলিম বাহিনীর সাড়াশি আক্রমণে টিকতে পারলো না। ওদের সেনাপতি শেরজাদ পুনরায় সন্ধির প্রস্তাব দিল এবং এবার যে সব শর্তারোপ করলো তা মুসলিম সেনাপতি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ গ্রহণ করলেন। সেই সন্ধিতে একটা শর্ত এটাও ছিল যে ইরানীদেরকে নিরস্ত্র ও কোন আসবাব পত্র বিহীন অবস্থায় এমন জায়গায় পৌছায়ে দিতে হবে যেখান থেকে ওরা ওদের সীমানায় পৌছে যেতে পারে। মুসলিম বাহিনী তা-ই করেছেন। শেরজদকে ওর বাহিনী সহ আরব সীমানার বাইরে পৌছায়ে দিলেন এবং যাবতীয় সাজ সরঞ্জাম সহ সমগ্র আবনার শহর মুসলিম বাহিনীর কবজায় এসে গেল। (তারিখে ইসলাম ৩৭ পৃঃ)

সবকঃ সাহাবায়ে কিরাম (রাদি আল্লাহু আনহুম) আল্লাহর পথে যুদ্ধের জন্য খুবই আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা যুদ্ধে খুবই পরাদর্শী ছিলেন এবং তীর নিক্ষেপনে খুবই দক্ষ ছিলেন। তাঁরা দুশমনদের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব আসলে মেনে নিতেন অনর্থক যুদ্ধ চালিয়ে যেতেন না।

কাহিনী নং ২২৯

জরজা পলোয়ান

রোমানদের সাথে মুসমানদের ভয়াবহ যুদ্ধ চলছিল। রোমান বাহিনীর অদ্বিতীয় পলোয়ান জরজা ঘোড়া হাঁকিয়ে যুদ্ধ ময়দানে এগিয়ে আসলো এবং তার সাথে মুকাবেলা করার জন্য হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদকে আহবান করলো। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম বাহিনী থেকে বের হয়ে জরজার সামনে গেলেন। তখন জরজা বললো, আমি আপনার সাথে কিছু কথা বলতে চাই। তাই চলুন কিছুক্ষণের জন্য আমরা একে অপরের উপর আক্রমণ না করে নিরাপদে মিলিত হই। হযরত খালিদ (রাদি আল্লাহু আনহু) ওর প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং

জরজা কাছে এসে বললো আমি যা জানতে চাইবো আশা করি আপনি তা সত্যি সাত্যি বলবেন। কেননা স্বাধীন চেতা বীর পুরুষেরা মিথ্যা বলেন না। আমি জানতে চাচ্ছি যে আল্লাহ তাআলা কি আপনাদের পয়গাম্বর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর উপর কোন তলোয়ার নাযিল করেছেন? এবং ওনার থেকে সেই তলোয়ার আপনি পেয়েছেন? কেননা যে জাতির উপর আপনি তলোয়ার চালিয়েছেন, সে জাতিকে পরাজিত করা ছাড়া আপনার এ তলোয়ার খাপে রক্ষিত হয় নি। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ বললেন, না, আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়নি। পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, তাহলে লোকেরা আপনাকে "সায়ফুল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহর তলোয়ার কেন বলে? হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ উত্তরে বললেন, শুনেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের মধ্যে নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে প্রেরণ করেছেন। আমি প্রথমে ওসব লোকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলাম, যারা তাঁর বিরোধী ছিল। পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা হেদায়েত করেছেন এবং আমি তাঁর গোলামী গ্রহণ করেছি। সেই সময় হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আমাকে বলেছেন 'তুমি মুশরিকদের জন্য আল্লাহর তলোয়ার' এবং আল্লাহর দরবারে আমার জন্য বিশেষ দুআ করেছেন। এ সব সেই দুআরই বরকত।

জরজা জানতে চাইলো, আচ্ছা, যদি কেউ ইসলাম কবুল করে আপনাদের জমাতভুক্ত হয়ে যায়, তাহলে আপনাদের মধ্যে ওর অবস্থানটা কোন্ পর্যায়ের হয়ে থাকে? হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ বললেন, আমাদের ও ওর মর্যাদা একই বরাবর হয়ে থাকে বরং অনেক সময় সে আমাদেরকেও ডিঙিয়ে যায়।

জরজা এ কথা শুনে হযরত খালিদের সাথে মুসলিম বাহিনীর সামনে এসে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। হযরত খালিদ ওকে প্রয়োজনীয় ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করলেন। অতঃপর সে গোসল করে দু'রাকাত নামায আদায় করলো এবং হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের সাথে যুদ্ধ ময়দানে এসে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে লাগলো। (তারিখে ইসলাম ৪০৫ পৃঃ)

সবকঃ হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাদি আল্লাহু আনহু) খুবই বাহাদুর সেনাপতি ছিলেন। শত্রুরাও তাঁর বীরত্বকে অস্বীকার করতো না। তিনি বারগাহে নববীতে এমন ভাবে গৃহীত হয়েছিলেন যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাঁকে সাইফুল্লাহ (আল্লাহর তলোয়ার) লকবে ভূষিত করেছিলেন। সেই সায়ফুল্লাহের হাতে কাফিরেরা সব সময় পরাজিত হতো।

কাহিনী নং ২৩০

আমর বিন জুমুহ (রাদি আল্লাহু আনহু)

হযরত আমর বিন জুমুহ (রাদি আল্লাহু আনহু) ছিলেন খোঁড়া। তাঁর ছিল চার ছেলে, যারা প্রায় সময় হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর খেদমতে হাজির থাকতেন এবং যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করতেন। উহুদ যুদ্ধের সময় যুদ্ধে যাবার জন্য হযরত আমর বিন জুমুহ (রাদি আল্লাহু আনহু)ও আগ্রহী হলেন। সাহাবায়ে কিরাম ওনাকে বলরেন, তুমি মাজুর। চলাফেরা করতেও তোমার কষ্ট হয়, যুদ্ধে যাবার কি দরকার? তিনি বললেন, আমার ছেলেরা জান্নাতে যাবে আর আমি রয়ে যাব, তা হতে পারে না। ওনার স্ত্রী ওনাকে উত্তেজিত করার জন্য ভর্ৎসনার সূরে বললেন, দেখা যাবে, কেমন বাহাদুর, আমার তো ধারণা, তুমি যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসবে। এ কথা শুনে হযরত আমর বিন জুমুহ (রাদি আল্লাহু আনহু) অস্ত্র হাতে নিলেন এবং কেবলামুখি হয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন, اَللّٰهُمَّ لَا تَرُدَّنِىْ اِلٰى اَهْلِىْ। (হে আল্লাহ! আমাকে যুদ্ধের ময়দান থেকে পরিবারের দিকে ফিরায়ে আন না। এর পর তিনি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর খেদমতে হাজির হয়ে তাঁর আগ্রহের কথা ব্যক্ত করলেন এবং বললেন আমি আশা করছি যে এ খোঁড়া পা নিয়ে যেন জান্নাতে প্রবেশ করি। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন তুমি মাজুর, তুমি না গেলে ক্ষতি কি? কিন্তু তিনি বার বার আগ্রহ প্রকাশ করায় হুযূর অনুমতি দিয়া দিলেন। হযরত আবু তালহা (রাদি আল্লাহু আনহু) বলেন আমি যুদ্ধ ক্ষেত্রে দেখলাম, আমর বুক ফুলায়ে যাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন খোদার কসম আমি জান্নাতের প্রত্যাশী। তাঁর এক ছেলেও তাঁর পিছু পিছু দৌড়ে যাচ্ছিলেন। উভয়ে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। ওনার স্ত্রী স্বীয় স্বামী ও ছেলের লাশ মদীনায় এনে দাফন করার উদ্দেশ্যে উটের পিঠে উঠায়ে যখন যাত্রা দিলেন, তখন উট বসে গেল। অনেক চেষ্টা করেও বসা থেকে উঠাতে পারলো না। উট অনঢ় হয়ে রইলো এবং উহুদ পানে মুখ করে থাকিয়ে রইল। ওনার স্ত্রী হুযূরের খেদমতে এসে ঘটনা বর্ণনা করলে, হুযূর ফরমালেন, উটের প্রতি এ রকম নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমর যুদ্ধ ক্ষেত্রে আসার সময় কি কিছু বলে এসেছিল? স্ত্রী বললেন, কেব্‌লা মুখি হয়ে এ প্রার্থনা করছিলেন اَللّٰهُمَّ لَا تَرُدَّنِىْ اِلٰى اَهْلِىْ! হুযূর ফরমালেন এ জন্যই উট সে দিকে যাচ্ছে না। (কুররাতুল ওয়ুন)

সবকঃ সাহাবায়ে কিরাম (রাদি আল্লাহু আনহুম) এর এমন জিহাদী জজ্‌বা ও শাহাদতের উৎসাহ ছিল যে, কোন অজুহাত বা রোগ শোক ওনাদেরকে জিহাদে

যাওয়া থেকে বিরত রাখতে পারেনি। তাঁরা সরওয়ারে আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সত্যিকার অনুসারী ছিলেন। ওনাদের কাছে ঘরবাড়ী স্ত্রী সন্তানের মহব্বত পরকালের তুলনায় কিছুই না এবং তাঁরা বড় উৎসাহ নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জান কুরবীন দিয়েছেন এবং পবিত্র আহলে বায়তের মত জান্নাতের অধিকারী হয়ে গেছেন।

কাহিনী নং ২৩১

জান্নাতের সাথী

হযরত ওহাব বিন কাবুস (রাদি আল্লাহু আনহু) মদীনা মনোয়ারার নিকবর্তী কোন এক গ্রামে বাস করতেন এবং ছাগল চড়াতেন। এক দিন ছাগলগুলোকে রশিতে বেঁধে নিয়ে তাঁর ভাতিজাসহ মদীনা মনোয়ারায় আসলেন এবং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সন্ধান নিয়ে জানতে পারলেন যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) উহুদ যুদ্ধে গেছেন। তিনি ছাগলগুলোকে ওখানে ত্যাগ করে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সমীপে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এ সময় কাফিরদের একটি দল আক্রমণ করতে করতে এগিয়ে আসছিল। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন, যে এদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে পারবে, সে জান্নাতে আমার সাথী হবে। হযরত ওহাব বিন কাবুস এ ঘোষণা শুনে খুবই দ্রুত গতিতে তলোয়ার চালনা করলেন এবং সবাইকে হটিয়ে দিলেন। দ্বিতীয়বার যখন ওরা আবার এগিয়ে আসলেন তখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) একই ঘোষণা দিলেন। এবারও হযরত ওহাব ওদেরকে হটিয়ে দিলেন। তৃতীয় বার যখন আবার এগিয়ে আসলো তখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) পুনরায় সেই ঘোষনা দিলেন। এবার হযরত ওহাব বিন কাবুস তলোয়ার হাতে নিয়ে কাফিরদের মাঝখানে ঢুকে গেলেন এবং অনেক কাফিরকে জাহান্নামে পাঠিয়ে নিজে শাহাদাত বরণ করেন এবং হুযূরের প্রতিশ্রুতির হকদার হয়ে গেলেন।

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ওনার শিয়রে দাঁড়িয়ে ফরমালেন, হে ওহাব, আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হোক, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। অতঃপর হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) নিজ হাতে তাঁকে দাফন করলেন। (হেকায়াতে সাহাবা ৭১ পৃঃ)

সবকঃ সাহাবা কিরামের কাছে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর প্রতিটি বাণীর প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা ছিল। ওনারা বিশ্বাস করতেন যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়া সাল্লাম) যা বলেন, তা হয়ে যায়। হযরত ওহাব বিন কাবুস (রাদি আল্লাহু আনহু) সেই আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে জান্নাতে হুযূরের সাথী হওয়ার দৃঢ় বাসনায় কাফিরদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে শাহাদত বরণ করেন। সাহাবায়ে কিরামের বিশ্বাসের মত আমাদেরও বিশ্বাস হওয়া উচিত। যদি কোন ব্যক্তি এ রকম বলে যে, "যার নাম মুহাম্মদ সে কোন কিছুর ক্ষমতাবান নয়" সে ব্যক্তি বড় বেআদব ও গুমরাহ।

কাহিনী নং ২৩২

দৃঢ় বিশ্বাস

উহুদ যুদ্ধ চলছিল। এক ব্যক্তি খেজুর খেতে খেতে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সমীপে হাজির হলেন এবং আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! যদি আমি জিহাদ করি এবং মারা যাই, তাহলে কোথায় যাব? হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন, জান্নাতে। লোকটি তখনই খেজুর ফেলে দিয়ে তলোয়ার হাতে নিয়ে কাফিরদের সাথে জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। (বোখারী শরীফ ৫৭৯ পৃঃ ২ জিঃ)

সবকঃ সাহাবায়ে কিরাম (রাদি আল্লাহু আনহুম) জিহাদের জজ্‌বাধারী ছিলেন এবং হুযূরের প্রতিটি কথার উপর ওনাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

কাহিনী নং ২৩৩

রাতের পাহারা

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসছিলেন। মাঝ পথে রাত্রে এক জায়গায় অবস্থান করলেন এবং ইরশাদ করলেন, আজ নিরাপত্তা ও চৌকিদারীর দায়িত্ব কে নিবে? এক মুহাজির ও এক আনচার যথাক্রমে হযরত আম্মার বিন ইয়াসির ও হযরত আবাদা বিন বশর (রাদি আল্লাহু আনহুমা) আরয করলেন, আমরা উভয়ে এ দায়িত্ব পালন করবো। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ওনাদেরকে শত্রু আসার সম্ভাব্য একটি পাহাড়ী গিরিপথ দেখায়ে দিয়ে ফরমালেন, তোমরা ওখানে দাঁড়িয়ে থাকিও। উভয়ে ওখানে চলে গেলেন। ওখানে গিয়ে আনচার মুহাজিরকে বললেন, রাতকে দু'ভাগ করে এক ভাগে আপনি শুয়ে থাকবেন এবং আমি জেগে থাকবো এবং দ্বিতীয় ভাগে আপনি জেগে থাকবেন, আমি শুয়ে থাকবো। কারণ সারা রাত উভয়ে জেগে থাকতে গিয়ে হয়তো কোন এক সময় উভয়ের চোখ বন্ধ হয়ে আসতে পারে। তাই এটাই উত্তম হবে যে

একজন জেগে থাকবে এবং কোন বিপদ আসলে অন্যজনকে জাগিয়ে তুলবে।

রাতের প্রথম ভাগে আনচার জেগে থাকার সিদ্ধান্ত হলো এবং মুহাজির শুয়ে পড়লেন। আনচার নামাযের নিয়ত বাঁধলেন। ইত্যবসরে শত্রু পক্ষের এক ব্যক্তি আসলো এবং দূরে দাঁড়িয়ে ওনাকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করলো। যখন কোন নড়াচড়া দেখলো না, তখন দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার তীর নিক্ষেপ করলো। প্রতিটি তীর ওনার শরীরে বিদ্ধ হলো। তিনি এ গুলো হাত দিয়ে টেনে বের করে ফেলে দিয়ে ধীর স্থীর ভাবে রুকু করলেন, সিজদা করলেন। নামায পূর্ণ করার পর তাঁর সাথীকে জাগালেন। শত্রু এক সাথে দু'জনকে দেখে পালিয়ে গেল। মুহাজির সাথীটি ঘুম থেকে উঠে এ অবস্থা দেখে বললেন, সুবহানাল্লাহ! আপনি আমাকে ঘটনার প্রারম্ভে কেন জাগালেন না? আনচার তাঁর সাথীকে বললেন, আমি নামাযে সূরা কাহাফ শুরু করেছিলাম এবং আমার মন চাচ্ছিল না যে সূরাটা শেষ করার আগে রুকু করি। এ দিকে বারবার তীর বিদ্ধ হওয়ায় মনে ভয় হলো যে, আমি যদি এ অবস্থায় মারা যাই তাহলে আমাদের উপর হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) যে জিম্মাদারী দিয়েছেন, সেটা অরক্ষিত হয়ে যাবে। যদি আমার মনে এ ভয় না আসতো তাহলে আমি মারা গেলেও সূরা শেষ না করে রুকু করতাম না। (বায়হাকী, হেকায়াতে সাহাবা ৫৩ পৃঃ)

সবকঃ সাহাবায়ে কিরাম ঈমান ও কুরআনের মুকাবিলায় জানের কোন পরওয়া করেন নি। প্রতিটি নির্দেশ পালনে প্রয়োজনে জান উৎসর্গ করে দিতে প্রস্তুত থাকতেন। এসব পবিত্র বান্দারা যখন আল্লাহর সামনে নামাযে দাঁড়াতেন, তখন শরীরে তীর বিদ্ধ হলেও কোন পরওয়া করতেন না। আর আমরা নামাযরত অবস্থায় শরীরে একটি মাছি বসলেও বিচলিত হয়ে পড়ি এবং নামাযের খেয়ালও থাকে না।

কাহিনী নং ২৩৪

সাহাবায়ে কিরামের মেহমানদারী

এক সাহাবী হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর খেদমতে হাজির হয়ে তাঁর ক্ষুধা ও দুঃখের কথা ব্যক্ত করলেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণের হুজরায় খবর নিলেন, কারো কাছে খাওয়ার কিছু আছে কি না। জানা গেল যে কারো কাছে খাওয়ার কিছুই নেই। তখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামকে জিজ্ঞেস করলেন, এমন কেউ আছে, যে একে এক রাত্রির মেহমান হিসেবে গ্রহণ করে? হযরত তালহা আনসারী

(রাদি আল্লাহু আনহু) দাঁড়িয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি মেহমানদারী করবো। অতঃপর হযরত তলহা ওনাকে ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরে গিয়ে স্ত্রীকে বললেন, ইনি হুযূরের মেহমান। ওনাকে মেহমানদারী করার মধ্যে যেন কোন ত্রুটি না হয় এবং কোন কিছু যেন লুকায়ে রাখা না হয়। স্ত্রী বললেন, খোদার কসম, বাচ্চাদের জন্য সামান্য খাবার আছে। হযরত আবু তালহা (রাদি আল্লাহু আনহু) বললেন, তুমি বাচ্চাদের ভুলায়ে ঘুম পাড়ায়ে দাও এবং বাচ্চারা যখন ঘুম যাবে তখন মেহমানের সামনে খাবার নিয়ে আসবে এবং তুমি চেরাগ ঠিক করার বাহানায় সেটাকে নিভায়ে দিবে যেন মেহমান দেখতে না পায় যে আমরা খাচ্ছি কি না। কেননা মেহমান আমাদেরকে খেতে না দেখলে আমাদেরকে খেতে বলবে এবং সে নিজে পেট ভরে খেতে পারবে না।

সে মতে স্ত্রী বাচ্চাদের ঘুম পড়ায়ে মেহমানের সামনে খাবার এনে ওনারা সহ খেতে বসলেন এবং চেরাগ ঠিক করার বাহানায় চেরাগটা নিভায়ে দিলেন এবং পূর্ণ খাবারটা মেহমানকে খাওয়ালেন আর তাঁরা স্বামী-স্ত্রী ও বাচ্চাগুলো না খেয়ে রাত কাটালেন। হযরত আবু তালহা (রাদি আল্লাহু আনহু) এর এ মেহমানদারীতে আল্লাহ তাআলা খুবই সন্তুষ্ট হলেন এবং এ আয়াত নাযিল করলেন। وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ অর্থাৎ নিজেদের জানের উপর ওদেরকে অগ্রাধিকার দেয়, যদিওবা ওরা খুবই অভাবী। (কুরআন করিম ২য় পারা ৪রুকু) রুহুল বয়ান ২৮৯ পৃঃ ৪জিঃ)

সবকঃ সাহাবায়ে কিরাম (রাদি আল্লাহু আনহুম) ভ্রাতৃত্ববোধ, মেহমানদারী ও হামদরদীর মূর্ত প্রতীক ছিলেন। তাঁদের মেহমানদারীতে আল্লাহ তাআলা খুবই সন্তুষ্ট এবং কালামে পাকে এ ব্যাপারে তাঁদের প্রশংসা সূচক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব যদি কোন ব্যক্তি বলে যে আমি সাহাবায়ে কিরামের উপর সন্তুষ্ট নই, তাহলে সে আল্লাহর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট নয়।

কাহিনী নং ২৩৫

পানির মোশক

ইয়ারমুকের যুদ্ধে অনেক সাহাবী শহীদ হয়ে ছিলেন, শহীদদের অনেকে অর্ধমৃত অবস্থায় সূর্যের প্রখর তাপে রক্তের উপর গড়াগড়ি খাচ্ছিলেন। সে সময় হযরত হুজাইফা (রাদি আল্লাহু আনহু) এক মোশক পানি কাঁধে নিয়ে আহতদেরকে পান করাতে লাগলেন। এক দিক থেকে আওয়াজ আসলো 'পানি পানি' হযরত

হুজাইফা (রাদি আল্লাহু আনহু) সে দিকে দৌড়িয়ে গেলেন এবং দেখলেন যে এক আহত মুসলমান তৃষ্ণায় চটপট করতেছে। তিনি ওর মুখে পানি দিতে চাইলে মুখ বন্ধ করে নিলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর বান্দা! আমার থেকেও অধিক আহত ও তৃষ্ণার্ত মুসলমান সামনে পড়ে রয়েছে। আগে ওনাকে পানি পান করাও এর পর আমাকে দিও। ইবনে হুজাইফা (রাদি আল্লাহু আনহু) সেই দ্বিতীয় আহত ব্যক্তির কাছে গেলেন এবং পানি পান করাতে চাইলেন সেই খোদার বান্দাও পানি পান করতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, আমার থেকেও অধিক আর এক তৃষ্ণার্ত মুসলমান ভাই পানি পানি করতেছেন। আগে ওকে পানি পান করাও। হযরত ইবনে হুজাইফা (রাদি আল্লাহু আনহু) সেই তৃতীয় ব্যক্তির কাছে গেলেন কিন্তু তিনি পৌছার আগেই সেই তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিটি মারা গেলেন। তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে ফিরে এসে দেখলেন যে তিনিও আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। ওখানে আর অপেক্ষা না করে তাড়া তাড়ি প্রথম ব্যক্তির কাছে আসলেন। কিন্তু এর মধ্যে তিনিও হাউসে কাউসারের কাছে পৌছে গেছেন। (রুহুল বয়ান ২৮৯ পৃঃ ৪জিঃ)

সবকঃ সাহাবায়ে কিরাম (রাদি আল্লাহু আনহুম) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগ পর্যন্ত মুসলিম ভাইদের প্রতি হামদরদি দেখাতেন। তাঁরা আমাদেরকে এ শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে, এক মুসলমান যেন আর এক মুসলমানের খেয়াল রাখেন।

কাহিনী নং ৩৩৬

সাত ঘরি মহল্লা

মদিনা তৈয়্যবায় সাত ঘর বিশিষ্ট একটি পাড়া বা মহল্লা ছিল। এ মহল্লার লোকেরা খুবই অভাবী ও গরীব ছিল। কোন ঘরই স্বচ্ছল ছিল না। এক দিন এক ঘরে হাদিয়া হিসাবে একটি ছাগলের মাথা পেল। ঐ ঘরের অধিবাসীরা নিজেরাই ক্ষুধার্ত অনাহারী হওয়া সর্ত্বেও এটা চিন্তা করলেন যে, আমাদের প্রতিবেশী হয়তো আমাদের থেকে অধিক ক্ষুধার্ত। আমাদের প্রতিবেশীকে উপবাস রেখে নিজেরা খেলে কেয়ামতের দিন আল্লাহকে কি করে মুখ দেখাবো। তাই তারা ছাগলের মাথাটি নিজেরা না খেয়ে প্রতিবেশীর ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরাও হাদিয়াটি পেয়ে নিজেরা ক্ষুধার্ত হওয়া শর্তেও প্রতিবেশীর হকের কথা চিন্তা করে তৃতীয় ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। তৃতীয় ঘরের বাসিন্দারাও একই চিন্তা করে চতুর্থ ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে চতুর্থ ঘর পঞ্চম ঘরে এবং পঞ্চম ঘর ষষ্ঠ ঘরে এবং ষষ্ঠ ঘর সপ্তম ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। এ সপ্তম ঘরের অধিবাসী ওনারাই ছিলেন, যারা এ মাথাটি হাদিয়া হিসেবে পেয়েছিলেন। ওনারা যখন দেখলেন যে এ হাদিয়া হাত বদল

হয়ে পুনরায় ওনাদের কাছে এসে গেছে, তখন মনে করলেন যে এটা আমাদের ভাগ্যে লিখা আছে। অগত্যা, সেটিকে রান্না করে অল্প অল্প করে সবাইকে ভাগ করে দিলেন। (রুহুল বয়ান ২৮৯পৃঃ ৪জিঃ)

সবকঃ সাহাবায়ে কিরাম নিজেরা উপবাস রয়ে প্রতিবেশীর প্রতি যে হাম্‌দরদি দেখায়েছেন, এ রকম নজির পৃথিবীতে খুবই বিরল। আফ্‌সোস, আজ আমরা প্রতিবেশীর কোন খবরও রাখিনা।

কাহিনী নং ২৩৭

ওয়াদা রক্ষা

একদিন ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর দরবারে বিচার কার্য চলছিল। বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন এবং বিভিন্ন মামলার মীমাংসা করা হচ্ছিল। সে সময় দু'জন যুবক অন্য এক সুদর্শন যুবককে ধরে দরবারে নিয়ে আসলো এবৃং আরজি পেশ করলো, হে আমীরুল মুমেনীন! এ জালিম থেকে আমাদের হক আদায় করে দিন। সে আমাদের বৃদ্ধ পিতাকে মেরে ফেলেছে। হযরত ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) সেই যুবকের দিকে তাকায়ে জিজ্ঞেস করলেন- ওদের আরজির কথাতো তুমি শুনেছ। এখন তোমার কি বক্তব্য আছে? সে খুবই আদবের সাথে অপরাধ স্বীকার করে বললো, সত্যিই আমি এ অপরাধ করেছি। রাগের মাথায় আমি এক পাথর নিক্ষেপ করে ছিলাম, যার আঘাতে সেই বৃদ্ধ লোকটি মারা গেছে।আমার রাগের কারণ হলো, লোকটি আমার প্রান প্রিয় উটটিকে ওর বাগানে ঢুকার কারণে পাথর মেরে চোখ ফুটা করে দিয়েছে।,

হযরত ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) সব কথা শুনার পর তাঁর রায়ে বললেন তোমার থেকে যেহেতু স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দি পাওয়া গেছে, সেহেতু তোমার বেলায় কেসাসের হুকুম প্রযোজ্য। সেই বৃদ্ধের জানের বদলে জান দিতে হবে। যুবকটি মাথানত করে আরয করলেন, শরীয়তের হুকুম ও ইমামের রায় মানতে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে একটা বিষয়ে আবেদন করতে চাই। জিজ্ঞেস করা হলো, বিষয়টা কি? আমার একজন ছোট অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভাই আছে, যার জন্য আমার মরহুম পিতা কিছু স্বর্ণ রেখে গেছেন, যেটা আমার জিম্মায় আছে। আমি সে গুলো এক জায়গায় পুঁতে রেখেছি এবং এর খবর আমি ছাড়া অন্য কেউ জানেনা। আমি যদি সেই স্বর্ণগুলো ওকে হস্তান্তর করতে না পারি, তা হলে কেয়ামতের দিন আমি দায়ী হবো। এ জন্য আমাকে তিন দিনের জন্য জামিনে

ছেড়ে দেয়ার আবেদন করছি।

হযরত ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এ ব্যাপারে একটু চিন্তা করলেন। অতপর বললেন, তিন দিন পর কেসাসের হুকুম কার্যকারি করার জন্য তুমি যে ফিরে আসবে এর জামিন কে হচ্ছে?

ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর এ বক্তব্যের পর যুবকটি চারিদিকে তাকায়ে দরবারে উপস্থিত সবার চেহারার উপর চোখ বুলায়ে নিল। অতপর হযরত আবু জর গেফারী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর দিকে ইশারা করে আরয করলো, ইনি আমার জামিন হবেন। হযরত ফারুকে আযম জিজ্ঞেস করলেন, আবু জর, তুমি এর জামিন হচ্ছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি এর জামিন হচ্ছি। সে তিন দিন পর যথা সময়ে উপস্থিত হবে।

যেহেতু একজন বিশিষ্ট সাহাবী জামিন হলেন, সেহেতু হযরত ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) রাজি হয়ে গেলেন এবং বাদী যুবকদ্বয়ও সম্মতি প্রকাশ করলে ওকে ছেড়ে দেয়া হয়।

তৃতীয় দিন পুনরায় যথারীতি দরবার বসলো। বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরাম উপস্থিত হলেন, বাদী যুবকদ্বয়ও আসলো, হযরত আবু জর গেফারীও তশরীফ আনলেন এবং নির্দিষ্ট সময়ে অপরাধীর আগমনের অপেক্ষায় রইলেন। সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছিল কিন্তু সেই অপরাধীর কোন পাত্তা নেই।

বাদীদ্বয় হযরত আবু জরকে জিজ্ঞেস করলেন, জনাব, আমাদের আসামী কোথায়? হযরত আবু জর পূর্ণ আস্থা সহকারে বললেন, যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সে না আসে, তাহলে খোদার কসম করে বলছি, আমার জামানত পূর্ণ করবো। হযরত ফারুকে আযম মসনদে গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন এবং কিছুক্ষণ পর বললেন, সে যদি না আসে, তাহলে তার জিম্মাদার আবু জরের বেলায় সে হুকুম কার্যকরি হবে, যেটা ইসলামী বিধান মতে প্রযোজ্য।

এটা শুনামাত্র সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হতাশা দেখা দিল। অনেকের মন ভারাক্রান্ত হয়ে গেল এবং অনেকের চোখ দিয়ে পানি এসে গেল। তাঁরা বাধ্য হয়ে বাদীদ্বয়ের কাছে গিয়ে বলতে লাগলেন, তোমরা জানের বিনিময়ে অন্য কিছু গ্রহণ কর। ওরা অস্বীকার করে বললো আমরা রক্তের বদলে রক্ত চাই। সাহাবায়ে কিরামের এ পেরেশানী অবস্থায় হঠাৎ সেই অপরাধী যুবক এসে উপস্থিত হলো। তখন সে খুবই ঘামার্ত ছিল এবং খুব ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছিল এবং আসা মাত্রই

হযরত ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর সামনে গিয়ে সালাম করলো এবং আরয করলো, "আমি আমার ছোট ভাইকে মামাদের কাছে সোপর্দ করে এসেছি এবং ওর সহায় সম্পত্তি ওনাদেরকে বুঝায়ে দিয়ে এসেছি। এখন আল্লাহ ও রাসুলের যা হুকুম, তা কার্যকর করুন আমি প্রস্তুত।

হযরত আবু জর গেফারী (রাদি আল্লাহু আনহু) বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন! খোদার কসম, আমি একে চিনিও না এবং সে কোথাকার লোক তাও জানি না। কিন্তু সে সবাইকে বাদ দিয়ে যখন আমাকে ওর জামিন বললো, তখন সেটা অস্বীকার করতে আমার বিবেক বাঁধা দিয়েছিল। ওর চেহারা দেখে আমার বিশ্বাস হয়েছিল যে, সে স্বীয় ওয়াদা পূর্ণ করবে। তাই আমি ওর জামিনদার হয়ে গিয়েছিলাম।

সেই অপরাধী যুবক আরয করলেন, আমি হযরত আবু জরের শুকরীয়া আদায় করছি, আমি না আসলে ওনার বড় বিপদ হতো। কিন্তু মুসলমান যে কোন অবস্থায় স্বীয় ওয়াদা রক্ষা করে, কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করে না।

ওর আগমনে সবার মনে স্বস্তি আসলো, এমন কি বাদীদ্বয় সন্তুষ্ট হয়ে মহামান্য দরবারে আরয করলো, আমীরুল মুমেনীন! আমরা আমাদের পিতার রক্তের দাবী মাফ করে দিলাম।

এটা শুনা মাত্র উপস্থিত সবাই আনন্দে নারায়ে তকবীর বলে উঠলেন এবং হযরত ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর চেহারা মোবারকেও খুশীর লক্ষণ ফুটে উঠলো এবং বাদীদ্বয়কে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের পিতার রক্তের বিনিময় আমি বায়তুল মাল থেকে আদায় করবো। বাদীদ্বয় আরয করলো, হুযুর আমাদের কিছু নেয়ার প্রয়োজন নেই আমরা কিছু নিব না।

পরিশেষে আনন্দঘন পরিবেশে আদালতের কার্যক্রম সমাপ্ত হলো (মগনিউল ওয়ায়েজীন ৪৭৯ পৃঃ)

সবকঃ সাহাবায়ে কিরাম (রাদি আল্লাহু আনহুম) ছিলেন মানবতাবাদী, সদ্বাচরণকারী এবং ওয়াদা পালনকারী। মৃত্যুদণ্ডের আসামী হওয়া সত্ত্বেও ওয়াদা মুতাবেক যথা সময় এসে গিয়েছিলেন। তাঁরা পূর্ণ ওয়াদা রক্ষাকারী ও সত্যিকার মুসলমান ছিলেন। কিন্তু আজকাল আমরা ওয়াদার প্রতি আদৌ গুরুত্ব প্রদান করি না।

কাহিনী নং ২৩৮

বাদশাহ হারকলের দরবারে

হযরত ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর খেলাফত কালে সিরিয়ার যুদ্ধে হযরত আবদুল্লাহ বিন হুজাফা সহ আশি জন সাহাবীকে খৃষ্টানেরা বন্দী করেছিল। আমীরুর মুমেনীন হযরত ওমর ফারুক (রাদি আল্লাহু আনহু)বাদশাহ হারকলের কাছে নিম্নের চিঠিখানা লিখেন-

من عبدالله امير المومنين عمر ابن الخطاب الي هرقل عظيم الروم-

اما بعد فاذا وصل اليك كتابى فابعث الى بالا مير الذي عندك وهو عبد الله ابن خذافة فان فعلت رجوت لك الهداية وان ابيت بعثت اليك رجالاواى رجال لا تلهبهم تجارة ولابيع من ذكر الله امام الصلوة الخ

অর্থাৎ আল্লাহর বান্দা আমীরুল মুমেনীন ওমর বিন খাত্তাবের পক্ষ থেকে রোমের বাদশাহ হারকলের প্রতি।

হে রোমের বাদশাহ হারকল, আমার এ চিঠি যখন আপনার হাতে পৌঁছবে, তখন আপনি বন্দীকৃত আবদুল্লাহ বিন হুজায়ফাকে (তার সঙ্গীগণ সহ) ছেড়ে দিবেন। এতে আপনার উপকার হবে। অন্যথায় আমি এমন বাহিনী প্রেরণ করবো যারা সদা আল্লার স্মরণ এ জিকিরে মগ্ন, ঘরে বাজারে, বেচা কেনায় মোট কথা সব সময় আল্লাহর জিকিরে নিয়োজিত এবং নামাযের একান্ত পাবন্দ........।

যখন রোমের বাদশাহ এ চিঠি পেল, হযরত আবদুল্লাহকে সাথীগণ সহ তলব করলো এবং জিজ্ঞেস করলোঃ

রোমের বাদশাহঃ রসূলে আরবী ও ওমর ফারুকের সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক?

হযরত আবদুল্লাহঃ রসুলে আরবী আমাদের নবী এবং ওমর ফারুক আমাদের খলীফা।

রোমের বাদশাহঃ তুমি যদি খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ কর তাহলে আমি উচ্চ পরিবারের সুন্দরী মেয়ে তোমার সাথে বিবাহ দিব এবং কোন একটি উচ্চ পদও

প্রদান করবো।

হযরত আবদুল্লাহঃ আমি কখনো দীনে মুহাম্মদী ত্যাগ করতে পারিনা।

রোমের বাদশাহঃ (একটি খুবই মূল্যবান হার আনিয়ে সামনে রেখে) দেখ, এ হার তোমাকে দিয়ে দিব এবং অনেক গোলামও তোমাকে দিব। তোমার অভিমত কি?

হযরত আবদুল্লাহঃ হে বাদশাহ মহোদয়, আপনি যদি আপনার পুরা রাজ্যটাই ইসলামের বিনিময়ে দিয়ে দেয়ার প্রস্তাব দেন, তখনও আমি তাতে রাজি হবো না।

রোমের বাদশাহঃ তাহলে ঠিক আছে, মৃত্যুর জন্য তৈরী হয়ে যাও।

হযরত আবদুল্লাহঃ হে বাদশাহ মহোদয়, আপনি যদি আমার শরীরকে টুকরা টুকরা করুন, তবুও আমি ইসলাম ত্যাগ করবো না।

রোমের বাদশাহঃ আচ্ছা, তুমি খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ না কর, শুধু ক্রুশ চিহ্নকে সিজদা কর। তাহলে তোমার সাথীরা সহ তোমাকে ছেড়ে দিব।

হযরত আবদুল্লাহঃ আমাদের রসূল আমাদেরকে আল্লাহর এ হুকুম শুনায়েছেন

لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

অর্থাৎ চাঁদ সূর্যকে সিজদা কর না, বরং আল্লাহকে সিজদা কর। যিনি চাঁদ সূর্য সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা সত্যিকার ভাবে আল্লাহর ইবাদতকারী হও।

রোমের বাদশাহঃ আচ্ছা, সামান্য মদ পান কর; এক্ষুনি ছেড়ে দিবো।

হযরত আবদুল্লাহঃ আমি মদ পান করা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

রোমের বাদশাহঃ তোমাকে শরাবও পান করতে হবে এবং শুকরের মাংসের কবাবও খেতে হবে।

অতঃপর রোমের বাদশাহ নির্দেশ দিল যে, একে জেলখানায় একাকী বন্দী করো এবং ওর আশে পাশে শরাব ও শুকরের কবাব রেখে দাও। এ গুলো ছাড়া অন্য কিছু খেতে দিওনা। ক্ষুধায় কাতর হয়ে নিজেই এগুলো খাবে। নির্দেশ মতে হযরত আবদুল্লাহকে তিন দিন এক ঘরে বন্দী করে রাখলো এবং চতুর্থ দিন দরবারে তলব করলো। জেল খানার নিরাপত্তা রক্ষীদের জিজ্ঞেস করলো, সে কিছু পানাহার

করেছে কি না? নিরাপত্তা রক্ষীরা বললো, উনি সব কিছু অবিকল রেখে দিয়েছে। ওদিকে চোখ তুলেও দেখেননি। রোমের বাদশাহ আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলোঃ

রোমের বাদশাহঃ তুমি ওগুলো কেন পানাহার করনি?

হযরত আবদুল্লাহঃ কেবল আল্লাহর ভয়ে।

রোমের বাদশাহঃ তোমাদের ধর্মেতো জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা হলে হারাম জিনিস হালাল হয়ে যায়। তার পরও তুমি ওগুলো কেন গ্রহণ করনি?

হযরত আবদুল্লাহঃ আমি ঐ কাজ কেন করতে যাব, যাদ্বারা একজন কাফির খুশী হবে এবং আল্লাহ নারাজ হবে।

রোমের বাদশাহঃ (নিজের পা এগিয়ে দিয়ে) ঠিক আছে, যদি মুক্তি পেতে চাও, তাহলে আমার পায়ের সামনে মাথা নত কর।

হযরত আবদুল্লাহঃ আমি মুসলমান, এ মাথা খোদা ভিন্ন অন্য কারো সামনে নত হয় না।

রোমের বাদশাহঃ আচ্ছা তাহলে আমার মাথায় একটি চুমু দাও। আমি তোমাকে ও তোমার সাথীদেরকে অনতি বিলম্বে ছেড়ে দিব।

হযরত আবদুল্লাহঃ হ্যাঁ, এটা করতে পারি।

অতঃপর তিনি বাদশাহের মাথায় চুমু দিলেন যেটা আরববাসীর রীতি ছিল। তাঁরা কোন বন্ধুর সাথে সাক্ষাত হলে মাথায় চুমু দিতেন।

বাদশাহ হারকল হযরত আবদুল্লাহ ও অন্যান্য মুসলমানগণকে মুক্তি দিয়ে বিদায় জানালো।

যখন হযরত আবদুল্লাহ মুসলমানদের মধ্যে ফিরে আসলেন, তখন সবাই খুবই খুশী হলেন এবং কয়েকজন সাহাবী একটু রসিকতা করে বললেন, ইনি সেই ব্যক্তি, যিনি এক কাফিরের মাথায় চুমু দিয়েছেন। তিনি এর প্রতি উত্তরে বলেন, কথাটা ঠিক কিন্তু এ চুমুর ফলে আশি জন মুসলমানের জীবন বন্দী ও মৃত্যু থেকে রক্ষা পেল। (আসাদুল গাবা ও সিরাতুস সালেহীন ৪৭ পৃঃ)

সবকঃ সাহাবায়ে কিরাম (রাদি আল্লাহু আনহুম) এর ঈমান এত মজবুত ছিল যে, দুনিয়ার কোন শক্তি বা কোন মুছিবত ওনাদের পদস্খলন করতে পারতো না। তারা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সেই বাণী لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ

وَإِنْ حُرِّقْتَ أَوْ قُتِلْتَ (কখনো শিরিক করো না যদিওবা তোমাদেরকে আগুণে জ্বালানো হয় বা হত্যা করা হয়) এর পরিপূর্ণ অনুসারী ছিলেন। ক্ষুধায় মরণাপন্ন হওয়া সত্বেও শরাব ও শুকুরের কাবাবের দিকে চোখ তুলেও তাকায়নি যাতে কাফিরেরা সন্তুষ্ট হতে না পারে। অথচ আজকাল অনেক মুসলমান কাফিরদের সন্তুষ্ট করার জন্য নিজে শরাব পান করে। সাহাবায়ে কিরামের ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহমর্মিতার কোন তুলনা ছিলনা। হযরত আবদুল্লাহ (রাদি আল্লাহু আনহু) যে হারকালের মাথায় চুমু দিতে সম্মত হয়েছিলেন, তা একমাত্র আশিজন মুসলমানের জান রক্ষার জন্য এবং এর পিছনে যুক্তি সঙ্গত কারণ ছিল। কিন্তু আজ যারা বিধর্মীদের চালচলন গ্রহণ করছে, বদমুজহাবীদের সাথে মুসাফাহা করছে,তাদের কাছে এর কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ নেই। উপরোক্ত কাহিনী থেকে এটাও বুঝা যায় যে, ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর প্রভাব এবং ভীতি কাফিরদের মধ্যেও ছিল। তাই তাঁর চিঠি পাওয়া মাত্র রোমের বাদশাহ হারকল কোন একটা বাহানা করে মুসলমানদেরকে ছেড়ে দেয়াটা সমীচীন মনে করেছিল।

কাহিনী নং ২৩৯

অতি মূল্যবান মুক্তা

সিরিয়ার যুদ্ধে রোমের বাদশাহ হারকল যখন আবদুল্লাহ বিন হুজাইফা (রাদি আল্লাহু আনহু) ও তাঁর সাথে আশি জন সাহাবীকে বন্দী করে ফেলে, তখন হযরত ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) হারকলের নামে এক চিঠি লিখেন, যার মধ্যে হারকলকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে মুসলমানদেরকে যেন ছেড়ে দেয়া হয়। অন্যথায় মুসলিম বাহিনী প্রেরিত হবে। রোমের বাদশাহ এ চিঠি পেয়ে মুসলমানদেরকে ছেড়ে দিল এবং বিদায় কালীন সময় হযরত আমীরুল মুমেনীন ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর খেদমতে অনেক মূল্যবান মুক্তা পাঠালেন। যখন সেই উপঢৌকন হযরত ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর খেদমতে পেশ করা হলো, তখন তিনি মদীনা শরীফের জহুরীদের দ্বারা এর মূল্য যাচাই করলেন। জহুরীরা বললো এর মূল্য ধারনাতীত। সাহাবায়ে কিরাম হযরত ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) কে বললেন, এত যাচাই বাচাই এর কি প্রয়োজন। এ উপঢৌকন আপনার জন্য পাঠিয়েছে, আপনিই গ্রহণ করবেন। হযরত ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) বললেন, আপনাদের অনুমতি দ্বারা এটা আমার জন্য কি করে বৈধ হতে পারে, যতক্ষণ সমগ্র জগতের মুসলমাগণ অনুমতি না দেন। বলুন কি করে ওসব মুসলমানদের অনুমতি গ্রহণ সম্ভব, যারা এখনও মায়ের পেটে?

ওমরের এতটুকু শক্তি নেই যে কিয়ামতের দিন ওসব শিশুদের হক আত্মসাতের জবাব দিতে পারে। অতঃপর তিনি নির্দেশ দিলেন যে ওসব মুক্তাগুলো বিক্রি করে এর মূল্য যেন সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়। (সীরাতুস সালেহীন ৫১ পৃঃ)

সবকঃ সাহাবায়ে কিরাম পরিপূর্ণ তকওয়ার অধিকারী ছিলেন। অতি মূল্যবান লোভনীয় জিনিসও ওনাদেরকে স্বীয় আদর্শ থেকে হঠাতে পারতো না এবং তাঁরা পরকালের সামনে ইহকালকে মোটেই পাত্তা দিতেন না। যারা এক পয়সার জন্য দীনধর্ম বিসর্জন দিতে অভ্যস্থ, তারা যদি হযরত ওমর ফারুক (রাদি আল্লাহু আনহু) এর সম্পর্কে সমালোচনা করে তাদের থেকে বড় জালিম ও মূর্খ আর কে হতে পারে?

কাহিনী নং ২৪০

সাহসিকতামূলক জবাব

মক্কার কুরাইশরা মুসলমানদেরকে কোনঠাসা করার জন্য যখন বদর যুদ্ধের পাঁয়তারা শুরু করলো, তখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সাহাবায়ে কিরাম (রাদি আল্লাহু আনহুম) কে ফরমালেন, দুশমন যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে আছে, বল তোমাদের অভিমত কি? সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হতে মুহাজিরগণ জবাব দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি সেটাই করুন যেটা করার জন্য আল্লাহ তাআলা আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা আপনার সাথে আছি। খোদার কসম এ রকম করবো না, যে রকম বনী ইসরাঈল তাদের পয়গম্বর হযরত মুসা (আলাইহিস সালাম) এর সাথে করেছিল। তারা হযরত মুসা (আলাইহিস সালাম) কে বলেছিল اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ আপনি এবং আপনার প্রভু উভয়ে গিয়ে লড়াই করুন। আমরা এখনে অপেক্ষা করছি। ইয়া রসূলাল্লাহ আমরা আপনার নামে আমাদের জান উৎসর্গ করতে প্রস্তুত আছি।

আনচারগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি। সেই জাতে পাকের কসম যিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেন, আপনি যদি আমাদেরকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে বলেন, আমরা ঝাঁপিয়ে পড়বো। আপনি আমাদের মতামত কেন চাচ্ছেন? আমরা অকৃতজ্ঞ নই। যেটা হুকুম করবেন, সেটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো। যেদিকে নির্দেশ করেন সেদিকে ঝাঁপিয়ে পড়বো, নারায়ে তকবীর ও নারায়ে রেসালতের শ্লোগানে সারা পৃথিবীকে কাঁপিয়ে তুলবো।

(মুদারেজুন নবুয়াত ৫৪ পৃঃ ২ জিঃ)

সবকঃ সহাবায়ে কিরাম (রাদি আল্লাহু আনহুম) হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া

সাল্লাম) এর সত্যিকার আশেক ও সহচর ছিলেন। তাঁরা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ইশারায় যে কোন ধরনের কুরবানী দিতে প্রস্তুত হয়ে যেতেন এবং তাঁরা যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর জন্য নিবেদিত প্রাণ, তা প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। তাঁরা কোন সময় তাঁদের নবীর সাথে বেওফায়ী করেন নি।

কাহিনী নং ২৪১

মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দোহাই

মদীনা মনোয়ার একটি বাজারের রাস্তা দিয়ে এক গ্রাম্য মহিলা যাচ্ছিল। কয়েক জন বখাটে ইহুদী ওকে উত্যক্ত করতে আরম্ভ করলো। বেচারী ওদের এ ধরেনের অবৈধ আচরণে ঘাবড়িয়ে গেল এবং নিজের ইজ্জত রক্ষার কোন উপায় না দেখে সে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দোহাই দিল। চিৎকার করে বললো মুহাম্মদের শহরে আমি যে এভাবে বেইজ্জত হচ্ছি, তা প্রতিহত করার মত কোন বিবেকবান ব্যাক্তি কি এ শহরে নেই? মহিলার এ ফরিয়াদ এক মুসলমান শুনা মাত্র ওর সাহায্যে দৌড়ে আসলেন এবং ইহুদীদের বাঁধা দিতে গিয়ে ঝগড়া লেগে গেল এবং শেষ পর্যন্ত সেই মহিলার ইজ্জত বাচাতে গিয়ে নিজে শহীদ হয়ে গেলেন। (তারিখে ইসলাম ১৫৭ পৃঃ ১জিঃ)

সবকঃ তৎকালীন মুসলমানগণ বড় বিবেকমান ও বাহাদুর ছিলেন। বেহায়াপনা, উচ্ছৃংখলতা ও অন্যায়কে তাঁরা মোটেই প্রশ্রয় দিতেন না।

কাহিনী নং ২৪২

দু'জন ছোট্ট মুজাহিদ

হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রাদি আল্লাহু আনহু) বলেন, বদর ময়দানে আলো ও আঁধার এবং ইসলাম ও কুফরের ভয়াবহ যুদ্ধ চলছিল। আমার মনে একান্ত বাসনা ছিল যে, যে কোন প্রকারে কাফিরদের সরদার আবু জেহলকে হত্যা করা কিন্তু সুযোগ পেলাম না। ইত্যবসরে মায়াজ ও মায়ুজ নামে দু'জন ছোট্ট মুজাহিদ (দু'সহোদর ভাই) তলোয়ার হাতে নিয়ে আমার ডানে বামে দাঁড়িয়ে চুপে চুপে জিজ্ঞেস করলো, আবু জেহেলের প্রতীক কি? আকৃতিটা কি রকম? এবং সে এখন কোন জায়গায় অবস্থায় করছে? হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রাদি আল্লাহু আনহু) বলেন আমি ছেলেদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলাম, বিধর্মীর কি প্রয়োজন তোমাদের?

তারা বললো-

قسم کھائی ہے مرجائیں گے یا ماریں گے ناری کو
سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو

অর্থাৎ আমরা কসম করেছি যে জাহান্নামীকে মারবো বা নিজেরা মারা যাবো। কারণ আমরা শুনেছি, সে নাকি মাহবুবে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে গালি দেয়।

হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রাদি আল্লাহু আনহু) বলেন, আমি তাদের এ দুঃসাহসিকতা দেখে হতবম্ভ হয়ে গেলাম এবং তাদের শাহাদতের কথা স্মরণ করে শিহরিয়ে উঠলাম। কিন্তু তারা অটল। তাদের উত্তর ছিল, জানি, সামনে মৃত্যু। কিন্তু আশিকগণ স্বীয় জানের পরওয়া করে না। খোদাভীরুরা কখনো মৃত্যুকে ভয় করে না। হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রাদি আল্লাহু আনহু) ছেলেদ্বয়কে বললেন, আবু জেহেলের কাছা কাছি তোমরা কি করে যাবে? ওকে তো ওর বাহিনী পরিবেষ্টন করে রেখেছে। ছেলেদ্বয় বললো, ওরা আজরাইলের রাস্তা কতক্ষণ অবরোধ করে রাখতে পারবে? পরিশেষে হযরত আবদুর রহমান আবু জেহেলের প্রতীক ও অবস্থানের ঠিকানা বলে দিলেন। ছেলেদ্বয় কাল বিলম্ব না করে তলোয়ার হাতে নিয়ে নারায়ে তকবীর বলে বিদ্যুৎ গতিতে আবু জেহেলের সামনে গিয়ে উপস্থিত হলো, আবু জেহেল শত চেষ্টা করেও ছেলেদ্বয়কে প্রতিহত করতে পারলো না। ছেলেদ্বয়ের হাতে তার মৃত্যু অবধারিত ছিল। তাই সে কচি হাতের তলোয়ারের আঘাতে ঘোড়া সহ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। কাফিরেরা যখন তাদের সরদারের এ অবস্থা দেখলো, তখন তাদের পুরা বাহিনী ছেলেদ্বয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিন্তু ইশ্‌কে মুস্তাফায় উদ্বুদ্ধ ছেলেদ্বয় সহজে হার মানার পাত্র ছিল না। তারা অনেক কাফিরকে জাহান্নামে পাঠিয়ে প্রথমে হযরত মায়ুজ (রাদি আল্লাহু আনহু) শাহাদত বরণ করেন এবং হযরত মায়াদ (রাদি আল্লাহু আনহু) একাকি হয়ে যান। একাকি অবস্থায় যুদ্ধ করতে করতে তাঁর একটি বাহু কেটে গিয়ে সামান্যের জন্য আটকে রয়ে যায় এবং শরীরের সাথে লটকিয়ে থাকে। এ অবস্থায় তিনি অন্য হাতে তলোয়ার নিয়ে লড়তে লাগলেন কিন্তু কাটা বাহুটি লটকিয়ে থাকায় তাঁর তলোয়ার চালাতে অসুবিধা হচ্ছিল। তাই তিনি সেই হাতকে পায়ের নিচে চেপে ধরে জোরে টান দিয়ে ছিড়ে ফেলে দিলেন। অতঃপর ধীর-স্থীর ভাবে যুদ্ধ করতে লাগলেন।(মুদারেজুন নবুয়াত ৬৫ পৃঃ ২জিঃ)

সবকঃ বয়স্ক সাহাবায়ে কিরাম ছাড়াও অল্প বয়স্ক সাহাবীদের মধ্যেও আল্লাহর

পথে কুরবানী দেয়ার সীমাহীন জজ্‌বা ছিল। তাদের কাছে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এত প্রিয় ছিলেন যে হুযুরের বিরুদ্ধে কোন কথা তাদের কাছে খুবই অসহ্য ছিল। আল্লাহ ও রসূলের মহব্বতের মাঝখানে কোন প্রতিবন্ধকতা দেখলে, তাঁরা তা সঙ্গে সঙ্গে অপসারিত করতেন।

কাহিনী নং ২৪৩

বেদুইনের ঘোড়া

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এক বেদুইন থেকে একটি ঘোড়া খরিদ করেন। কিন্তু সে বিক্রি করার পর অস্বীকার করলো এবং সাক্ষী তলব করলো। মহা সমস্যা, মুসলমানদের মধ্যে যেই আসলেন, সে ওকে ধমকালেন এবং বললেন, তোমার সর্বনাশ হবে। রসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কখনো মিথ্যা বলেন না। প্রত্যেকে এতটুকু বলছিলেন কিন্তু কেউ সাক্ষ্য দিচ্ছিলেন না। কারণ কারো সামনে এ ঘটনাটা ঘটেনি। এ সময় হযরত খুজাইমা (রাদি আল্লাহু আনহু) তথায় এসে উপস্থিত হলেন এবং আলোচনা শুনে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি তোমার ঘোড়া হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর কাছে বিক্রি করেছ। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হযরত খুজাইমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে খুজাইমা! তুমিতো উপস্থিত ছিলে না, সাক্ষী কি করে দিলে? আরয করলেন, ইয়া রসুলল্লাহ! আপনি আমাদেরকে আসমানের খবর শুনান এবং আমরা না দেখে আপনার কথাকে বিশ্বাস করে তা মেনে লই। আর এটাতো পার্থিব খবর। এটাকে কি করে অস্বীকার করতে পারি? হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হযরত খুজাইমা (রাদি আল্লাহু আনহু) এর এ উত্তর শুনে খুবই সন্তুষ্ট হলেন এবং এর পুরস্কার স্বরূপ হযরত খুজাইমা (রাদি আল্লাহু আনহু) এর সাক্ষ্যকে দু'জন পুরুষের সাক্ষ্যের বরাবর করে দিলেন এবং ফরমালেন, খুজাইমা যে কারো লাভ-ক্ষতির বেলায় সাক্ষ্যই দিলে ওর একক সাক্ষ্য যথেষ্ট। (আবু দাউদ ৩৪১পৃঃ ২জিঃ)

সবকঃ সাহাবায়ে কিরাম (রাদি আল্লাহু আনহুম) হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর প্রতিটি বানীকে বিশ্বাস করেছেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর জবান মুবারক দিয়ে যা বের হয়, তা হকই বের হয়। তাঁর পবিত্র জবান থেকে কখনো নাহক কথা বের হতে পারেনা। উপরোক্ত ঘটনা থেকে এটাও বুঝা গেল যে, আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) শরীয়তের মালিক। কোন হুকুম থেকে যাকে ইচ্ছে ব্যতিক্রম করতে পারেন। যেমন কুরআনের হুকুম হচ্ছে وَاَشْهِدُوْا ذَوِى عَدْلٍ مِّنْكُمْ এবং

নিজেদের দু'জন বিবেকবান ব্যক্তিকে সাক্ষী কর। (পারা- ২৮, রুকু-১৭) কুরআনের এ হুকুম থেকে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হযরত খুজাইমা (রাদি আল্লাহু আনহু) কে ব্যতিক্রম করে দিলেন এবং ওনার একক সাক্ষ্যকে দু'জন পুরুষের সাক্ষ্যের বরাবর ঘোষনা করলেন। এতে প্রমাণিত হয়, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) শরীয়তের ব্যাখ্যাকার, মালিক ও মুখতার।

কাহিনী নং- ২৪৪

অদ্ভুত শাস্তি

রমযান মাসে এক সাহাবীর রোযা ভেঙ্গে গিয়েছিল। তিনি বারগাহে নববীতে হাজির হয়ে আরয করলেন, ইয়া রসূলল্লাহ! আমি রমযানে স্ত্রীর সান্নিধ্যে গিয়েছি এবং আমার সর্বনাশ করেছি। এখন আমি কি করতে পারি? হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন, গোলাম আযাদ করতে পারবে? আরয করলেন, সম্ভব নয় ইয়া রসূলল্লাহ! ফরমালেন, দু'মাস অবিরাম রোযা রাখতে পারবে? আরয করলেন, ইয়া রসূলল্লাহ! তাও সম্ভব নয়। ফরমালেন, ষাটজন মিস্‌কিন খাওয়াতে পারবে? আরয করলেন, ইয়া রসূলল্লাহ! এটাও সম্ভব নয়। ইত্যবসরে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর খেদমতে কোন একজন কিছু খেজুর হাদিয়া হিসেবে পেশ করলেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) খেজুর গুলো সেই সাহাবীকে দিয়ে দিলেন এবং ফরমালেন, যাঁও এগুলো নিয়ে গিয়ে কাউকে খয়রাত করে দাও। তোমার কাফ্‌ফারা আদায় হয়ে যাবে। সেই সাহাবী আরয করলেন, ইয়া রসূলল্লাহ! সারা মদীনা শহরে আমার থেকে বেশী অভাবী আর কেউ নেই। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এ কথা শুনে এমন হেসে দিলেন যে, তাঁর দাঁত মুবারক দৃষ্টিগোচর হয়ে ছিল। অতপর ফরমালেন- اِذْهَبْ فَاَطْعِمْهُ اَهْلَكَ যাও, তোমার পরিবারকে খাওয়াও। তোমার কাফ্‌ফারা আদায় হয়ে যাবে।(বোখারী শরীফ- ৩৬০ পৃঃ, ১ জিঃ)

সবকঃ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) শরীয়তের পূর্ণ মালিক। তিনি যে রকম ইচ্ছে করেন, সে রকম হুকুম দিতে পারেন। দেখুন, সমগ্র জাহানের মুসলমানদের জন্য রোযা ভঙ্গের কাফ্‌ফারা হচ্ছে গোলাম আযাদ করা বা অবিরাম ষাট রোযা বা ষাটজন মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো। কিন্তু জনৈক সাহাবীর বেলায় হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কাফ্‌ফারা ধার্য করলেন কিছু খেজুর, তাও নিজেরা খাওয়া। এরপরও যারা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর মালিক

ও মুখতার হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ করে, তাদের থেকে বড় মূর্খ আর কেউ নেই।

কাহিনী নং- ২৪৫

স্বর্ণের আংটি

এক বার হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর খেদমতে অনেক মালে গনীমত এসেছিল এবং তিনি তা সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। সমস্ত মাল বন্টনের পর একটি স্বর্ণের আংটি রয়ে গিয়েছিল। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) দৃষ্টি মুবারক উঠায়ে সাহাবায়ে কিরামের দিকে তাকালেন আবার দৃষ্টি মুবারক নীচের দিকে করে নিলেন। পুনরায় দৃষ্টি মুবারক উঠায়ে তাকালেন আবার দৃষ্টি নীচের দিকে করে নিলেন।পুনরায় তাকালেন এবং হযরত বারাহ (রাদি আল্লাহু আনহু) কে ডাকলেন। হযরত বরাহ (রাদি আল্লাহু আনহু) কাছে গেলে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন, বসে যাও। হযরত বরাহ বসে গেলেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আংটিটা নিয়ে হযরত বরাহ (রাদি আল্লাহু আনহু) এর হাত ধরে ফরমালেন, পরে নাও, যা তোমাকে আল্লাহর বসূল পরাচ্ছেন। হযরত বরাহ সেই আংটি পরে নিলেন। এরপর উনি যখন আংটি পরে বন্ধুদের সামনে আসলেন, তাঁরা বললেন, হে বরাহ! তুমি স্বর্ণের আংটি কেন পরেছ? হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তো স্বর্ণের আংটি পরতে নিষেধ করেছেন। হযরত বরাহ ওনাদের সব কথা শুনে জবাব দিলেন, যে আংটি আমাকে স্বয়ং রসূলে খোদা পরতে বলেছেন, সেটা আমি কেন পরবো না? (আল আমন ওয়াল উলা- ১৬০ পৃঃ)

সবকঃ সাহাবায়ে কিরাম (রাদি আল্লাহু আনহুম) এর বিশ্বাস ছিল যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বাণীই শরীয়ত। তিনি যে জিনিস থেকে বাঁধা দেন সেটাই নাজায়েয এবং যাকে যেটার অনুমতি দিবেন, সেটা ওর জন্য জায়েয। যেমন স্বর্ণের আংটি সমস্ত মুসলমানের জন্য হারাম কিন্তু হযরত বরাহ (রাদি আল্লাহু আনহু) এর জন্য জায়েয। সে জন্য হযরত বরাহ সেই আংটি হাতে দিয়েছিলেন।

কাহিনী নং - ২৪৬

হাওয়াজেন গোত্রের সরদার

হুনাইন যুদ্ধে মুশরিকরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, হাওয়াজেন গোত্রের সরদার মালেক বিন আউফও পালিয়ে তায়েফ গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। হুযূর

(সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ঘোষণা দিলেন যে, মালেক বিন আউফ যদি ঈমান আনয়ন করে আমার সামনে হাজির হয়, আমি ওর পরিবার ও সম্পদ ওকে ফিরায়ে দিব। এ খবর মালিক বিন আউফের কাছে পৌছলে সে হুযূরের খেদমতে হাজির হলো এবং ঈমান আনলো। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ওর পরিবার ও সম্পদ ফেরত দিলেন। তাছাড়া তাঁর ভান্ডার থেকে একশ উট প্রদান করলেন। রহমতে আলম(সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর এ করুনা দেখে হযরত মালেক বিন্ আউফ (রাদি আল্লাহু আনহু) হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে সম্বোধন করে নিম্নের কসিদাটি পাঠ করেনঃ

مَا اِنْ رَاَيْتُ وَلاَسَمِعْتُ بِوَاحِدٍ
فِى النَّاسِ كُلِّهِمْ كَمِثْلِ مُحَمَّد
اَوْفى وَاعطى للجزيل لِمُجْد
وَمَتى تَشَاءُ يُخْبِرُكَ عَمَّا فِىْ غد

অর্থাৎ আমি সারা জাহানের মানুষের মধ্যে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর মত কাউকে দেখিনি ও শুনেনি। হুযূর সবচে অধিক অফাদার এবং সবচে অধিক দাতা। তিনি ইচ্ছে করলে আগামী কালের খবরও বলে দিতে পারেন। (আল আমন ওয়াল উলা-২০৩ পৃঃ)

সবকঃ সাহাবায়ে কিরামের বিশ্বাস ছিল যে হুযুরের মত কেউ নেই এবং হুযূর হলেন সবচেয়ে বড় দাতা এবং হুযূর আগামী কালের খবর সর্ম্পকে জ্ঞাত। এরপরও যারা হুযূরকে নিজেদের মত মানুষ বলে এবং এ রকম বলে যে, হুযূর কিছু দিতে পারেনা বা হুযুরের কাছে গায়েবী জ্ঞান নেই, ওরা বড় জাহিল। কসিদা পাঠ তথা নাত পাঠ বিদআত নয় বরং সাহাবায়ে কিরামের সুন্নাত।

কাহিনী নং- ২৪৭

উপযুক্ত বিচার

হযরত ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর খেলাফত কালে হযরত আমর ইবনুল আস (রাদি আল্লাহু-আনহু) মিসরের গভর্ণর ছিলেন। একবার হযরত আমর ইবনুল আসের ছেলে এক মিসরী যুবকের সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা দিয়েছিল এবং মিসরী যুবকটি অগ্রগামী হয়েছিল। এতে হযরত আমর ইবনুল আসের ছেলে রেগে মিসরী যুবকটিকে দোর্রা মারলো। মিসরী যুবকটি এ জুলুমের ফরিয়াদ নিয়ে

হযরত ফারুকে আযমের দরবারে হাজির হলো এবং আরজি পেশ করলো যে, ওকে গভর্ণরের ছেলে অনর্থক দোর্রা মেরেছে। হযরত ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) হযরত আমর ইবনুল আসকে ছেলে সহ তাঁর দরবারে হাজির হওয়ার জন্য ফরমান জারী করলেন। ফরমান পেয়ে গভর্ণর ছেলে সহ হাজির হলেন। আমীরুল মুমেনীন ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) মিসরী যুবককে নির্দেশ দিলেন দোর্রা হাতে নাও এবং তোমাকে যে দোর্রা মারছে, ওকে মারো। তখন সে বদলা নিতে শুরু করলো এবং ফারুকে আযম বলতে ছিলেন, আরো মারো। হযরত আনস (রাদি আল্লাহু আনহু) বলেন, সে এতটুকু মেরেছিল যে, আর যেন না মারে আমরা সেটাই কামনা করছিলাম। যখন মিসরী যুবকটি ওকে দোর্রা মারা থেকে অবসর হলো, তখন ফারুকে আযম ফরমালেন, এবার এ দোর্রাটি আমর ইবনুল আসের মাথার উপর রেখো। কারণ তিনি তথাকার গভর্ণর ছিলেন। তিনি কেন বিচার করলেন না এবং কেন ছেলের পক্ষপাতিত্ব করলেন? মিসরী যুবকটি আরয করলো, হে আমীরুল মুমেনীন! ওনার ছেলে আমাকে মেরেছিল, আমি ওর থেকে বদলা নিয়েছি। ফারুকে আযম(রাদি আল্লাহু আনহু) আমর ইবনুল আস (রাদি আল্লাহু আনহু) কে বললেন, তোমরা আল্লাহর বান্দাদেরকে কখন থেকে নিজেদের গোলাম বানিয়ে নিয়েছ? অথচ ওরা মায়ের পেট থেকে স্বাধীন মানুষ হিসেবে জন্ম নিয়েছিল। হযরত আমর ইবনুল আস (রাদি আল্লাহু আনহু) আরয করলেন, হে আমীরুল মুমেনীন! আমি কিছুই জানতাম না এবং এ লোকটি আমার কাছে কোন অভিযোগও করেনি। তখন ফারুকে আযম ওনাকে মাফ করে দিলেন।(আল আমন ওয়াল উলা- ২৪৫ পৃঃ)

সবকঃ সাহাবায়ে কিরামের যুগে প্রত্যেক মজলুমের ফরিয়াদ শুনা হতো এবং জালিম ব্যাক্তি গভর্ণরের ছেলে হলেও শাস্তি থেকে রেহাই পেতনা। প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতা ছিল। উপরোক্ত কাহিনী থেকে এটাও বুঝা গেল যে, ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) বাস্তবিকই ন্যায় বিচারের বাদশাহ ছিলেন।

কাহিনী নং -২৪৮

খোদার আমানত

হযরত আবু তালহা (রাদি আল্লাহু আনহু)দেশের বাইরে ছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর ছেলে মারা যায়। আবু তালহা ঘরে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলেন, ছেলে কেমন আছে? তাঁর স্ত্রী উম্মে সলিম জবাব দিলেন, আরামে আছে। এরপর আবু তালহা (রাদি আল্লাহু আনহু) কে খাবার দিলেন। যখন খাওয়া-দাওয়া শেষ করলেন।

তখন উম্মে সলিম বললেন, একটি মাসয়ালার উত্তর দিন, আমার কাছে যদি কেউ কোন কিছু আমানত রাখে এবং কিছু দিন পর যদি তা ফেরত চায়, তখন ফেরত দেয়াটা উচিত কিনা? হযরত আবু তালহা (রাদি আল্লাহু আনহু) বললেন, এটা কি একটা জিজ্ঞেস করার বিষয়, সঙ্গে সঙ্গে ফেরত দেয়া উচিত। উম্মে সলিম বললেন, ফেরত দিয়ে কি কোন দুঃখ বা শোক প্রকাশ করা উচিত? আবু তালহা (রাদি আল্লাহু আনহু) বললেন, দুঃখ বা শোক প্রকাশ করতে যাবে কেন?তখন স্ত্রী ধীর স্থীর ভাবে বললেন, তাহলে শুনুন, আমাদের ছেলে যা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমানত দিয়েছিল, তা ফেরত নিয়ে নিয়েছে। ছেলে মারা গেছে, সবর করুন। আবু তালহা এটা শুনে সবর করলেন এবং রাত অতিবাহিত করার পর সকালে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর খেদমতে হাজির হলেন এবং হুযুরের কাছে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন! আল্লাহ তাআলা আজকের রাত তোমাদের জন্য বরকতময় করুক। পরবর্তীতে আবু তালহা (রাদি আল্লাহু আনহু) কে অল্লাহ তাআলা আর একটি পুত্র সন্তান দান করেন। যখন ছেলে জন্ম হয়, তখন আবু তালহা (রাদি আল্লাহু আনহু) ওকে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বারগাহে নিয়ে আসেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ওর কপালে হাত বুলায়ে দেন এবং ওর নাম রাখেন আবদুল্লাহ। হযরত আবদুল্লাহ যত দিন জীবত ছিলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর হাত মুবারকের বরকতে ওনার কপালে নূরানী ঝলক ও উজ্জ্বলতা দেখা যেত। (হুজ্জাতুল্লাহ আলাল আলেমীন ৫৮০ পৃঃ)

সবকঃ সাহাবায়ে কিরাম-পুরুষ মহিলা সবাই আল্লাহর রেজামন্দিতে রাজি ছিলেন। ওনাদের মুখ থেকে শরীয়ত বিরোধী কোন শব্দ বের হতো না। সাহাবায়ে কিরাম মুসীবতের সময় নিজেদের দুঃখ দুর্দশা বর্ণনা করার জন্য হুযূরের খেদমতে হাজির হতেন এবং হুযুরের দোয়ার দ্বারা উপকৃত হতেন। উপরোক্ত কাহিনী থেকে এটাও বুঝা গেল যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) শুধু নিজে নূর ছিলেন না বরং নূর প্রদান কারীও ছিলেন।

কাহিনী নং ২৪৯

রক্ত মোবারক

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) একবার শিঙ্গা লাগিয়ে ছিলেন এবং যে রক্ত বের হয়েছিল, তা ফেলে দিয়ে আসার জন্য এক সাহাবীকে বললেন। সেই সাহাবী রক্ত মুবারক নিয়ে একটি দেয়ালের পিছনে গেলেন এবং ডানে বামে দেখে রক্ত

মুবারক নিজে পান করে ফেললেন। যখন ফিরে আসলেন, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, রক্ত কোথায় ফেলেছ? আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) দেয়ালের পিছনে লুকায়ে এসেছি। পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, কোন জায়গায়? তখন সেই সাহাবী আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার কাছে আপনার রক্ত মুবারক মাটিতে ফেলা বা মাটিতে পুঁতে রাখাটা খুবই খারাপ মনে হয়েছে। তাই আপনার রক্ত মুবারকের যাতে বেআদবী না হয় এবং কারো পা ওটার উপর যাতে না পড়ে, সে জন্য আমি সেটা পান করে ফেলেছি। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন, তুমি নিজেকে দোযখ থেকে রক্ষা করলে। (আনওয়ারে মুহাম্মদীয়া ১৪০)

সবকঃ সাহাবায়ে কিরামের অন্তরে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সীমাহীন ইজ্জত ও সম্মান বোধ ছিল। সেই ইজ্জত-সম্মানের কারণে সেই সাহাবী হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর রক্ত মুবারক পান করে ফেলেছিলেন। অথচ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) পান করতে বলেননি। এতে বুঝা যায় যে, যে কাজ হুযূরের ইজ্জত ও সম্মানের খাতিরে করা হয়, সেটা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) না বললেও উত্তম এবং দোযখ থেকে মুক্তি দানকারী হয়ে থাকে। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বরকতময় সত্ত্বা অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। আমাদের রক্ত কাপড়ে বা শরীরে লাগলে নাপাক হয়ে যায়। কিন্তু হুযূরের রক্ত মুবারক শরীরে লাগলে সেই শরীর জাহান্নাম থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

কাহিনী নং ২৫০

অন্ধ সাহাবী

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর খেদমতে এক অন্ধ সাহাবী হাজির হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা জন্য দুআ করুন, যেন আমি সুস্থ হয়ে যাই। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন, তুমি রাজি হলে বিলম্ব করতে পারি অথবা এখনও দুআ করতে পারি। আরয করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! এখনই দুআ করুন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন, ঠিক আছে অযু করে এসে দু'রাকাত নামায পড় এবং এ দুআটি পার্থনা কর।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىۡ اَسْئَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِىِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ اِنِّىۡ قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ اِلٰى رَبِّىۡ فِىۡ حَاجَتِىۡ هٰذِهٖ لِتَقْضِىۡ لِىَ اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِىَّ

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এবং তোমার কাছে ধর্না দিয়েছি তোমার নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ওর ওসীলা ধরে যিনি মেহেরবান নবী। হে রসুলাল্লাহ! আমি আপনার উসীলায় স্বীয় প্রভুর প্রতি আমার হাজত পেশ করছি, যেন আমার হাজত পূর্ণ হয়। হে আল্লাহ! ওনাকে আমার শাফায়াতকারী কর। ওনার শাফায়াত আমার বেলায় কবুল কর। (ইবনে মাযা ১০০ পৃঃ) অন্ধ সাহাবীটি সেই রকম করেছিলেন এবং হাদীছ রেওয়ায়েতকারী বলেন যে, উনি এ রকম সুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন যে, উনি যে অন্ধ ছিল, তা মনে হচ্ছিল না। (ইবনে মাযা ১০০ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত হাদীছের টীকা)

সবকঃ সাহাবায়ে কিরাম মুসিবতের সময় মুসিবত দূরীভূত করার জন্য হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর খেদমতে হাজির হতেন। উল্লেখিত হাদীছ থেকে এটাও বুঝা গেল যে, হুযূরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা বা ইয়া মুহাম্মদ বলে শ্লোগান দেয়া এবং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে আহবান মূলক শব্দ দ্বারা আহবান করা কখনো শিরিক নয় বরং এটা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নিজের দেয়া শিক্ষা। হুযূর নিজেই শিখায়েছেন যে, আমার উসীলা দিয়ে দুআ প্রার্থনা কর এবং আমাকে আহবান করে প্রার্থনা কর। এটাও বুঝা গেল যে, হুযূরের সামনে দাঁড়িয়ে বা হুযূর থেকে পৃথক হয়ে কাছে বা দূর থেকে ইয়া মুহাম্মদু সম্বোধন করা যায়। কারণ অন্ধ সাহাবীকে যে দুআটি শিখায়েছেন, সেটার বেলায় এ রকম বলেননি যে, উপরের দুআটি পড়ে আল্লাহর কাছে আরজি পেশ কর। এর পর আমার কাছে এসে ইয়া মুহাম্মদু থেকে শেষ পর্যন্ত দো'আটি পড়। অতএব বুঝা গেল যে, হুযূরের উসীলা, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা, রেসালতের শ্লোগান ইত্যাদি খুবই ভাল কাজ, হাজত পূর্ণকারী ও বরকতময় এবং এগুলো সাহাবায়ে কিরামের আমলের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কাহিনী নং ২৫১

এক অভাবী

এক অভাবী ব্যক্তি আমীরুল মুমেনীন হযরত উসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) এর দরবারে স্বীয় কোন একটি অভাবের কথা বলার জন্য যেতেন। কিন্তু হযরত উসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) ওনার প্রতি মনোযোগ দিতেন না এবং ওনার অভাবের কথাও মনোযোগ সহকারে শুনতেন না। একদিন সেই অভাবী ব্যক্তি হযরত ইবনে হানিফ (রাদি আল্লাহু আনহু) এর সাথে সাক্ষাত করলেন এবং ওনার কাছে অভিযোগ করলেন যে, তিনি একটি বিশেষ প্রয়োজনে আমীরুল মুমেনীনের দরবারে আসা যাওয়া করছেন কিন্তু আমিরুল মুমেনীন ওনার প্রতি আদৌ মনোযোগ দিচ্ছেন না। হযরত ইবনে হানিফ (রাদি আল্লাহু আনহু) বললেন অযু করে মসজিদে গিয়ে দু'রাকাত নামায পড়। অতঃপর এ দু'আটি পার্থনা করঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِىِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ اِنِّىْ اَتَوَجَّهُ بِكَ اِلٰى رَبِّىْ فَيَقْضِىْ حَاجَتِىْ

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এবং তোমার প্রতি আমাদের নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর উসীলায় ধর্না দিচ্ছি। ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি আপনার উসীলায় স্বীয় প্রভূর প্রতি মনোনিবেশ করছি, যেন আমার অভাব পূর্ণ করা হয়।

এ দুআ পড়ে স্বীয় অভাবের কথা স্মরণ করিও এবং সন্ধ্যায় আমার কাছে আসিও যেন আমি তোমার সাথে যেতে পারি। লোকটি সে রকম করলেন। অতঃপর আমীরুল মুমেনীনের দরজায় হাজির হলেন। দরজার সামনে পৌঁছা মাত্র দারোয়ান এসে তাঁর হাত ধরে আমীরুল মুমেনীনের কাছে নিয়ে গেল। আমীরুল মুমেনীন তাঁকে তাঁর পাশে মসনদে বসালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, কি জন্য এসেছেন? লোকটি স্বীয় অভাবের কথা বললেন। আমীরুল মুমেনীন সঙ্গে সঙ্গে ওনার অভাব পূরণ করে দিলেন এবং বললেন এতদিন আপনার এ অভাবের কথা আমাকে কেন বলেন নি? আগামীতে কোন কিছু প্রয়োজন হলে আমাকে জানাবেন আমি ইনশা-আল্লাহ পূরণ করে দিব।

অতঃপর লোকটি দরবার থেকে বের হয়ে আসলেন এবং হযরত ইবনে হানিফ (রাদি আল্লাহু আনহু) এর সাথে সাক্ষাত করলেন এবং ওনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললেন, আজ আমীরুল মুমেনীন আমার প্রতি শুধু মনোযোগ নয় খুবই সহানুভূতি দেখায়েছেন এবং আমাকে নিজেই ভিতরে ডেকে নিয়ে আমার অভাব পূরন করে দিয়েছেন। ইবনে হানিফ (রাদি আল্লাহু আনহু) বললেন, খোদার কসম, আমি তোমার ব্যাপারে আমীরুল মুমেনীনকে কিছু বলিনি। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, আমি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে দেখেছি যে, এক অন্ধ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর খেদমতে হাজির হয়ে স্বীয় অন্ধত্বের অভিযোগ করলেন। তখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন তুমি অযু করে দু'রাকাত নামায পড়, অতপর এ দুআটি পড় আমি যেটা তোমাকে বলেছি। খোদার কসম আমি তখনও বৈঠক থেকে উঠে যাইনি, আলোচনা হচ্ছিল, ইত্যবসরে সেই অন্ধ পূর্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে আমাদের সামনে আসলেন। দেখে মনেই হলো না যে, উনি কোন সময় অন্ধ ছিলেন। (তিবরানী শরীফ ১০৩ পৃঃ)

সবকঃ সাহাবায়ে কিরাম কোন অভাব অভিযোগের সময় হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ...ম) এর উসীলা গ্রহণ করতেন এবং তাঁদের দুআয় 'ইয়া মুহাম্মদু' বলে আহবান করতেন। ...াবায়ে কিরামের এটা বিশ্বাস ছিল যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দুনিয়াবী জি...গীতে যেমন তাঁর উসীলা প্রয়োজন, বেসালের পরও তাঁর উসীলা অতি প্রয়োজন। সাহাবায়ে ...ম হুযূরের দুনিয়াবী জিন্দেগীতেও ইয়া মুহাম্মাদু বলতেন এবং বেসালের পরও বলতেন।

কাহিনী নং ২৫২

রোমের কয়েদী

হযরত আবু করসাফা (রাদি আল্লাহু আনহু) এর এক ছেলে খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে ধরা পড়ে এবং রোমানরা তাঁকে বন্দী করে ওদের দেশে নিয়ে যায় এবং কারাগারে বন্দী করে রাখে। হযরত আবু করসাফা (রাদি আল্লাহু আনহু) সেই সময় এসকেলানে ছিলেন। তিনি যখন তাঁর ছেলের গ্রেপ্তারী ও কারাগারে বন্দী করে রাখার খবর জানতে পারলেন, তখন তিনি নিজ শহর থেকে প্রত্যেক নামাযের সময় ছেলেকে এভাবে ডাকতেন يَا فُلَانُ الصَّلٰوةُ হে অমুক! নামাযের সময় হয়েছে। হযরত আবু করসাফা (রাদি আল্লাহু আনহু) এর এ আওয়াজ তাঁর ছেলে কারাগার থেকে শুনতেন এবং জবাব দিতেন অথচ বাপ বেটার মাঝখানে মহা সমুদ্র বিরাজমান ছিল। (তিবরানী শরীফ ৯৩ পৃঃ)

সবকঃ সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে অদৃশ্য থেকে আহবানের প্রচলন ছিল এবং তাঁরা দূর থেকে অদৃশ্য ব্যক্তিকে আহবান মূলক শব্দ দ্বারা ডাকাকে নিষেধ করতেন না। তাঁরা দূরের আওয়াজ শুনতেন। যে নবীর গোলামেরা দূরের আওয়াজ শুনেন সেই নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) নিজে কেন দূরের আওয়াজ শুনবেননা? নিশ্চয় শুনেন।

কাহিনী নং ২৫৩

নাত খানি

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে যখন মদীনা শরীফে প্রবেশ করেন, তখন মদীনাবাসীদের মনে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়, এবং হুযূরকে খোশ আমদেদ জানানোর জন্য এগিয়ে যান। ঐ সময় হযরত আব্বাস (রাদি আল্লাহু আনহু) হুযূরের সামনে গিয়ে আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একান্ত বাসনা, আপনার সম্পর্কে দু'একটি নাত পাঠ করি। আশা করি অনুমতি দিবেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন قُلْ لَا يُفْضِضِ اللّٰهُ فَاكَ অর্থাৎ যা বলার তা বল, আল্লাহ তাআলা তোমার মুখকে সালামত রাখুক।

হযরত আব্বাস (রাদি আল্লাহু আনহু) অনুমতি পেয়ে নাত পাঠ করলেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে সম্বোধন করে তাঁর উচ্চ ধারণা ব্যক্ত করলেন। তাঁর পরিবেশিত নাতের সারমর্ম হচ্ছেঃ

ইয়া রাসুলাল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আপনি জন্মের আগেও পাক পবিত্র ও নূর ছিলেন। হযরত নূহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর কিশতীতেও আপনি আরোহিত ছিলেন, এবং হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর মেরুদন্ডেও আপনার নূর বিরাজমান ছিল, যখন তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। আপনি যখন

আবির্ভূত হন তখন আসমান জমীন আলোকিত হয়ে যায়। আপনার আজমত ও বুজুর্গী অনেক উচ্চ বংশকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। হুযূর! আমরা আপনার নূরানী আলোর মধ্যে আছি এবং আপনার নূরের বদৌলতে আমরা হেদায়ত প্রাপ্ত।"

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হযরত আব্বাস (রাদি আল্লাহু আনহু) এর এ নাতখানিতে খুবই সন্তুষ্ট হন। (মওয়াহেবে লদুনিয়া ১৭৫ পৃঃ ১জিঃ)

সবকঃ সাহাবায়ে কিরাম (রাদি আল্লাহু আনহুম) এর মধ্যে নাতখানির প্রচলন ছিল। তাঁরা গদ্য পদ্য উভয়ভাবে হুযূরের প্রশংসাগীতি পরিবেশন করতেন এবং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাঁর অনুসারীদের মুখে নাতখানি শুনে সন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন এবং নাত পাঠকারীকে দুআ করতেন যে, আল্লাহ তাআলা যেন ওর মুখকে সালামত রাখে। নাতখানি কোন বিদআত কাজ নয় বরং সাহাবায়ে কিরামের সুন্নাত।

কাহিনী নং ২৫৪

মাহবুবের আদব

হযরত বরাহ বিন আযেব (রাদি আল্লাহু আনহু) এর কাছে কোন এক ব্যক্তি মাসআলা জিজ্ঞেস করেছিল যে, কোন্ কোন্ পশুর কুরবানী ঠিক নয়? হযরত বরাহ বিন আযেব (রাদি আল্লাহু আনহু) উত্তরে বললেন, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এক দিন আমাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ফরমালেন যে, চার প্রকার পশু, যে গুলো দ্বারা কুরবানী জায়েয নয়। এক, যেটার চোখ কানা, দুই, যেটা মারাত্মক রোগাক্রান্ত, তিন, যেটা খোঁড়া, চার, যেটা খুবই দুর্বল। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এ চার প্রকার পশু স্বীয় আঙ্গুল মোবারকে গননা করে বলেছিলেন। কিন্তু আমার আঙ্গুল হুযূরের আঙ্গুলের মত নয় বরং ছোট। (ইবনে মাযা ২৩৪ পৃঃ)

সবক ঃ সাহাবায়ে কিরামের অন্তরে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি সীমাহীন সম্মান বোধ ছিল। দেখুন, হযরত বরাহ (রাদি আল্লাহু আনহু) এ রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করলেন কিন্তু হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর আঙ্গুলে গণনা করে বর্ণিত বিষয়টা নিজের আঙ্গুলে গননা করে বর্ণনা করাটা বেআদবী মনে করলেন। তাই তিনি যখন বললেন যে, হুযূর আঙ্গুল দ্বারা গণনা করে ফরমায়েছেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলেন যে, আমার আঙ্গুল হুযূরের আঙ্গুলের মত নয়। অর্থ্যাৎ হুযূরের আঙ্গুল দিয়ে গণনা করে বর্ণনা দেয়াটা নিজের আঙুল দিয়ে বর্ণনা দেয়াটা বেআদবী মনে করলেন। অথচ আজ যারা হুযূরকে দ্বিধাহীনভাবে নিজেদের মত মানুষ বলে, একটু চিন্তা করে দেখুন তারা কতবড় বেআদব।

কাহিনী নং ২৫৫

রসূলুল্লাহর দোহাই

হযরত আবু মসউদ বদরী (রাদি আল্লাহু আনহু) একদিন তাঁর গোলামকে কোন একটি কারণে মারতে ছিলেন। সে তখন চিৎকার করছিল এবং উচ্চস্বরে বল্‌ছিল লাগলো, আল্লাহর দোহাই, আল্লাহর দোহাই। হযরত আবু মসউদ সেদিকে কর্ণপাত করলেন না। মারতেই রইলেন গোলাম যখন বুঝতে পারলো যে, আল্লাহর দোহাই দ্বারা রেহাই পাচ্ছে না, তখন সে খুবই জোরে জোরে বলতে শুরু করলো- রসুলুল্লাহর দোহাই, রসূলুল্লাহর দোহাই। রসূলুল্লাহর নাম শুনা মাত্র হযরত আবু মসউদ (রাদি আল্লাহু আনহু) মারা বন্ধ করে দিলেন এবং ছেড়ে দিলেন। ইতোমধ্যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তথায় তশরীফ আনলেন এবং আবু মসউদ (রাদি আল্লাহু আনহু) কে ফরমালেন, খোদার কসম, আল্লাহ তাআলা তোমার উপর থেকে অধিক ক্ষমতাবান। হযরত আবু মসউদ (রাদি আল্লাহু আনহু) এ কথা শুনা মাত্র সেই গোলামকে মুক্ত করে দিলেন। (আল আমন ওয়াল উলা- ৭৭ পৃঃ)

সবকঃ সাহাবায়ে কিরাম (রাদি আল্লাহু আনহুম) বিপদের সময় হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দোহাই দিতেন এবং আল্লহ তাআলা এ পবিত্র নামের বরকতে ওনাদের বিপদ দূরীভূত করে দিতেন। বর্তমানে আমরাও যদি বিপদের সময় হুযূরের দোহাই দিই বা হুযূরকে আহবান করি, তাহলো আমাদের বিপদ কেন দূরীভূত হবে না। নিশ্চয় দূরীভূত হবে। বিপদের সময় হুযূরের দোহাই দেয়াটা শিরক নয় বরং এটা সাহাবায়ে কিরামের মধ্যেও প্রচলিত ছিল।

কাহিনী নং ২৫৬

আহমদে মুখতার

একদিন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) মিম্বরে উপবেশন করে সাহাবায়ে কিরামকে সম্বোধন করে ইরশাদ ফরমালেন, শুন, আল্লাহ তাআলা তাঁর এক বান্দাকে ইখতিয়ার দিয়েছেন যে, উনি যতদিন ইচ্ছে দুনিয়াতে থাকতে পারেন অথবা স্বীয় রবের সান্নিধ্য পছন্দ করতে পারেন। অতএব সেই বান্দা স্বীয় রবের সান্নিধ্যকে পছন্দ করেছেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর এ ইরশাদ শুনে হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাদি আল্লাহু আনহু) কাঁদতে লাগলেন। সাহাবায়ে কিরাম ছিদ্দিকে আকবরকে কাঁদতে দেখে আশ্চর্য হয়ে বললেন, এতে কান্নার কি আছে? অতঃপর যখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বেছাল হয় তখন সাহাবায়ে কিরাম বললেন, এখন বুঝতে পেরেছি সেই দিন ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) কেন কাঁদছিলেন।

فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم هُوَ الْمُخَيَّرُ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ اَعْلَمَنَا

অর্থাৎ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ছিলেন সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তাআলা ইখতিয়ার দিয়েছিলেন এবং ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) বাস্তবিকই আমাদের সবার থেকে অধিক জ্ঞানী ছিলেন। (মিশকাত শরীফ ৫৪২ পৃঃ)

সবকঃ সাহাবায়ে কিরামের বিশ্বাস ছিল যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সর্বময় ক্ষমতা প্রাপ্ত এবং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) নিজেও এ বাস্তব কথাটি প্রকাশ করেছেন। যেমন তিনি ফরমায়েছেন, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে ইখতিয়ার প্রাপ্ত এবং আমার বেঁচে থাকা, না থাকা আমার ইখতিয়ার ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা এ ইখতিয়ার আমাকে দিয়েছেন। হুযূরের বেছালটা হুযূরের মর্জি মাফিক ছিল। তাই হুযূরের সাথে আমাদের কোন তুলনাই হতে পারে না। আমাদের জীবন মৃত্যু আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। যারা হুযূরকে আমাদের মত মানুষ বলে, তারা বড় জালিম।

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন। এ জন্যই হুযূর যখন ইখতিয়ার প্রাপ্ত ব্যক্তির কথা বললেন, তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছিলেন যে ইনি স্বয়ং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)।

কাহিনী নং ২৫৭

সম্মানিত শায়ের (কবি)

খায়বর যুদ্ধে যাবার পথে হযরত আমের ইবনুল আকু (রাদি আল্লাহু আনহু) শের পাঠ করছিলেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ওনার শেরের আওয়াজ শুনে জিজ্ঞেস করলেন, এ কে? সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এ আমের। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন يرحمه الله অর্থাৎ আল্লাহ ওর প্রতি রহম করুক। উল্লেখ্য যে, এ রকম জায়গায় হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কোন বিশেষ ব্যক্তির জন্য মাগফিরাতের দুআ করলে সেই ব্যক্তি শহীদ হয়ে যেত। এ জন্য হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দুআ শুনে হযরত ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) বলে উঠলেন لولا امتعتنا به অর্থাৎ আপনি আমাদেরকে ওর থেকে উপকৃত হতে কেন দিলেন না ইয়া রাসুলল্লাহ? সে তো যুদ্ধে শহীদ হয়ে যাবে। হুযূর! আপনি ওকে জীবিত রাখুন যেন আমরা ওর কবিতা শুনে তৃপ্তিবোধ করতে পারি। (বোখারী শরীফ ২০৩ পৃঃ)

সবকঃ সাহাবায়ে কিরাম (রাদি আল্লাহু আনহুম) এর বিশ্বাস ছিল যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) যাকে জীবিত রাখতে চান, তাকে জীবিত রাখতে পারেন। যে

ব্যক্তি বলে যে, রসূলের চাওয়ার দ্বারা কিছু হয়না, সে বড় জাহিল।

কাহিনী নং ২৫৮

পবিত্র পানি

এক জায়গায় হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) অযু করলেন। হযরত বেলাল (রাদি আল্লাহু আনহু) হুযূরের অযুর পর অবশিষ্ট পানি নিয়ে নিলেন। অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম যখন দেখলেন যে, বেলাল (রাদি আল্লাহু আনহু) হুযূরের অযুর অবশিষ্ট পানি সংরক্ষিত করেছেন। তখন তাঁরা হযরত বেলাল (রাদি আল্লাহু আনহু) এর দিকে দৌড়ে গেলেন এবং সেই পবিত্র পানির ভাগ নেয়ার জন্য চেষ্টা করলেন এবং যে যতটুকু পেলেন, তা নিজের মুখমণ্ডলে মালিশ করে দিলেন আর যারা পান নি, তাঁরা অন্য জনের হাতের আদ্রতা গ্রহণ করে নিজের মুখমণ্ডলে সেই হাত বুলায়ে দিলেন।(মেশকাত শরীফ ৬৫ পৃঃ)

সবকঃ সাহাবায়ে কিরামের কাছে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সম্পর্কিত এবং হুযূর কর্তৃক সংস্পর্শিত প্রতিটি বিষয়ের প্রতি সীমাহীন মহব্বত ছিল এবং তাঁরা সেটার তাজীম অপরিহার্য মনে করতেন এবং এর থেকে বরকত হাসিল করতেন। তাবারুক কোন নতুন কিছু নয় এবং বেদআতও নয়। এটা সাহাবায়ে কিরামের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। দেখুন হুযূরের অযুর অবশিষ্ট পানি তাবরুক হিসেবে গ্রহণ করার জন্য হুযুর নির্দেশ দেন নি, কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম তা গ্রহণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। অনুরূপ হুযূরের জুলুসে মীলাদ, মাহফিলে মীলাদ, আযানে হুযূরের পবিত্র নাম শুনে যারা মহব্বতের কারণে কোন নির্দেশ না থাকলেও তারা ইনশা আল্লাহ সাহাবায়ে কিরামের সদকায় ছাওয়াবের ভাগী হবে।

কাহিনী নং ২৫৯

অতি উৎকৃষ্ট তাবরুকাত

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রাদি আল্লাহু আনহু) এর কাছে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর একটি চাদর মুবারক, একটি কামিজ মুবারক, কিছু পশম ও কিছু নখ মুবারক ছিল। এ গুলোর প্রতি হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রাদি আল্লাহু আনহু) এর সীমাহীন মহব্বত ছিল এবং এ অতি পবিত্র তবরুকাত গুলোকে তাঁর প্রাণ থেকেও অধিক প্রিয় মনে করতেন। তাঁর ইন্তেকালের সময় যখন ঘনিয়ে আসে, তখন তিনি অসীয়ত করলেন যে, যখন আমি মারা যাব তখন আমাকে কাফন হিসেবে যেন হুযূরের কামিজটা পরায়ে দেয়া হয় এবং চাদর মুবারকটা জড়ায়ে দেয়া হয় এবং আমার সিজদার স্থান সমূহে হুযূরের পশম ও নখ মুবারক গুলো যেন দেয়া হয়। তাঁর ইন্তেকালের পর এ রকমই করা হয়েছিল। (শরহে শিফা ৪২০ পৃঃ ২ জিঃ)

সবকঃ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি আমীরে মুয়াবীয়া (রাদি আল্লাহু আনহু) এর খুবই মহব্বত ছিল। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর তাবারুকাত তাঁর জিন্দেগীকে তাঁর কাছে ছিল এবং ইন্তেকালের পরও তাঁর সাথেই রইলো।

কাহিনী নং ২৬০

শিক্ষা মূলক স্বপ্ন

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল আজিজ সাহেবের একটি প্রবন্ধ মাসিক তৈয়্যবার সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ ইং সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল, যেটাতে তিনি হযরত মাওলানা নুর বখশ তোয়াক্কুলী সাহেব (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) এর কিতাব তাজকেরায়ে নক্সবন্দীয়ায় উল্লোখিত নিম্নের ঘটনাটি উদ্ধৃত করেছিলেন। ঘটনাটি পড়ুন এবং শিক্ষা গ্রহণ করুন।

সৈয়দ বংশীয় এক ছাত্র বর্ণনা করেছেন যে, যারা হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, তাদের প্রতি সার্বিক ভাবে এবং হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রাদি আল্লাহু আনহু) এর প্রতি বিশেষ ভাবে আমার ঘৃণাবোধ ছিল। একদিন আমি মুজাদ্দেদে আলফে সানী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) এর মকতুবাত পড়ছিলাম। এতে দেখলাম যে হযরত ইমাম মালেক (রাদি আল্লাহু আনহু) হযরত শেখাইন (হযরত আবু বকর ছিদ্দিক ও হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এর প্রতি গালি দাতাদের জন্য শাস্তির হুকুম দিতেন, একই হুকুম হযরত আমীরে মুয়াবীয়া (রাদি আল্লাহু আনহু) কে গালি দাতাদের জন্য জারী করতেন। আমি এটা পড়ে রাগান্বিত হয়ে মকতুবাতকে মাটিতে নিক্ষেপ করলাম এবং শুয়ে পড়লাম। আমি স্বপ্ন দেখলাম যে, হযরত মুজাদ্দেদে আলফে সানী (রহঃ) রাগান্বিত অবস্থায় তশরীফ আনলেন এবং স্বীয় হাতদ্বয় দ্বারা আমার কান দুটি ধরে বলতে লাগলেন, হে অজ্ঞ ছেলে, তুমিও কি আমার লেখার উপর আপত্তি করতেছ? এবং আমার কিতাবকে মাটিতে ফেলে দিলে? তুমি যদি আমার কথাকে নির্ভরযোগ্য মনে না কর, তাহলে আমি তোমাকে হযরত আলী মরতুজা (রাদি আল্লাহু আনহু) এর কাছে নিয়ে যাব, যার খাতিরে তুমি ওনার ভাইদেরকে অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামকে মন্দ বলছ। অতঃপর হযরত মুজাদ্দেদ সাহেব আমাকে টেনে টেনে একটি বাগানে নিয়ে গেলেন এবং আমাকে বাগানের এক কিনারে দাঁড় করায়ে নিজে একটি মহলের দিকে চলে গেলেন, যেটা বাগান থেকে দেখা যাচ্ছিল। আমি দেখলাম যে ওখানে নূরানী আকৃতির এক বুজুর্গ বসে আছেন। হযরত মুজাদ্দেদ সাহেব খুবই সম্মানের সাথে সালাম করলেন এবং সেই বুজুর্গও তাকে খুবই সাদরে গ্রহণ করলেন। মুজাদ্দেদ সাহেব দু'জানু হয়ে সেই বুজুর্গের সামনে বসে গেলেন এবং মুজাদ্দেদ সাহেব কি যেন আরয করলেন। হযরত মুজাদ্দেদ সাহেব ও সেই বুজুর্গ উভয়ে আমার দিকে তাকালেন এবং মুজাদ্দেদ সাহেব কি যেন ইঙ্গিত করলেন। আমার ধারণা উনি আমার সম্পর্কে কিছু বলছেন, কিছুক্ষণ পর মুজাদ্দেদ সাহেব উঠে এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন এবং বললেন এ যে বুজুর্গ যিনি বসে আছেন, তিনি হলেন শেরে

খোদা আলী মরতুজা (রাদি আল্লাহু আনহু) উনি কি বলছেন শুন-

আমি সালাম পেশ করলাম। হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) বললেন, "খবরদার! হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবীদের প্রতি কোন বিদ্বেষ রেখো না এবং মনের মধ্যে ওনাদের প্রতি কোন ঘৃনাবোধ আসতে দিও না। আমরা জানি, কি নেক নিয়তের কারণে আমাদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল। অতপর মুজাদ্দেদ সাহেবের নাম নিয়ে বললেন "ওনার লেখাকে কখনো অবজ্ঞা কর না।"

হযরত আলী মরতুজা (রাদি আল্লাহু আনহু) এর এ নছীহতের পরও আমি দেখলাম যে সাহাবায়ে কিরামের প্রতি ঘৃণা যথারীতি আমার মনে রয়ে গেছে। হযরত আলী মরতুজা (রাদি আল্লাহু আনহু) বললেন, 'ওর অন্তর এখনও পরিষ্কার হয়নি।' হযরত মুজাদ্দেদ সাহেবকে ইশারায় বললেন, ওকে একটি চড় মার। অতঃপর মুজাদ্দেদ সাহেব আমাকে খুব জোরে একটি চড় মারলেন। তখন সাথে সাথে আমার অন্তর সাহেবায়ে কিরামের প্রতি ঘৃণা থেকে পাক পরিষ্কার হয়ে গেল এবং এর পর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুম ভাঙ্গার পর ঠিকই আমার অন্তরকে সাহাবায়ে কিরামের প্রতি ঘৃণা থেকে পবিত্র পেলামএবং হযরত মুজাদ্দেদে আলফে সানী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর বক্তব্যের প্রতি আমার আস্থা শতগুণ বৃদ্ধি পেল।

সবকঃ সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করা অপরিহার্য। ওনাদের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ পোষণ করা মারাত্মক অন্যায় এবং যার জন্য এ বিদ্বেষ তিনি নিজেও এতে সন্তুষ্ট নন।

কাহিনী নং ২৬১

ভিমরুলের আক্রমণ

হযরত ইবনে মুখতার তলমিসী বলেন এক ব্যক্তি এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন যে, আমরা এক সফরে বের হয়েছিলাম এবং আমাদের সাথে এমন এক পাজি লোক ছিল, যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবীগণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতো এবং এ বিদ্বেষী লোকটি পথে পথে সাহাবায়ে কিরামের শানে যা তা বলতেছিল। আমরা ওকে বাঁধা দিলাম কিন্তু সে কোন অবস্থায় বিরত রইলো না। মাঝ পথে আমরা এক জায়গায় বিশ্রাম নিলাম এবং এ লোকটি কোন একটি কাজে বের হলো। তখন দেখলাম হঠাৎ অনেক ভিমরুল ওকে আক্রমণ করে বসলো। তার চিৎকারে আমরা সাহায্যের জন্য দৌড়ে গেলাম কিন্তু ভিমরুল আমাদেরকেও ধাওয়া করে কাছে যেতে দিল না। শেষ পর্যন্ত ভিমরুলগুলো এ বেআদবকে মেরে ফেললো। (হায়াতুল হায়ওয়ান ৮ পৃঃ ৩ জিঃ)

সবকঃ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবায়ে কিরামের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ মরাত্মক ক্ষতিকারক। প্রত্যেক মুসলমানের এর থেকে বিরত থাকা অতি আবশ্যক।

কাহিনী নং ২৬২

শাহী ফরমান

সিফ্‌ফীনের যুদ্ধ যখন সমাপ্ত হলো, তখন হযরত আলী মরতুজা (রাদি আল্লাহু আনহু) এক ফরমান লিখে প্রতিবেশী দেশ সমূহে প্রেরণ করেন। সেই ফরমানে লিখা ছিল- "আমাদের কাজের সূচনা এভাবে হলো যে, সিরিয়ার একটি বংশের সাথে আমাদের মুকাবেলা হলো কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে আমাদের ও ওদের খোদা এক এবং আমাদের ও ওদের নবী এক। ইসলমের প্রতি দাওয়াতও একই ধরনের। তারাও আল্লার উপর ঈমান রাখে এবং রসূলকে স্বীকার করে। ওরা আমাদের থেকে উন্নত বলে দাবী করে না। আমরাও ওদের থেকে উন্নত বলে দাবী করি না। আমরা ও ওদের মধ্যে কেবল হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) এর রক্তের বদলা নেয়ার ঝগড়া রয়েছে। কিন্তু আমরা সেই রক্তপাত থেকে মুক্ত। (নাহজুল বালাগা ১১৮ পৃঃ)

সবকঃ সাহাবায়ে কিরাম ও আহলে বাইত (রাদি আল্লাহু আনহুম) সবের দীন ও মযহাব এক ছিল। আহলে বায়তের যে রীতিনীতি ছিল, সেটা সাহাবায়ে কিরামেরও ছিল। তৌহিদ, রেসালত, রাজনীতি "রাজত্ব" আকীদা ইত্যাদির ব্যাপারে সবাই একমত ছিলেন। ওনাদের কারো প্রতি কোন রকম বিদ্রুপ করা নাজায়েয। ওনারা সবাই হচ্ছেন আল্লাহর মাহবুবের মাহবুব।

কাহিনী নং ২৬৩

পরামর্শ

আমীরুল মুমেনীন হযরত ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) রোমের যুদ্ধের সময় হযরত মাওলা আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) থেকে পরামর্শ চাইলেন যে, এ যুদ্ধে তিনি নিজেই অংশ গ্রহণ করবেন কিনা? হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) নিম্নের পরামর্শ দেনঃ

আল্লাহ তাআলা এ জাতিকে জয়যুক্ত করার জিম্মাদার। তিনি মুসলমানদের ঐ সময়ও সাহায্য করেছেন, যখন তারা খুবই নগন্য ছিল এবং যখন অন্য কোন সাহায্যকারী ছিল না। তিনি তাদের হেফাজত করেছিলেন, যখন তারা নগন্য ছিল এবং অন্য কোন হেফাজতকারী ছিলনা। হে আমীরুল মুমেনীন! যদি আপনি স্বয়ং চলে যান এবং যুদ্ধ করতে গিয়ে কোন আঘাত প্রাপ্ত হন, তাহলে মুসলমানদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না। কেননা মুসলমানদের জন্য এখন আপনি ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই। অতপর আপনি নিজে না গিয়ে অন্য কাউকে প্রেরণ করুন। (নাহজুল বলাগা ২৭১ পৃঃ)

সবকঃ সাহাবাযে কিরাম যে কোন কাজে একে অপরের সাথে পরামর্শ করতেন। ওনারা প্রত্যেকেই দীনের পরিপূর্ণ অনুসারী, দীনের প্রচারকারী ও প্রসারকারী ছিলেন। ওনাদের কারো প্রতি কোন রকম সন্দেহপোষণ নিজের দীন ও ঈমানের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

২য় খণ্ড সমাপ্ত

তৃতীয় খণ্ডের কাজ চলছে